স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

# ভারতে বিবেকানন্দ

## স্বামী বিবেকানন্দ

# সূচিপত্র

১. কলম্বো স্বামীজীর বক্তৃতা ........ 3
২. জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত ........ 16
৩. পাম্বান-অভিনন্দনের উত্তর ........ 34
৪. রামেশ্বর-মন্দিরে বক্তৃতা ........ 38
৫. রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর ........ 41
৬. পরমকুডি অভিনন্দনের উত্তর ........ 52
৭. মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তর ........ 60
৮. মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর ........ 65
৯. কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা ........ 72
১০. মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর ........ 98
১১. আমার সমরনীতি ........ 102
১২. ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা ........ 128
১৩. ভারতীয় মহাপুরুষগণ ........ 151
১৪. আমাদের উপস্থিত কর্তব্য ........ 174
১৫. ভারতের ভবিষ্যৎ ........ 193

১৬. দান-প্রসঙ্গে........................................217
১৭. কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর........................219
১৮. সর্বাবয়ব বেদান্ত....................................234
১৯. গীতাতত্ত্ব - ১ .......................................265
২০. গীতাতত্ত্ব - ২ .......................................269
২১. আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর .......................272
২২. শিয়ালকোটে বক্তৃতা—ভক্তি .........................275
২৩. হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি............................286
২৪. ভক্তি..................................................308
২৫. বেদান্ত - (লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতা) ....................317
২৬. রাজপুতানায় ..........................................363
২৭. খেতড়িতে বক্তৃতা—বেদান্ত ..........................364
২৮. ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব .............371
২৯. সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন.....................378
৩০. আমি কি শিখিয়াছি ? ...................................382
৩১. আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম.....................................385

# ১. কলম্বো স্বামীজীর বক্তৃতা

[আমেরিকা ও ইওরোপে সাড়ে তিন বৎসর কাল বেদান্ত প্রচার করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ জানুআরী স্বামীজী সিংহলের রাজধানী কলম্বো বন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিনই এক অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পরদিন অপরাহ্নে 'ফ্লোরাল হল'-এ স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন, তাহাই 'কলম্বো হইতে আলমোড়া বক্তৃতাবলী'র প্রথম বক্তৃতা।]

যেটুকু সামান্য কার্য আমাদ্বারা কৃত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন শক্তিবলে হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে পর্যটনকালে আমার এই পরম-পবিত্র প্রিয় মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ-ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার; কারণ পূর্বে যাহা হয়তো হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন তাহা আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্যভূমি— কর্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন; আজ আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে—যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—ভারতবর্ষ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের স্থাপয়িতাগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে

আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন, তাহা এখানেই সঞ্চিত রহিয়াছে। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন—ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।

সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; আপনাদের মধ্যেও যাঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তথ্য অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, ততটা আর কোন জাতিরই নিকট নহে। ‘নিরীহ হিন্দু’ কথাটি সময়ে সময়ে তীব্র নিন্দারূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন তিরস্কারবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে; তবে ইহাতেও আছে। হিন্দুগণ চিরকালই ঈশ্বরের মহিমান্বিত সন্তান। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য, প্রাচীন ও বর্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব প্রসূত হইয়াছে সত্য, অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব এক জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য, কোন কোন জাতির জীবন-তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দিকে মহাশক্তিশালী ভাবের বীজসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য,—কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিবেন—ঐ-সকল ভাব রণভেরীর নির্ঘোষে ও রণসাজে সজ্জিত গর্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত প্রচারিত হইয়াছিল, রক্তবন্যায় সিক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর রুধির-কর্দমের মধ্য দিয়াই ঐ-সকল ভাবকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক শক্তিপূর্ণ ভাব-প্রচারের পশ্চাতেই অগণিত মানুষের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছে।

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতিসকল পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়াছে, ভারত কিন্তু শান্তভাবে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে। যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষেরা জার্মানির গভীর অরণ্যে অসভ্য অবস্থায় নীলবর্ণে নিজেদের রঞ্জিত করিত, তখনও

ভারতের কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার কোন সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না—সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা জয় করি নাই, সেই শুভ কর্মের ফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীকবাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রীসের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত! এমন একদিন ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল।রোম সর্বত্র যাইত এবং মানবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। রোমের নামে পৃথিবী কাঁপিত। আজ ক্যাপিটোলাইন গিরি১ ভগ্নস্তূপমাত্রে পর্যবসিত! যেখানে সীজারগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ ঊর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে। অন্যান্য অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে, মদগর্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বল্পকালমাত্র অত্যাচার-কলঙ্কিত জাতীয় জীবন যাপন করিয়া তাহারা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এইরূপেই এই-সকল জাতি মনুষ্যসমাজে নিজেদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপনারা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইবেন না; কোন এক অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি—এ-কথা মনে করিবেন না! সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্তমান; শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই-সকল সনাতন আচার এখানে এখনও বর্তমান। যতই দিন যাইতেছে, ততই দুঃখ-দুর্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে শুধু এই ফল হইয়াছে যে, সেইগুলি আরও দৃঢ়—আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ-সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল উৎসই বা

কোথায়—ইহা যদি জানিতে চান, তবে বিশ্বাস করুন তাহা এই ধর্মভাবেই বিদ্যমান। সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আমি যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম—সংসারের অন্যান্য কাজের মত একটা কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন ও প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার চেষ্টা আছে। এই-সব নানা কার্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে—সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটু-আধটু ধর্মকর্মও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে—এই ভারতের কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য।

চীন-জাপানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন তাহা জানেন? পাশ্চাত্য সমাজে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন সেই সংবাদ রাখেন? যদি রাখেন, দুই চারিজন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট ধর্মসভা বসিয়াছিল এবং সেখানে এক হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য! দেখিতেছি—এখানকার সামান্য মুটে-মজুরও তাহা জানে! ইহাতে বুঝা যাইতেছে—হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল কোথায়। পূর্বে দেশীয়, বিশেষতঃ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোক প্রকাশ করিতে শুনিতাম, আর নিমেষে ভূপ্রদক্ষিণ- কারী পর্যটকগণের পুস্তকে ঐ বিষয় পড়িতাম! এখন বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা আংশিক সত্য, আবার আংশিকভাবে অসত্যও বটে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি বা যে-কোন দেশের একজন কৃষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন—'তুমি কোন্ রাজনীতিক দল-ভুক্ত?' সে বলিয়া দিবে—সে উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল-দলভুক্ত,২ এবং কাহাকেই বা ভোট দিবে। আমেরিকার কৃষক জানে, সে রিপাবলিকান বা ডেমোক্রাট। এমন কি রৌপ্য-সমস্যা (Silver question) সম্বন্ধেও তাহার কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলিবে, 'বিশেষ কিছু জানি

না, গির্জায় গিয়া থাকি মাত্র!’ বড়জোর সে বলিবে– তাহার পিতা খ্রীষ্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, ‘রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জান কি? সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিবে, ‘এটা আবার কি? সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনে কখনও শোনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে–রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকুই বুঝে। কিন্তু তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, ‘তোমার ধর্ম কি?’ সে নিজের কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, ‘আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত।’ ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দুই-একটি কথা বাহির হইবে যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা বলিতেছি; তাই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটা-না-একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু–আমরা বলি, অনন্ত পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টিই বর্তমান আকারে প্রকাশ পায়; আর আমরা বর্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এই সংসারে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথে তাহাকে যেন চলিতেই হইবে; সেই ভাব অবলম্বন না করিলে সে বাঁচিতে পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির যেন একটি বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের যেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকেই যেন একটি বিশেষ ব্রত পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে–কখনও ছিল না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবেও না।

তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা এইঃ সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব, বা ইংরেজরা তাহাদের অজেয় বাহিনীসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই-সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই পৃথিবীর কাছে ভারতের দান।

এইরূপে অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির মিলন ঘটাইয়াছে, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ভারতের একাকিত্ব তখনই ভাঙিয়াছে; যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক-কৃত অস্পষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, 'উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে।' অতঃপর সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, 'গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিবর্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে।' আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে।

যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন—ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন ও সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব

আছে। আমি সেই সম্বন্ধে আপনাদিগকে পূর্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখনও বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরেজী ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা-দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে—যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা-দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে—fascination (সম্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে, বরং ঠিক তাহার বিপরীত; উহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানব-মনে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু যদি মানুষ অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করে, মনোযোগের সহিত ভারতীয় আচার গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মূলীভূত মহান্ তত্ত্বসমূহের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে—শতকরা নিরানব্বই জনই ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্যে, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ, ঊষাকালীন শান্ত শিশির-সম্পাতের মত এই ধীর সহিষ্ণু 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কার মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে পুরাতন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্মবিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত শিথিল হইয়া যাইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব-জাতিকে নিজ নিজ মতের অনুবর্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবী করিয়া থাকে, তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাত প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ভঙ্গুর কাচ-পাত্রের মত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর জ্ঞানিগণ ধর্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই যে-ভারতের অধিবাসিগণের ধর্মজীবন সর্বোচ্চ দার্শনিক সত্য-দ্বারা নিয়মিত, সেই ভারতের দর্শন—ভারতীয় মনের ধর্মবিষয়ক সর্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ এই-সকল মহান্ তত্ত্ব—অসীম জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্তত্ব

ও বিভিন্ন জীবশরীরে তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা-রূপ অপূর্ব তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্ব—পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতই অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ এই পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র কাদামাটির ডোবা মনে করিত, এবং ভাবিত—কাল অতি অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্বোপরি মানবাত্মার অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেই বিদ্যমান, এবং সর্বকালেই এই মহান্ তত্ত্ব সর্বপ্রকার ধর্মতত্ত্ব- অনুসন্ধানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তির নিত্যতা (Conservation of Energy) প্রভৃতি আধুনিক বিস্ময়কর মতগুলি সর্বপ্রকার অপরিণত ধর্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে—তখন মানবাত্মার অপূর্বসৃষ্টি—ঈশ্বরের অদ্ভুত বাণীস্বরূপ এই বেদান্তের হৃদয়গ্রাহী, মনের উন্নতি-বিধায়ক ও চিত্তপ্রসারকারী তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানবজাতির শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু ইহাও বলিতে চাই, ভারতের বাহিরে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে আমি ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ—যেগুলির উপর ভারতীয় ধর্মরূপ সৌধ্য নির্মিত—সেইগুলি মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা—শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, সেইগুলি বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার; এইগুলি প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম'-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে। একটি সত্য সনাতন—উহা মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব, জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে—পূর্বে অবস্থিত কোন কিছুর বিকাশমাত্র— এতদ্বিষয়ক মতবাদ, যুগপ্রবাহ-সম্বন্ধীয় আশ্চর্য নিয়মাবলী ও এইরূপ অন্যান্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সর্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক বিষয়সমূহ এই-সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তি। এগুলি ছাড়া আবার অনেকগুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়;

সেইগুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য নিয়মিত। সেইগুলিকে ‘শ্রুতি’র অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে ‘স্মৃতি’র—পুরাণের অন্তর্গত। এইগুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্বসমূহের কোন স্থায়ী সম্পর্ক নাই। আমাদের আর্যজাতির ভিতরও এইগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে দেখা যায়। এক যুগের যে বিধান, অন্য যুগে তাহা নহে। যখন এই যুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তখন ঐগুলি আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশকালের উপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্তন করিবেন।

জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের এই-সকল অপূর্ব অনন্ত চিত্তোন্নতিবিধায়ক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিস্বরূপ মহৎ তত্ত্বসমূহ ভারতেই প্রসূত হইয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ—ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার (Tribal Gods) জন্য ‘আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা; এস, যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি’ বলিয়া প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার জন্য যুদ্ধরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখনও দেখা যায় নাই। মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মহান্ মূলতত্ত্বগুলি সহস্র বৎসর পূর্বের মত আজও মানবজাতির কল্যাণসাধনে সমর্থ। যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, যতদিন কর্মফল থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং যতদিন স্বীয় শক্তি দ্বারা আমাদিগকে নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বিদ্যমান থাকিবে।

সর্বোপরি, ভারত জগৎকে কোন্ তত্ত্ব শিখাইবে, তাহা বলিতেছি। যদি আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী লক্ষ্য করি, তবে আমরা সর্বত্র দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই-সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিত, তবে সেই-সকল দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম হইত—যেমন বেবিলনীয় দেবতাগণ। যখন বেবিলনবাসিগণ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দেবতাগণের নাম ছিল ‘বল’ (Baal)। এইরূপ য়াহুদী জাতিরও বিভিন্ন দেবগণের সাধারণ নাম ছিল ‘মোলক’ (Moloch)। আরও দেখিতে

পাইবেন, এই-সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ যখন অপরগুলি হইতে বড় হইয়া উঠিত, তখন তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বলিয়া দাবী করিত। এই ভাব হইতে আবার স্বভাবতই এইরূপ ঘটিত যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া তুলিতে চাহিত। বেবিলন- বাসিগণ বলিত, 'বল মেরোডক' দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ—অন্যান্য দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'মোলক য়াভে' অন্যান্য মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসিত হইত। ভারতেও দেবগণের মধ্যে এই সংঘর্ষ—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণ শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'৪ একমাত্র সৎস্বরূপই আছেন, জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। শিব বিষ্ণু অপেক্ষা বড় নহেন, অথবা বিষ্ণুই সব, শিব কিছু নহেন—তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। পূর্বোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যেই ভারতের সমগ্র ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বার বার উচ্চারিত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রতিটি শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—জাতীয় জীবনের উপাদানস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে-উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্মিত, তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে—সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান, অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা—পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী। তোমার হয়তো বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্য দাস,

আবার আর একজন হয়তো বলিতে পারে, সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে ইহা কিরূপে সম্ভবঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সৎস্বরূপ এক, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

হে আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সর্বোপরি পৃথিবীকে এই মহান্ সত্য আমাদের শিখাইতে হইবে। অন্যান্য দেশের বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা বলেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা স্থির হইয়া কখনও ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোর কুসংস্কার রাশি বর্তমান! এখনও সর্বত্র এই ভাব—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই নীচ সঙ্কীর্ণতা! তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের নিজেদের যাহা আছে, তাহাই অতি মূল্যবান্; অর্থোপার্জনই তাঁহাদের মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তাঁহাদের যাহা আছে তাহাই একমাত্র কাম্য বস্তু, আর বাকী সব কিছুই নহে। যদি তিনি মৃত্তিকা-দ্বারা কোন অসার বস্তু নির্মাণ করিতে পারেন, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, তবে সব-কিছু ফেলিয়া দিয়া ঐগুলিকেই ভাল বলিতে হইবে। শিক্ষা ও বিদ্যার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীর এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সভ্যতার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এখনও মনুষ্যজাতির শতকরা নিরানব্বই জন অল্প-বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে এই-সব কথা পড়িতে পার, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও এরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি, এখনও পৃথিবীতে এই ভাবগুলি নাই বলিলেই হয়; শতকরা নিরানব্বই জন এই-সকল বিষয় চিন্তাও করে না। পৃথিবীর যে-কোন দেশে আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি—এখনও অন্যধর্মাবলম্বীর উপর দারুণ নির্যাতন চলিতেছে; নূতন বিষয় শিক্ষা করা সম্বন্ধে পূর্বেও যে- সকল আপত্তি উঠিত, এখনও সেই পুরানো আপত্তিগুলিই উত্থাপিত হইয়া থাকে। জগতে যতটুকু পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যতঃ তাহা এইখানেই—এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা

নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্যধর্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে! তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা—শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে কথিত হইয়াছেঃ

‘ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব || ’

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মত—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কেহ একটিকে শ্রেষ্ঠ, অপরটিকে হিতকর বলেন। সমুদ্র যেমন নদীসকলের একমাত্র গম্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটিল নানাপথগামী জনগণের তুমিই একমাত্র গম্য।

ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইলেও সকলেই কিন্তু একই লক্ষ্যে চলিতেছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে; কিন্তু অবশেষে সকলেই সেই এক প্রভুর নিকট পৌঁছিবে। যখন তোমরা শুধু তাঁহাকে শিবলিঙ্গ নয়—সর্বত্র দেখিবে, তখনই তোমাদের শিব- ভক্তি এবং তোমাদের শিবদর্শন সম্পূর্ণ হইবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি শিবের যথার্থ ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিবে। যে নামে, যে রূপে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, সব তাঁহারই উপাসনা। কাবা-র৪ দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রীষ্ট্রীয় গির্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তাঁহারই উপাসনা করিতেছে। যে-কোন নামে যে-কোন মূর্তির উদ্দেশে যে-ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা ভগবানের

পাদপদ্মে পৌঁছায়, কারণ তিনি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মা। পৃথিবীতে কি-অভাব, তাহা তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালভাবেই জানেন। সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। পৃথিবীতে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহ থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অতএব সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবলমাত্র এখান হইতে—আমাদের মাতৃভূমি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি এ-কথা বলিতেছি? কারণ এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহা নহে; আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বত্র ইহা প্রবাহিত রহিয়াছে। এইখানে—কেবল এইখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এইখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। এইভাবে আমাদের জগৎকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে। ভারত ইহা অপেক্ষাও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে, কিন্তু সেইগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই নম্রতা, শান্তভাব, তিতিক্ষা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবের মহতী শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সর্বজাতি, সর্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে। ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।’

# ২. জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত

[কলম্বো হইতে কাণ্ডি, অনুরাধাপুর ও ভাভোনিয়া হইয়া স্বামীজী জাফনা শহরে পদার্পণ করেন। সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। জাফনায় অভিনন্দনের উত্তরে ২৩ জানুআরী ‘হিন্দু কলেজ’ প্রাঙ্গণে তিনি ‘বেদান্ত’ সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি দেন।]

বিষয় অতি বৃহৎ, কিন্তু সময় খুবই কম; একটি বক্তৃতায় হিন্দুদিগের ধর্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি, বর্ণনা করিব। যে ‘হিন্দু’ নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিন্তু আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ—‘যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত।’ প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে ‘সিন্ধু’ শব্দই ‘হিন্দু’রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই ‘হিন্দু’ বলিতেন। এইরূপেই ‘হিন্দু’শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান-শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য এই শব্দ-ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার সার্থকতা নাই; কারণ তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, বর্তমানকালে সিন্ধুনদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মত এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি ‘হিন্দু’ শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা ‘বৈদিক’ শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি, অথবা ‘বৈদান্তিক’ শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস—এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য; সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্মের ভিত্তি। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ঐ-সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

বেদ-নামক শব্দরাশি কোন পুরুষের উক্তি নহে। উহার সন-তারিখ এখনও নির্ণীত হয় নাই, কখনও হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম—ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়। হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ; কারণ বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। 'বেদ' অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি; বিদ্ ধাতুর অর্থ—জানা। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত। ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; পূর্ব হইতেই বিদ্যমান সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন বা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব হইতে বিদ্যমান ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। ঐ ভাবরাশি অনন্ত কাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল—ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্তা।

বেদ-নামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ যাগযজ্ঞের কথা আছে; উহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমান যুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন-না-কোন আকারে বর্তমান। কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, যথা সাধারণ মানবের কর্তব্য—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্তব্য এখনও পর্যন্ত অল্প-বিস্তর অনুসৃত হইতেছে। দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ। ইহার নাম 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে-কেহ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্ভাগ মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার

করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা ‘হিন্দু’ শব্দের পরিবর্তে ‘বৈদান্তিক’ শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতে সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে—আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্মের যত শাখাপ্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন, যিনি বেশ ভাল করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—উপনিষদ্ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই-সকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যাঁহারা হিন্দুধর্মের খুব অমার্জিত শাখা-বিশেষেরও রূপকতত্ত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব দৃষ্টান্তরূপে পরিণত হইয়া ঐ-সকল ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকগুলি সবই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে প্রতীকরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এইগুলি মুনিদের লেখা গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ মুনি এই-সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য যেরূপ, স্মৃতির প্রামাণ্যও সেইরূপ; তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই-সকল স্মৃতি যুগে যুগে ভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি—সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই-সকল যুগের প্রত্যেক যুগে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে; আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও

পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি।

বেদান্তে ধর্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তনীয়। কেন?– কারণ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অপরিবর্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, সেইগুলি ঐ মূল- তত্ত্বগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখনও পরিবর্তন হইতে পারে না। আত্মা, স্বর্গগমন প্রভৃতির ভাব কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্বে ঐ-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ভাব ছিল, এখনও তাহাই আছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে।

কিন্তু যে-সকল ধর্মকার্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সেইগুলিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং সময়-বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্য-বিশেষের বিধান রহিয়াছে, অন্য সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়-বিশেষের উপযোগী ছিল, কিন্তু ঋতু পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি তখন ঐ খাদ্য-ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতই প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্তন করিতেই হইবে; কিভাবে ঐ-সকল পরিবর্তন করিতে হইবে—ঋষিরা আসিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্মের মূল সত্যগুলি বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইবে না, ঐগুলি সমভাবে থাকিবে।

তারপর পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিত। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, নানাবিধ রূপকের দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বসকলের বিবৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে-ভাষায় লিখিত তাহা অতি প্রাচীন; অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই ঐ গ্রন্থের সময়-নিরূপণে সমর্থ। পুরাণ সমসাময়িক লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ-সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে

যে-সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেইগুলির মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। মুনিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেকটিই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তারপর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইগুলি সবই হিন্দুদের শাস্ত্র। যে জাতির মধ্যে এত অধিকসংখ্যক ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান এবং যে-জাতি অগণিত বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্মের চিন্তায় তাহার শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে, সে-জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব অতি স্বাভাবিক। আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কোন কোন বিষয়ে এই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য বিদ্যমান। সম্প্রদায়গুলির এই-সকল খুঁটিনাটির বিভিন্নতা বুঝিবার সময় এখন আমাদের নাই। সুতরাং যে-সকল মতে—যে- সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, সম্প্রদায়সমূহের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের মত—এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তারপর তিনি ঘুমাইতেছেন—ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। *** উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ||—যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। এমন সময় কখনই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া থাকে। আমাদের 'সৃষ্টি'

ইংরেজী ‘ Creation’ নহে। ‘ Creation’ বলিতে ইংরেজীতে ‘কিছু-না হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব’—এই অপরিণত মতবাদ বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া আমি তোমাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির অবমাননা করিতে চাই না। সমগ্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, কেবল প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে যায়, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার ব্যক্ত হইয়া উহা সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন পূর্বের মতই সংযোগ, পূর্বের মতই প্রকাশ হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙিয়া যায়—ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। আবার বাহিরে আসে; অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গের মত একবার সম্মুখে আর-বার পশ্চাতে আন্দোলিত হইতেছে। দেশ, কাল এবং অন্যান্য সব-কিছুই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই ‘সৃষ্টির আরম্ভ আছে’ বলা সম্পূর্ণ বাতুলতা। সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। এই জন্য যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি-অন্ত বুঝিতে হইবে; উহার অন্য কোন অর্থ নাই।

কে এই সৃষ্টি করিতেছেন?—ঈশ্বর। ইংরেজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায় আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত ‘ব্রহ্ম’ শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম নিত্য—নিত্যশুদ্ধ নিত্যজাগ্রত সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ দয়াময় সর্বব্যাপী নিরাকার অখণ্ড। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এখন প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের নিত্য স্রষ্টা ও বিধাতা হন, তাহা হইলে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হয়। জগতে তো যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—এখানে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; এইরূপ বৈষম্য কেন? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বিদ্যমান। কারণ এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই উৎপাত, এই দিবা-রাত্রি গগনবিদারী দীর্ঘনিঃশ্বাস—ইহাই আমাদের এই জগতের অবস্থা! ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর

ঘোরতর নিষ্ঠুর! মানুষের কল্পিত নিষ্ঠুরতম দানব অপেক্ষা এই ঈশ্বর আরও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন। তবে কে ইহা করিল?—আমরা নিজেরাই করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রের উপর সমভাবেই বর্ষণ করে। কিন্তু যে-ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত, তাহাই শস্যশালী হয়; যে-ভূমি ভালভাবে কর্ষিত নয়, তাহা ঐ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারে না। ইহা মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার দয়া অনন্ত অপরিবর্তনীয়—আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করিলাম? কেহ জগতে সুখী হইয়া জন্মাইল, কেহ বা অসুখী—তাহারা তো এই বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই? করিয়াছে বৈ কি! পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে।

এখন আমরা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোচনায় আসিলাম—যাহাতে শুধু আমরা হিন্দুরা নই, বৌদ্ধ এবং জৈনগণও একমত। আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির মত জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে—তাহা হইতেই পারে না; এইরূপ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই। কালে যাহার আরম্ভ, কালেই তাহার অন্ত হইবে। গতকল্য যদি জীবনের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য উহার শেষ হইবে—পরে উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। জীবন অবশ্য পূর্বেও বর্তমান ছিল। আজকাল ইহা বেশী বুঝাই- বার আবশ্যক নাই; কারণ আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে— জড়-জগতের আবিষ্কারগুলির সাহায্যে আমাদের শাস্ত্রনিহিত তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতেছে। তোমরা সকলে পূর্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনানুযায়ী কোন শিশুকেই প্রকৃতি স্বহস্তে জগৎ-রঙ্গমঞ্চে লইয়া আসেন না, তাহার স্কন্ধে অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্মের ফল ভোগ করিতে আসে। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্মবিধান; আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের নিয়ামক। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহা-দ্বারাই 'ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ' নিরাকৃত হয়। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য, আমরাই কারণস্বরূপ; সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি

আমরা অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে—আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। আর ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; আর বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি। সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝিতে হইবে। মানুষের ইচ্ছা কোন ঘটনার অধীন নহে। মানুষের অনন্ত ইচ্ছাশক্তি ও মুক্ত স্বভাবের সম্মুখে সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্যন্ত মাথা নত করিবে—দাস হইয়া থাকিবে।

এইবার স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে—আত্মা কি? আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও অন্যান্য দেশে বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা-দ্বারা সেই সর্বাতীত সত্তার আভাস পাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা জানি, ইহার ফলও অতি শোচনীয় হইয়াছে। সেই সত্তার আভাস পাওয়া দূরে থাক্, আমরা যতই জড়-জগতের আলোচনা করি, ততই অধিকতর জড়বাদী হইতে থাকি। যদি বা একটু-অধটু ধর্মভাব পূর্বে থাকে, জড়-জগতের আলোচনা করিতে করিতে তাহাও দূর হইয়া যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরমপুরুষের জ্ঞান বাহ্যজগৎ হইতে পাওয়া যায় না। অন্তরমধ্যে—আত্মার মধ্যে ঐ তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সেই অনন্তের কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই ঈশ্বরকে জানিতে পারি। জীবাত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মতভেদ আছে বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সকলে একমত। যথা—সকল জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক আত্মায় সর্ববিধ শক্তি আনন্দ পবিত্রতা সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে—সে যতই দুর্বল বা মন্দ হউক, সে বড় বা ছোট হউক—সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণী ও আমার মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই; সে আমার ভ্রাতা; তাহারও যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছে। অন্যত্র ‘সমগ্র মানবজাতির

ভ্রাতৃভাব’ প্রচারিত হইয়া থাকে, ভারতে উহা ‘সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব’—এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত আমার ভাই—তাহারাও আমার দেহস্বরূপ। ‘এবং তু পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্’ ইত্যাদি—এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্বভূতময় জানিয়া সকল প্রাণীকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিবেন। সেই কারণেই ভারতে ইতরপ্রাণী ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই—সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মাতে সমুদয় শক্তি বর্তমান—এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

স্বভাবতই এইবার আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব-আলোচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বেই ‘আত্মা’ সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা চর্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় Soul ও Mind—এই দুইটি শব্দে বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত ‘আত্মা’ ও ইংরেজী’ ‘ Soul’ শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচক। আমরা যাহাকে ‘মন’ বলি, পাশ্চাত্যেরা তাহাকে ‘ Soul’ বলেন। পাশ্চাত্য দেশে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন দিন ছিল না। প্রায় বিশ বৎসর হইল সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছে। আমাদের এই স্থূল শরীরের পশ্চাতে মন; মন কিন্তু আত্মা নহে; উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রয় নির্মিত। উহাই জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে, উহার পশ্চাতে মানুষের আত্মা রহিয়াছে। এই ‘আত্মা’ শব্দ Soul বা Mind শব্দের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদিগকে সংস্কৃত ‘আত্মা’ অথবা আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুযায়ী ‘ Self’ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, আত্মা যে মন ও স্থূল-শরীর—উভয় হইতেই পৃথক্, এই ধারণাটি মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম-শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে; কালে যখন সর্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখন উহার আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়; ইচ্ছা করিলে জীবাত্মা এই মন বা সূক্ষ্ম-শরীরকে রাখিতেও পারে, অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। মুক্তিই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব।

আমাদের ধর্মেও স্বর্গ-নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ-নরকের স্বরূপ বিচার করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্যলোকেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র হইবে—না হয় একটু বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ। তাহাতে বরং আরও মন্দই হইবে। এইপ্রকার স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্মবশে ইহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্র-বরুণাদি কোন দেব-বিশেষের নাম নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা স্বর্গসুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু যেমন এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধন মান ঐশ্বর্য লাভ করিলে উচ্চতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা করেন না; তাঁহাদের শুভ কর্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি। সুতরাং এই-সকল স্বর্গেও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তু লাভ করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত?—মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেনঃ 'শ্রেষ্ঠ স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে—তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশ-কাল তোমার উপর কার্য করিতেছে, ততদিন তুমি ক্রীতদাসমাত্র।' এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি—উভয়কে জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে তোমাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে, সুতরাং মৃত্যুরও পারে উপনীত হইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল, সুতরাং তুমি দুঃখেরও অতীত

হইলে। তখনই তুমি সর্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই। দেহ সম্বন্ধেই নরনারী ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আরোপ করা ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

এই আত্মা কিরূপে সংসারে বদ্ধ হইলেন? একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই অজ্ঞানের নাশ হইবে, জ্ঞানই আমাদিগকে এই অজ্ঞানের পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা এবং ভগবানের মন্দিরজ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তিবলে জ্ঞানের উদয় হইবে, অজ্ঞান দূরীভূত হইবে, সকল বন্ধন টুটিয়া যাইবে এবং আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়-কর্তা—জগতের শাশ্বত জনক- জননী। তাঁহার সহিত আমাদের ভেদ নিত্য। মুক্তির অর্থ তাঁহার সামীপ্য ও সালোক্য-প্রাপ্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় সগুণ ঈশ্বরের প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই নির্গুণ সর্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না; কারণ জ্ঞান মনের ধর্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যইতে পারে না; কারণ চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায়মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা যাইতে পারে না; কারণ বিচারও সসীমতা—দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে না; কারণ বদ্ধ ভিন্ন মুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন কার্য করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? অভাব না থাকিলে কেহ কোন কার্য করে না।—তাঁহার আবার অভাব কি? বেদে তাঁহার প্রতি 'সঃ' শব্দ প্রযুক্ত

হয় নাই। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নয়, নির্গুণ ভাব বুঝাইবার জন্য 'তৎ' শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করা হইয়াছে। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হইলে ব্যক্তিবিশেষ বুঝাইত, তাহাতে জীব-জগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য সূচিত হইত। তাই নির্গুণবাচক 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'তৎ' শব্দবাচ্য নির্গুণ ব্রহ্ম প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।

এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি?—তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সকল জীবের মূল ভিত্তিস্বরূপ সেই সত্তার বিভিন্ন বিকাশমাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নির্গুণ সত্তা হইতে আমাদিগকে পৃথক্ ভাবি, তখনই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি; আর এই অনির্বচনীয় নির্গুণ সত্তার সহিত আমাদের অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তি। সংক্ষেপতঃ আমাদের শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদই সর্বপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—সকলকে নিজের মত ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণি-নির্বিশেষে সকলকেই নিজের মত প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিগণকে নিজের মত ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, তখনই বুঝিবে—অপরের ক্ষতি করিলে নিজের ক্ষতি করা হইল; তখনই আমরা বুঝিব, কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে গিয়া আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন কালের প্রয়োজন অনুসারে লোকের উপর ভক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের

প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে—সর্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জিত হইয়া 'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয় তাহা বলা যায় না! ভয়?—কাহাকে ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু। মানুষ নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত—সেই আত্মা অনাদি অনন্ত ও অবিনাশী, তাঁহাকে কোন অস্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, তিনি অনন্ত জন্মরহিত মৃত্যুহীন, তাঁহার মহিমার সম্মুখে সূর্য-চন্দ্রসমূহ—এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমাদিগকে এই মহিমময় আত্মার বিশ্বাসবান্ হইতে হইবে—তবেই বীর্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাব, তবে দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি নিজেকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; নিজেকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদের নিজেকে দুর্বল ভাবিতে শিক্ষা দেয় না, পরন্তু নিজেদের তেজস্বী সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতরে ঐ ভাব এখনও প্রকাশিত নাও হইতে পারে, কিন্তু উহা তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভাব রহিয়াছে। তবে আমি ঐ ভাবগুলি জীবনে রূপায়িত করিতে পারি না কেন? কারণ, ঐ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি উহাতে আমি বিশ্বাসী হই, তবে ইহা এখনই প্রকাশিত হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। অদ্বৈতবাদ ইহাই শিক্ষা দেয়।

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা, কোনরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক,—সাহসী সর্বজয়ী সর্বংসহ হউক। সর্বপ্রথমে তাহারা আত্মার মহিমা সম্বন্ধে জানুক। এই শিক্ষা বেদান্তে—কেবল বেদান্তেই পাইবে; অন্যান্য ধর্মের মত ভক্তি উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ বেদান্তে আছে—যথেষ্ট পরিমাণেই আছে; কিন্তু আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবনপ্রদ এবং অতি অপূর্ব। কেবল

বেদান্তেই সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের প্রধান তত্ত্বগুলি বলিলাম। ঐগুলি কিভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, এখন সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে যে-সকল কারণ বর্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্যতও দেখিতেছি—এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করে না। শৈব এ-কথা বলে না যে, বৈষ্ণবমাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে ঐ-কথা বলে না। শৈব বলে, ‘আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমি তোমার পথা চল; পরিণামে আমরা একই স্থানে পৌঁছিব।’ ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এই কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাকেই ‘ইষ্টতত্ত্ব’ বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ-কথা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে-প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে-প্রণালী আমার পথ নাও হইতে পারে, হয়তো তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক পথে যাইতে হইবে—এ-কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাজ্য। যদি কখনও পৃথিবীর সব লোক একধর্মমতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে বিলুপ্ত হইবে। বৈচিত্র্যই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকিবে। বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পথ তোমার পক্ষে ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার পথ আমার পক্ষে ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে নহে। প্রত্যেকেরই ইষ্ট ভিন্ন—এ-কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের পথ ভিন্ন।

এটি মনে রাখিও, কোন ধর্মের সহিত আমাদের বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই ইষ্ট ভিন্ন। কিন্তু যখন দেখি—কেহ আসিয়া বলিতেছে, ‘ইহাই একমাত্র পথ’ এবং ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশে জোর করিয়া আমাদিগকে ঐ মতাবলম্বী করিতে চায়, তখন আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকি। যাহারা ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে ভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদের বিনাশ-সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে, ইহা যে সহ্য করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে! ইহাই যদি প্রেম হয়, তবে দ্বেষ বলিব কাহাকে? খ্রীষ্ট বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যে-কোন অবতারেরই উপাসনা করুক না, কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, ‘এস ভাই, তোমার যে-সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি; কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না।’ আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয়তো উহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন্ খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমিই বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে-সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন্ পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমিই ঠিক বুঝিতে পারি—ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে, যদি কোন মন্দিরে গিয়া অথবা কোন প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার অন্তরে অবস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পার, তবে তাহাই কর; প্রয়োজন হয় দুই শত প্রতিমা গড় না কেন? যদি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার ঈশ্বর-উপলব্ধির সাহায্য হয়, তবে শীঘ্র ঐ সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন কর। যে-কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর; যদি কোন মন্দিরে যাইলে তোমার ঈশ্বরলাভের সহায়তা হয়, সেখানে গিয়াই উপাসনা কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে-মুহূর্তে তুমি বিবাদ কর, সেই মুহূর্তে তুমি ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশ পশুস্তরে উপনীত হইতেছ।

আমাদের ধর্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কাছে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী আপাততঃ ধর্মের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই-সকল নিয়ম আবশ্যক ছিল। যখন আর আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।

যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। একসময় আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির একটিরও বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। গতকালের শিশু–যে আগামীকালই হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হইবে–সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিতে বলে এবং আমিও যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের বাহিরে নানাদেশে হইতে আমরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরনের। তাহাদিগকে বল–তোমরা যখন একটি স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া রাখিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও; ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী! বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় বিলয়! আগে আমাদের মত স্থায়ী সমাজ গঠন কর; প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যেগুলির শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিবে পারে–তখন তোমাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় হইবে। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র।

আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইয়াছে। এখন আমি বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারত-কার বেদব্যাসের জয় হউক! তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ‘কলিযুগে দানই একমাত্র

ধর্ম।’ অন্যান্য যুগে যে-সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এই যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা। ‘দান’ শব্দে কি বুঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান; অন্নবস্ত্রদান সর্বনিম্নে। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যা দান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি প্রাণদান পর্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান অপেক্ষা অন্যান্য সব কাজ নিম্নস্তরের। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত উৎস।

এই ত্যাগের দেশ—ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় ধর্মের অপরোক্ষানুভূতির এরূপ দৃষ্টান্ত পাইবে? পৃথিবী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর—অন্যান্য দেশে অনেক বড় বড় কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখানে—কেবল এখানেই এমন মানুষ পাওয়া যায়, যিনি ধর্মকে জীবনে পরিণত করিয়াছেন। বড় বড় কথা বলাই ধর্ম নয়; তোতাপাখিও কথা কয়, আজকাল কলেও কথা বলে; কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহার মধ্যে ত্যাগ আধ্যাত্মিকতা তিতিক্ষা ও অনন্ত প্রেম বিদ্যমান। এই-সকল গুণ থাকিলে তবে তুমি ধার্মিক পুরুষ। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং আমাদের দেশে এমন মহৎ জীবনসমূহ উদাহরণস্বরূপ রহিয়াছে, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা-রত্নগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ-সকল তত্ত্ব শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে তাহা নহে, সমগ্র জগতে ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই দেখিবে—তুমি নিজেরই কল্যাণ করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্মকে ভালবাস, যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য শাস্ত্রাদি হইতে এই রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারগণকে দিতে হইবে—এই মহাব্রত-সাধনে প্রাণ পণ করিতে হইবে।

সর্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়! শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হইতেছি—আমরা সর্বদাই পরস্পরকে হিংসা করিতেছি। অমুক কেন আমা অপেক্ষা বড় হইল, আমি কেন তাহা অপেক্ষা বড় হইলাম না—অহরহঃ আমাদের এই চিন্তা! এমন কি ধর্মকর্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে ভয়ানক কোন পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষাপরতা। সকলেই আদেশ করিতে চায়, আদেশ পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে! প্রথমে আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে। ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে-সব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন—আমরা ভক্তি ও স্পর্ধার সহিত তাঁহাদের কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এখন আমাদের কাজ করিবার সময়—আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ যেন গৌরবের সহিত আমাদের এই কার্যকলাপের আলোচনা করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত হউন না কেন, প্রভুর আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন সব কাজ করিব, যাহা দ্বারা তাঁহাদেরও গৌরব-রবি ম্লান হইয়া যাইবে।

# ৩. পাম্বান-অভিনন্দনের উত্তর

[জাফনা হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া স্বামীজী ২৬ জানুআরী ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পাম্বান দ্বীপে পৌঁছিলেন। জেটির নিম্নে এক চন্দ্রাতপতলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। রামনাদের রাজাও হৃদয়ের আবেগে স্বামীজীকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের পর স্বামীজী ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম পাম্বানে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ রামনাদের রাজা সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। স্বামীজী এখানে নিম্নোক্তভাবে উত্তর প্রদান করিলেনঃ]

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে—কেবল এখানেই ত্যাগ-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে; এখানে—কেবল এখানেই অতিপ্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

আমি পাশ্চাত্যদেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি—অনেক দেশ পর্যটন করিয়াছি, অনেক জাতি দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়—প্রত্যেক জাতিরই এক-একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য; বুদ্ধিবলে বিজ্ঞানসাহায্যে যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য দেখান যায়, ইহাও সত্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে। ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কর্মকুশল। আজকাল আমাদের শেখানো হয়—হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা; যে সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাই, তাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল হইয়াছে যে,

অন্যান্য দেশের লোকের নিকট ইহা একটি কিংবদন্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা। ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, এ-কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্মপরায়ণ, অন্য কোন দেশেই সেরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান্ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর তাহার মহামহিমময় জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণেএই জাতি যেন অবিনাশী অক্ষয় নবযৌবন লাভ করিতেছে। ভারতে কর্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু উহা অপরের দৃষ্টিপথে না পড়িবার কারণ—যে যে- কাজটি করে বা ভাল বোঝে, সে সেটিকেই মাপকাঠি করিয়া অপরের বিচার করে; ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি! মুচি জুতাসেলাই বোঝে, মিস্ত্রী গাঁথনিই বোঝে—পৃথিবীতে যে আর কিছু করিবার বা জানিবার আছে, ইহা তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোকের স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না; কারণ আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—সেই সীমার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাই না। যোগী কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞলোকের জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিতরের বস্তু দেখিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। ভারতকে পৃথিবীর সকল জাতির জন্য এই আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগাইতে হইবে। এখানেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এখন আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন নিবন্ধ ভারতবাসীর সনাতন বিশেষত্বের পরিচায়ক এই আদর্শটি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে কোন প্রচারক হিন্দু আদর্শ প্রচারের জন্য ভারতের বাহিরে যান বা না যান, এখন কিন্তু যাইতেই হইবে; পৃথিবীতে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকি।’ ধর্মের ইতিহাস গবেষণা করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে-কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতিশাস্ত্র প্রচলিত, সেই-জাতিই উহার কতক অংশ

আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, আর যে-সকল ধর্মে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট, সেগুলিও মুখ্য বা গৌণভাবে আমাদের নিকট হইতেই ঐ ভাব গ্রহণ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার-দস্যুতা-জুলুম প্রভৃতি হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসনা জয় না করিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখনও মুক্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর সব জাতিই এখন এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। শিষ্য যখন এই সত্য ধারণা করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়। ভগবান্ অনন্ত কাল সকল ধর্মের মানুষের প্রতি প্রভূত দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল ধর্মেরই ঈশ্বর—এই উদার ভাব কেবল ভারতেই বর্তমান। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এরূপ উদার ভাব দেখাও তো!

বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ বড় সঙ্কটময় ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিগুলি আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। ভারতসন্তানগণের এখন কর্তব্য—সমগ্র পৃথিবীকে মানব-জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য নিজেদের উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলা। ভারতবাসীরা সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম শিখাইতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এক একটি বিষয় আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি। অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ ও বড় লোকেরা পার্বত্যদুর্গনিবাসী, পথিকের সর্বলুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারনগণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ দেখাইতে পারিলে বড় আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন; আমরা হিন্দুগণ কিন্তু পর্বতগুহানিবাসী ফলমূলাহারী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ মুনিঋষির বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি। আমরা এখন অবনত ও হীন হইয়া পড়িতে পারি, কিন্তু যদি আমাদের ধর্মের জন্য আমরা প্রাণ পণ করি, তবে আবার আমরা মহৎ পদবীতে উন্নীত হইতে পারিব।

আপনারা আমাকে যে আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সেজন্য আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রামনাদের রাজা আমার প্রতি যে-ভালবাসা দেখাইয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যদি আমাদ্বারা

কিছু সৎকার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহানুভব রাজার নিকট ঋণী; কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়, তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উৎসাহিত করেন। তিনি এখন আমার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরও অধিক কাজের আশা করিতেছেন। যদি তাঁহার মত আরও কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

# ৪. রামেশ্বর-মন্দিরে বক্তৃতা

[মহাসমারোহে পাম্বান হইতে স্বামীজীকে রামাশ্বরে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে তিনি একদিন রামেশ্বর-মন্দির দর্শন করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমবেত জনগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে বলা হইল। স্বামীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন, নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন।]

ধর্ম অনুরাগে,—বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম। যদি দেহ-মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ-মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধচিত্ত হইয়াও অপরকে ধর্মশিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গমাত্র—মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজায় কোন ফললাভ হয় না। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে—তাহারা যাহা খুশি করুক না কেন, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ অপবিত্রভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ, সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, সেখানে পবিত্রভাবোদ্দীপক অন্যান্য বস্তুও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাস করেন, অথচ সেখানে একটিও মন্দির না থাকে, তবে সেই স্থানকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি সেখানে অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার; কারণ অন্য স্থানের পাপ তীর্থে খণ্ডিত হয়, কিন্তু তীর্থে কৃত পাপ কিছুতেই দূরীভূত হয় না। সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবের উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে-ব্যক্তি

কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা যে জাতি- ধর্মনির্বিশেষে একটি মাত্র দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।

কোন ধনী ব্যক্তির একটি বাগান ছিল এবং দুইটি মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজ করিত না; কিন্তু প্রভু আসিবামাত্র করজোড়ে 'প্রভুর কিবা রূপ, কিবা গুণ!' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালীটি বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাক-সবজি উৎপন্ন করিত ও সেইগুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বল দেখি, এই দুই জন মালীর মধ্যে প্রভু কাহাকে অধিকতর ভালবাসিবেন? এইরূপে শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যানস্বরূপ, আর এখানে দুই প্রকার মালী আছে। এক প্রকার মালী অলস কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপের—তাঁহার চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর এক প্রকার মালী আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র দুর্বল সন্তানগণের জন্য, তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট ভক্তের মধ্যে কে শিবের প্রিয়তর হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন। যিনি পিতার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আগে তাঁহার সন্তানগণের সেবা করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে শিবের সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে-কেহ তোমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইভাবে পরের সেবা করা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের ভিতরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও অসৎ-ভাবের মলিনতা রহিয়াছে। সবচেয়ে বড় পাপ

স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে—আমি আগে খাইব, আমি অপরের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব, আমি সর্বসম্পদের অধিকারী হইব; যে মনে করে—আমি অপরের আগে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের আগে মুক্তিলাভ করিব, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমার পালা সকলের শেষে; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক—পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সে-ই অধিক ধার্মিক, সে-ই শিবের সামীপ্য লাভ করে; সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিকতর নিকটবর্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

# ৫. রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত সে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার হইতেছে—নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, যেন কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।

হে রাজন, হে রামনাদবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, সেজন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আমার প্রতি যে আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। কারণ মুখের ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে ভাববিনিময় অতি অপূর্ব—আত্মা নীরবে অথচ অভ্রান্ত ভাষায় অপর আত্মার সহিত আলাপ করেন, তাই আমি আপনাদের ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হে রামনাদাধিপ, আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য যদি এই দীন ব্যক্তি-দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে যদি কোন কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যদি নিজ গৃহেই অজ্ঞাত ও গুপ্তভাবে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাজির প্রতি আমাদের স্বদেশবাসীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহারা অজ্ঞতাবশে তৃষ্ণার তাড়নায় প্রাণত্যাগ না করিয়া বা অপর স্থানের মলিন

পয়ঃপ্রণালীর জলপান না করিয়া তাহাদের গৃহের নিকটবর্তী অফুরন্ত নির্ঝরের নির্মল জল পান করিতে আহূত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্মপরায়ণ করিবার জন্য—রাজনীতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে যে ভারতও মরিয়া যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি কিছু করা হইয়া থাকে, হে রামনাদাধিপ, ভারত অথবা ভারতেতর দেশে আমাদ্বারা কৃত কার্যের জন্য প্রশংসার ভাগী আপনি। কারণ, আপনিই আমার মাথায় প্রথম এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আপনিই পুনঃপুনঃ আমাকে কার্যে উত্তেজিত করেন। আপনি যেন অন্তর্দৃষ্টিবলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া আমাকে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, কখনই উৎসাহদানে বিরত হন নাই। অতএব আপনি যে আমার সফলতায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমি যে দেশে ফিরিয়া আপনার রাজ্যেই ভারতের মৃত্তিকা প্রথম স্পর্শ করিলাম, ইহা ঠিকই হইয়াছে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের রাজা পূর্বেই বলিয়াছেন—আমাদিগকে বড় বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বলুন, অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এই সব-কিছুরই প্রসূতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান, আর পৃথিবী সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই-সব বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। গত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে অনেক গুরুতর রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্যদেশের সর্বত্রই বড় বড় সম্প্রদায় উঠিয়া বিভিন্ন দেশের প্রচলিত নিয়মপদ্ধতিগুলি একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হইতেছে; আমাদের দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এই-সকল কথা কিছু শুনিয়াছে কিনা। কিছুই শুনে নাই। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, ভারত হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া সেখানে সাদরে গৃহীত হন এবং

সেই অবধি পাশ্চাত্যদেশে কার্য করিতেছিলেন—এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুকও তাহা জানে। লোকে বলিয়া থাকে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থূলবুদ্ধি, তাহারা দুনিয়ার কোন প্রকার সংবাদ রাখে না, রাখিতে চাহেও না। পূর্বে আমারও ঐ-প্রকার মতের দিকে একটা ঝোঁক ছিল; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কাল্পনিক গবেষণা অথবা ক্ষিপ্রগতিতে দেশ-দর্শক ও ভূ-পর্যটকগণের লিখিত পুস্তক-পাঠ অপেক্ষা অভিজ্ঞতা অনেক বেশী শিক্ষাপ্রদ।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্বোধও নহে বা তাহারা যে জগতের সংবাদ জানিতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যেমন সংবাদ-সংগ্রহে আগ্রহশীল, ইহারাও সেইরূপ। তবে প্রত্যেক জাতিরই জীবনের এক-একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ সুর সংযোজন করিতেছে। উহাই তাহার জীবনীশক্তি। উহাই তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র—একমাত্র ধর্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্য-বলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এই-সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহার সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি-সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক অপেক্ষা আমাদের দেশের সামান্য কৃষকের পর্যন্ত এই-সকল তত্ত্বসম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান আছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই জন্যই শত শত বর্ষের অত্যাচার এবং প্রায় সহস্র বর্ষের বৈদেশিক শাসনের পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা-রূপ যে নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইবে এবং রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্ধমৃত হীনদশাগ্রস্ত পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মত-মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারত-গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালে-মানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা; কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান সুর যেন ভৈরবরাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ত্যাগের ভৈরবরাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতীয় সকল শাস্ত্রেরই এই কথা, ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন তো ক্ষণিক। ইহার পশ্চাতে, দূরে—অতি দূরে সেই অনন্ত অপার রাজ্য; যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহাবীর মনীষিগণের হৃদয়জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; তাঁহারা এই তথাকথিত অনন্ত জগৎকেও একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপ-মাত্র জ্ঞান করেন; তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কালের—অনন্ত কালেরও অস্তিত্ব সেখানে নাই; তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে—অতি দূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও অস্তিত্ব নাই—তাঁহারা তাহারও পারে যাইতে চান। ইহাই ধর্মের গূঢ়তম রহস্য। প্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক—যতই ক্ষতিস্বীকার করিয়া হউক—সাহস করিয়া প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া অন্ততঃ একবারও চকিতের মত সেই দেশ-কালাতীত সত্তার দর্শনচেষ্টাই আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য। তোমরা যদি আমাদের জাতিকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিয়া উঠিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজসংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কান দিয়া শুনিবে, অপর কান দিয়া সে-সব বাহির হইয়া যাইবে। অতএব পৃথিবীকে তোমাদের ধর্মের শিক্ষাই দিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন এই—পৃথিবীর নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি? সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে; কি-রূপে সঙ্ঘ গঠন

করিয়া পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও দেশের সকল লোক যতদিন না সম্পূর্ণ ত্যাগ-স্বীকারে সমর্থ হইতেছে, ততদিন সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের নিকট পূর্বোক্ত বিষয়গুলি কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগসুখকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়-জগৎকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমিতে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার- সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, এই সভায় দাঁড়াইয়া আমি তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও-সব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।

তথাপি আমাদের যে-সব ভ্রাতারা এখনও উচ্চতম সত্যের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের পক্ষে হয়তো এক প্রকার জড়বাদ কল্যাণের কারণ হইতে পারে—অবশ্য উহাকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটি বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই—যে-ভারতে পূর্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই, কিছুদিন যাবৎ সেখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। সেই ভ্রম এইঃ অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা-দান। প্রকৃতপক্ষে সকলের পথ এক নহে। তুমি যে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমার সেই একই প্রণালী নাও হইতে পারে। তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। সংসারের সুখসমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যে তাহা না করে, সে হিন্দু নহে; তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, সে শাস্ত্র অমান্য করে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার—তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ। যখন পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসার-রূপ ফলের ভিতরটা ভুয়া—আমড়ার মত উহার ‘আঁটি ও চামড়া’ই সার, তখন

সংসার ত্যাগ করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে ফিরিবার চেষ্টা কর। মন যেন চক্রগতিতে সম্মুখে ইন্দ্রিয়ের দিকে ধাবমান হইতেছে—উহাকে আবার ফিরিয়া পশ্চাতে আসিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই আদর্শ। কিন্তু কিছু পরিমাণ অভিজ্ঞতা হইলে তবে এই আদর্শ ধরিতে পারা যায়। শিশুকে ত্যাগের তত্ত্ব শেখানো যায় না। সে জন্মাবধি আশার স্বপ্ন দেখিতেছে। ইন্দ্রিয়েই তাহার জীবনের অনুভূতি, তাহার জীবন কতকগুলি ইন্দ্রিয়সুখের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক সমাজে শিশুর মত অবোধ মানুষ আছে। সংসারের অসারতা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু সুখভোগের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে—তবেই তাহারা বৈরাগ্যলাভে সমর্থ হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্ন্যাসীদের নিয়মে বাঁধিবার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তিকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধা হইয়াছে; তাহার পক্ষে এইগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার কাজের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারা একটু সুখভোগ করিয়া লউক। দেখিবে—সে ক্রমশঃ উন্নত হইবে, ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ত্যাগের ভাব আপনা-আপনি আসিবে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, ভোগের ব্যাপারে কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, আজকাল আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। এখন আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দু-সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা। এই দুইটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু-সমাজকেই বাছিয়া লইব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব পাইয়াছে—সেগুলির মধ্যে

সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই; সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদহজম হওয়ায় সে সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান নয়—তাহার মাথা বোঁ বোঁ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। সে যাহা কিছু করে, তাহার প্রেরণা-শক্তি কোথায়? ইংরেজ কিসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুটা 'বাহবা' দিবে, ইহাই তাহার সকল কাজের অভিসন্ধির মূলে! সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ-সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ! আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ কেন?—কারণ সাহেবরা এইরূপ বলিয়া থাকে! এইরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মরিয়া যাও। জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর– দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পন্থাবলম্বী ব্যক্তিগণ 'মানুষ' ছিলেন—তাঁহাদের একটা দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু এই সামঞ্জস্যহীন ভারসাম্যহীন জীবগণ এখনও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে কি বলিব—পুরুষ, না স্ত্রী, না পশু? তবে তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন আদর্শ-স্থানীয় ব্যক্তি আছেন। তোমাদের রাজা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু দেখিতে পাইবে না; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বিষয়েই বিশেষ সংবাদ রাখেন, এমন রাজা ভারতে আর একটি বাহির করিতে পারিবে না। ইনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় ভাবেরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—উভয় জাতির যাহা ভাল, তাহাই ইনি গ্রহণ করিয়াছেন। মনু মহারাজ তৎকৃত সংহিতায় বলিয়াছেনঃ

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি || ৫

শ্রদ্ধাপূর্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম অর্থাৎ মুক্তিমার্গের উপদেশ লইবে। নীচকূল হইতেও বিবাহের জন্য উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

মনু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া

লও; যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর। তবে একটি কথা মনে রাখিও—তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, তাহাই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ ধর্মের নিম্নে স্থান গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অতীত জন্মের কর্মফলে তাহার জীবনের এই নির্দিষ্ট গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। তোমরাও প্রত্যেকে এক বিশেষ ব্রতসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। মহামহিমময় হিন্দুজাতির অনন্ত অতীত জীবনের সমুদয় কর্মসমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দেশক। সাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতৃপুরুষ তোমাদের প্রত্যেক কার্য লক্ষ্য করিতেছেন! কি সেই ব্রত, যাহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জন্ম? মনু মহারাজ অতি স্পর্ধার সহিত ব্রাহ্মণের জন্মের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই?—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে || ৬

'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'—ধর্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জন্ম। আমি বলি, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে-কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। অন্যান্য সকল বিষয়কেই আমাদের জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্যের অধীন করিতে হইবে। সঙ্গীতে যেমন একটি প্রধান সুর থাকে—অন্যান্য সুরগুলি তাহার অধীন, তাহারই অনুগত হইলে তবে সঙ্গীতে 'লয়' ঠিক হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। এমন জাতি থাকিতে পারে, যাহাদের মূলমন্ত্র রাজনীতিক প্রাধান্য; ধর্ম ও অন্যান্য সমুদয় বিষয় অবশ্যই তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নিম্নস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়াছে, যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম ও বৈরাগ্য; যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র—এই জগৎ অসার, দুদিনের ভ্রমমাত্র; ধর্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু—জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভোগ-ঐশ্বর্য নাম-যশ ধন-দৌলত—সব-কিছুরই স্থান উহার নিম্নে।

তোমাদের রাজার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব, তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যা ধনমান পদমর্যাদা সবই ধর্মের অধীন—ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন; এই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা হিন্দুজাতির—প্রত্যেক হিন্দুর জন্মগত সংস্কার। সুতরাং পূর্বোক্ত দুই প্রকার

লোকের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহার মধ্যে হিন্দুজাতির জীবনের মূলশক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, যাহার মধ্যে আর কিছু নাই– আর একজন, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি নকল হীরা-জহরত লইয়া বসিয়া আছে, অথচ যাহার ভিতর সেই জীবনপ্রদ শক্তিসঞ্চারী আধ্যাত্মিকতা নাই–এই উভয় সম্প্রদায়ের যদি তুলনা করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস–সমবেত শ্রোতৃবর্গ সকলে একমত হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হইবেন। কারণ এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকটা আশা করিতে পারা যায়–তাহার একটা অবলম্বন আছে, জাতীয় মূলমন্ত্র তাহার প্রাণে জাগিতেছে, সুতরাং তাহার বাঁচিবার আশা আছে; শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; যেমন ব্যক্তিগত ভাবে বলা চলে–যদি মর্মস্থানে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, জীবনের গতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে অন্য কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক না কেন, তাহাকে সাংঘাতিক বলা হয় না, কারণ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা তাহাদের ক্রিয়া জীবন- ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে; সেইরূপ মর্মস্থানে আঘাত না লাগিলে আমাদের জাতির বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে–যে ভিত্তির উপর সুবিশাল জাতীয় সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে–সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, ইহাই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ–আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্মসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, প্রাণপণে তাহা ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশের বড় বড় রাজারা নিজদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন-দুর্গনিবাসী, পথিকদের সর্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যুব্যারনগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্তে অরণ্যবাসী অর্ধনগ্ন মুনিঋষির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন?তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, শোন–আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ। অন্যান্য দেশে বড় বড় ধর্মাচার্যগণও নিজেদের কোন প্রাচীন রাজার

বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, আর এখানে বড় বড় রাজারা নিজেদের কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিখিবার, তাহা শিখিয়া লও; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্বমহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; আমার বিশ্বাস—ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা মহত্তর ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরদের এই অপূর্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি বলিতেছি—নিশ্চয় তাঁহারা পরলোকে নিজ নিজ স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণের এরূপ মহিমা, এরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া নিজদিগকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিবেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নয়। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিত ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত  কর।

যিনি শৈবদের শিব, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, কর্মীদের কর্ম, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, জৈনদের জিন, ঈশাহী ও য়াহুদীদের য়াভে, মুসলমানদের আল্লা, বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম—যিনি সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্বব্যাপী পুরুষের সম্পূর্ণ মহিমা কেবল ভারতই জানিয়াছিল, প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল ভারতই লাভ করিয়াছিল, আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তোমরা হয়তো আমার এই কথায় আশ্চর্য হইতেছ, কিন্তু অন্য কোন ধর্মের শাস্ত্র হইতে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বাহির কর দেখি। অন্যান্য জাতির এক-একজন জাতীয় ঈশ্বর বা জাতীয় দেবতা—য়াহুদীর ঈশ্বর, আরবের ঈশ্বর ইত্যাদি;

আর সেই ঈশ্বর আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা, তিনি যে পরম দয়াময়, তিনি যে আমাদের পিতা মাতা সখা, প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা—এই তত্ত্ব কেবল ভারতই জানিত। সেই দয়াময় প্রভু আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদিগকে শক্তি দিন, যাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ ||
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ || ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ|| হরি ওঁ||

আমরা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন অন্নের মত আমাদের পুষ্টিবিধান করে, উহা আমাদের বলস্বরূপ হউক, উহা দ্বারা আমাদের এমন শক্তি উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারি। আমরা—আচার্য ও শিষ্য যেন কখনও পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ॥

# ৬. পরমকুডি অভিনন্দনের উত্তর

আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নসহকারে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন তো বলিতে চাই—লোকে আমাকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনাই করুক বা অবজ্ঞা করিয়া এখান হইতে তাড়াইয়া দিক, তাহাতে স্বদেশের প্রতি, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু তারতম্য হইবে না; কারণ আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি যে, কর্ম নিষ্কাম- ভাবে করা উচিত; আমাদের ভালবাসাও নিষ্কাম হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যদেশে যে কাজ করিয়াছি, তাহা অতি সামান্যই; এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই, যিনি আমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কাজ করিতে না পারিতেন। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যে-দিন মহামনীষী ধর্মবীরগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতের অরণ্যরাজি হইতে সমুত্থিত ও ভারত-ভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের বাণী ভারতের বাহিরে জগতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করিবেন।

মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির মধ্যেই যেন একটা সংসার-বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে। তাহারা দেখে, তাহারা যে-কোন পরিকল্পনা করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফসকাইয়া যাইতেছে—প্রাচীন আচার-প্রথাগুলি সব যেন ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সব আশা-ভরসা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সবই যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে!

পৃথিবীতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছেঃ এক—ধর্মভিত্তির উপর; আর এক—সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি— আধ্যাত্মিকতা, অপরটির—জড়বাদ; একটির ভিত্তি—অতীন্দ্রিয়বাদ, অপরটির—প্রত্যক্ষবাদ। একটি এই ক্ষুদ্র জড়জগতের সীমার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে এবং এমন কি, অপরটির সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়াই জীবন যাপন করিতে সাহসী হয়; অপরটি নিজের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিতে পায়, তাহার উপর জীবনের

ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত; সে আশা করে, ইহারই উপর সারা জীবন দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিবে।

আশ্চর্যের বিষয়, কখনও কখনও অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তারপরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে, যেন তরঙ্গের গতিতে একটির পর আর একটি আসিয়া থাকে! এক দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—দেশ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হয়; যে-শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, যাহাতে অধিক সুখলাভের উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৈভাগ্যসম্পদ হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষাদ্বেষও প্রবল আকার ধারণ করে—পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখন যুগধর্ম হইয়া পড়ে। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'—এই প্রকার স্বার্থপরতাই তখন মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর মানুষ চিন্তা করিতে থাকে—জীবনের সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ধর্ম সহায় না হইলে, জড়বাদের গভীর আবর্তে ক্রমশঃ মজ্জমান পৃথিবীর সাহায্যে ধর্ম অগ্রসর না হইলে, জড়বাদের গভীর আর্বতে ক্রমশঃ মজ্জমান পৃথিবীর সাহায্যে ধর্ম অগ্রসর না হইলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তখন মানুষ নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া নব অনুরাগে নূতনভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন ভিত্তির পত্তন করে। তখন ধর্মের আর এক বন্যা আসে। কালে আবার উহারও অবনতি হয়।

প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়, যাহার পার্থিব ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করে। ইহার অব্যবহিত ফল—পুনরায় জড়বাদের দিকে প্রতিক্রিয়া। জড়বাদের দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে শত শত বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার একচেটিয়া দাবী আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নয়, সর্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যক্তির করায়ত্ত হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্বসাধারণের ঘাড়ে

চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়। এই সময় জড়বাদ দ্বারাও বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে।

যদি আপনারা আমাদের মাতৃভূমি ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিবেন—এখানে এখন সেইরূপ ঘটিতেছে। ইওরোপে আপনাদের জাতীয় উত্তরাধিকার ধর্ম প্রচার করিতে একজন গিয়াছিলেন; সেইজন্যই আজ আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। ইহা অসম্ভব হইত, যদি না ইওরোপীয় জড়বাদ ইহার পথ করিয়া দিত। সুতরাং এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে, উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে; অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট যে- অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল এবং যাহার ব্যবহার তাহারা নিজেরাও ভুলিয়া গিয়াছিল, জড়বাদ তাহা সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্ধভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অপরার্ধ এমন সব লোকের হাতে আছে, যাহারা গরুর জাবের পাত্রে শয়ান সেই কুকুরের মত—নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না!

অপর দিকে আবার আমরা ভারতে যে-সকল রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি ইওরোপে যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছে, শত শতাব্দী ধরিয়া ঐগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে; আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন-সাধনে অসমর্থ, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইওরোপের রাজনীতিক প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, আর এখন ইওরোপ অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছে—কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। ঐহিক ব্যাপারে অত্যাচার প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে; তাহারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে। ধর্ম ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই তাহাদের পদতলে। তাহারাই সর্বেসর্বা শাসনকর্তা। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় 'শাইলক'-এর শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেণ্ট-মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র।

পাশ্চাত্য দেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে; প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতদের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। ধনী ও পুরোহিত পরস্পরকে শাসনে রাখিবে।

মনে করিবেন না, ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে। নিরপেক্ষ ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সমান করিয়াছেন। অতি অধম অসুরপ্রকৃতি মানুষেরও এমন কিছু গুণ আছে, যাহা একজন বড় সাধুর নাই। নগণ্য কীটেরও এমন কিছু গুণ থাকিতে পারে, যাহা হয়তো মহাপুরুষের নাই।

অতি দরিদ্র শ্রমজীবী, যাহার জীবনে ভোগ করিবার কিছু নাই, যাহার তোমার মত বুদ্ধি নাই, যে বেদান্তদর্শনাদি বুঝিতে পারে না—মনে করিতেছ, তাহার শরীর কিন্তু তোমার মত কষ্টে অত কাতর হয় না। দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হইলে সে তোমা অপেক্ষা শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাহার প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়গত; সেখানেই তাহার সুখভোগ। সুতরাং তাহার জীবনে যেমন একপ্রকার সুখের অভাব, অপর দিকে তেমনি অন্যপ্রকার সুখের আধিক্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে—তাহার জীবনেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুতরাং ভগবান্ সকলকেই নিরপেক্ষভাবে ইন্দ্রিয়জ, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুখ দিয়াছেন। অতএব মনে করিও না, আমরাই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা।

আমরা—ভারতবাসীরা অপরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি বটে, অপরের নিকট আমরা অনেক বিষয় শিক্ষাও করিতে পারি। আমরা পৃথিবীকে যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, পৃথিবী তাহার জন্য এখন অপেক্ষা করিতেছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারি-বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। আপনারা দেখিবেন, যে-সকল দেশ হইতে পশুবলে জগৎশাসন করিবার নীতির উদ্ভব, সেই-সকল স্থানেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই-সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড়শক্তির লীলাভূমি ইওরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর

স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্মই ইওরোপকে রক্ষা করিবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন একটি সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা দ্বারা সমগ্র জগতের ভাবস্রোত পরিবর্তিত হইতে পারে। সেই সাধারণ ভিত্তি—জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্বত্র হিন্দু জৈন বৌদ্ধ—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, আত্মা সর্বশক্তির আধার। আর তোমরা বেশ জান, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। এগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতার আবরণে আবৃত রহিয়াছে। প্রকৃত 'তুমি' কিন্তু অনাদিকাল হইতেই পূর্ণ অচল অটল সুমেরুবৎ। আত্মসংযমের জন্য বাহিরের সাহায্য কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পূর্ব হইতেই তুমি আত্মসংযত, শুধু জানা এবং না-জানাতেই অবস্থার তারতম্য, এইজন্য শাস্ত্রে অবিদ্যাকেই সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ ও মানুষে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?—কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্বোচ্চ মানুষ এবং তোমার পদতলে অতি কষ্টে বিচরণকারী ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে?—অজ্ঞানই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ অতি কষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ব্রহ্ম রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে, কারণ ইহা আর কোথাও নাই। ইহা আধ্যাত্মিকতা—ইহাই আত্মবিজ্ঞান।

কিসের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে?—শক্তির জোরে। এই বলবীর্যই ধার্মিকতা, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞান- রাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে তাহা—'অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে।

কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসে। এখন প্রশ্ন—এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে? আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার তুমি উত্তরাধিকারী—তুমি সেই ঈশ্বরের অংশ। শুধু তহাই নহে, অদ্বৈত- মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম—তুমি স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি; আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়—আমরা কেবল এই দ্বন্দ্ব করিতেছি।

'আত্মায় সকল শক্তি নিহিত'—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দিবে। এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর একভাবে প্রতিভাত হইবে এবং পূর্বে তুমি নরনারী ও প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন তাহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না; তখন আর মনে হইবে না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেই এই পৃথিবীতে নরনারীর জন্ম—এখানে বলবান্ জয়লাভ করিবে ও দুর্বল মরিবে।তখন বোধ হইবে, এই পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান্ শিশুর মত এখানে খেলিতেছেন, আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কাজের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস মনে হউক –ইহা খেলামাত্র! আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার মনে করিতেছি। আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে অতি দুর্বল অধঃপতিত হতভাগ্য পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছেন—নিরাশ হইও না; তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখনও পরিবর্তন হয় না; তুমি কখনও তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে পার না, প্রকৃতি কখনও প্রকৃতির বিনাশসাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু পরিণামে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কারণেই অদ্বৈতবাদ সকলের নিকট আশার বাণীই বহন করিয়া আনে, নৈরাশ্যের নয়। বেদান্ত কখনও ভয়ে ধর্ম আচরণ করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে, শয়তান সর্বদা তোমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে; যদি তোমার একবার পদস্খলন হয়, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে!

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই; বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে–তোমার কর্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, অপর কেহ তোমার হইয়া এই শরীর গঠন করে নাই। সেই সর্বব্যাপী ভগবান্ তোমার অজ্ঞানবশতঃ অব্যক্ত রহিয়াছেন; আর তুমি যে-সব সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ, এগুলির জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি এই ভয়াবহ জগতে আনীত হইয়াছ। তোমাকে জানিতে হইবে–তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি নিজেই আহার করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া আহার করে না। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করিয়া লও–অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে না; তুমিই ঐ খাদ্য হইতে রক্ত-মাংসের দেহ প্রস্তুত করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলের এক অংশের গঠনপ্রণালী জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটিকেই জানিতে পারা যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, বর্তমানে তুমি নিজ শরীর গঠন করিতেছ, তবে ইহাও সত্য যে, অতীতেও তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, ভবিষ্যতেও করিবে। আর ভাল-মন্দ সব-কিছুরই দায়িত্ব তোমার। ইহা বড়ই আশার কথা যে, আমি যাহা করিয়াছি, আমিই তাহা নষ্ট করিতে পারি।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কর্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধর্ম ভগবৎকৃপা অস্বীকার করেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শুভাশুভরূপ এই ঘোর সংসার- প্রবাহের পরপারে ভগবান্ রহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য নিত্যকৃপাময়, সর্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার-সাগরের পারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কৃপার সীমা নাই; আর রামানুজ বলেন, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটেই এই কৃপা আবির্ভূত হয়।

আত্মবিজ্ঞান-প্রদত্ত সমাজ-জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিই ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীতে নূতন সমাজের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম–অদ্বৈতবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইতে পাশ্চাত্যদেশ এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে। কারণ এই জড়বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ–এই-সকলের বড় একটা মূল্য নাই।

তবে যদি কেহ খুব অমার্জিত অনুন্নত ধর্মপ্রণালীতেও বিশ্বাস করে, আমাদের ধর্মে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, যাহাতে পৃথিবীর সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে, যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চায়, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্যই করিবে। বলিতে কি, সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে-সকল উচ্চ উচ্চ ভাব ও তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাইবে না। আবার যদি কেহ খুব যুক্তিবাদী হইতে চায়, নিজের তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চায়, তবে আমরা তাহাকেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ-রূপ প্রবল যুক্তিসহ মতবাদ শিক্ষা দিতে পারি।

# ৭. মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

আপনারা আমাকে যে–আন্তরিকতা অভিনন্দন জানাইয়াছেন, সে জন্য আপনাদের নিকট যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়াছি, তাহা ভষায় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। দুঃখের বিষয়, প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নয় যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুটি আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছে বটে, তথাপি আমার একটা স্থূল-শরীর আছে–হইতে পারে শরীরধারণ বিড়ম্বনা, কিন্তু উপায় নাই। আর স্থূল-শরীর জড়ের নিয়মানুসারেই চালিত হইয়া থাকে, তাহার ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যদেশে আমার দ্বারা যে সামান্য কাজ হইয়াছে, সেজন্য ভারতের প্রায় সর্বত্র লোকে যেরূপ অপূর্ব আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিবার জিনিষ মত। তবে আমি ঐ আনন্দ ও সহানুভুতি কেবল এইভাবে গ্রহণ করিতেছিঃ ভবিষ্যতে যে-সব মহাপুরুষ আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে ঐগুলি প্রয়োগ করিতে চাই। আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে সামান্য কার্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এত অধিক প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে-সব বড় বড় দিগ্বিজয়ী ধর্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত অধিক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন।

ভারত ধর্মভূমি। হিন্দু ধর্ম বুঝে–কেবল ধর্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ধর্মই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, ইহা সত্য। সকলেরই দোকানদার বা স্কুলমাস্টার বা যোদ্ধা হইবার কোন প্রয়োজন নাই; এই সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে।

সম্ভবতঃ আমরা বিভিন্ন জাতির এই ঐক্যতানে আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত। আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের যাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে- কোন জাতি গৌরব অনুভব করিতে পারে—তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে মহান্ তত্ত্বরাশি পাইয়াছি, সেগুলি যে আমরা এখনও হারাই নাই, ইহা দেখিয়াই আমার আনন্দ হইতেছে। ইহাতে আমাদের জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা—শুধু আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। আমার প্রতি কৃত যত্নের জন্যই আমার আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতির হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহাতেই আমার পরমানন্দ। এখনও এই জাতির হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে; কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্ত্যেরা আমাদিগকে কর্মকুশল দেখিতে চায়, কিন্তু ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা নাই বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মনের মত কর্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে; আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সক্রিয় দেখিতে চাই, আমরাও সেইরূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্ত্যেরা আসিয়া দেখুক, আমরা তাহাদেরই মত কর্মশীল; দেখিয়া যাক, জাতি কিভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে, পূর্বের মতই প্রাণবন্ত রহিয়াছে। আমরা যে অধঃপতিত হইয়াছি—এই ধারণাই দূর করিয়া দাও।

আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি যে অক্ষুণ্ণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি আমাকে এখন গোটাকতক রূঢ় কথা বলিতে হইবে। আশা করি, আপনারা সেগুলি ভালভাবেই গ্রহণ করিবেন। এইমাত্র আপনারা অভিযোগ করিলেন যে, ইওরোপীয় জড়বাদ আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে। আমি বলি, দোষ শুধু ইওরোপীয়দের নয়, দোষ প্রধানতঃ আমাদের। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন আমাদিগকে সর্বদাই সকল বিষয় ভিতরের দিক হইতে—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয়ই জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী

প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।

ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, 'যখন অফুরন্ত নির্ঝর নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণই বা তৃষ্ণায় মরিবে কেন?' প্রশ্ন এইঃ ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না? আমি ইংলণ্ডেও এক সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্বে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, 'কেবল এই উপায়েই আমি লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।' আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুকে হাত রাখিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করুক দেখি—আমরা কি করিয়াছি; আর নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া উহার আলোকবিস্তারে কতটা সহায়তা করিযাছি? আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম। এজন্য অপর কাহাকেও দোষ দিও না, দোষ দাও নিজেদের কর্মকে। যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ—কিছুই কি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? পাপ, দূষিত খাদ্য ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা দেহ পূর্ব হইতেই যদি দুর্বল না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু মনুষ্যদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে। আমরা তো তাহাদিগকে পূর্বে সাহায্য করি নাই, সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপ করিবার পূর্বে প্রথমে নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত; এখনও প্রতিকারের সময় আছে।

প্রথমেই—ঐ যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ! বড় বড় কর্তা-ব্যক্তিরা শত শত বৎসর ধরিয়া এই মহাবিচারে ব্যস্ত যে—এক ঘটি জল ডান-হাতে কি বাঁ-হাতে খাইব, হাত তিনবার ধুইব না চারবার; কুলকুচা করিব পাঁচবার কি ছয়বার! যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় দর্শন লিখিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করা যায়? আমাদের ধর্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে—এইরূপ এক আশঙ্কা রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই, আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—'আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র!' যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা-গারদে যাইতে হইবে!

মন যখন জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন ইহা মস্তিস্কের দুর্বলতার নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিক তত্ত্বের গবেষণা করিতে মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়; নিজের সমুদয় তেজ, কার্যকরী শক্তি ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে; আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যেই তাহার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহার বাহিরে সে আর যাইতে পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্যের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও যে- ধনভাণ্ডার আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র পৃথিবী যেন এই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইবে। অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। ব্যাস বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম—তাহার মধ্যে আবার ধর্মদান শ্রেষ্ঠ; বিদ্যাদান তাহার নিম্নে; তারপর প্রাণদান; সর্বনিম্নে অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি; আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। এখানে ভিক্ষুকের নিকটও যতক্ষণ পর্যন্ত একখানা রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্ধেক দান করিবে। এইরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যথেষ্ট অন্নদান করিয়াছি, এক্ষণে আমাদিগকে

অপর দুইপ্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম ও বিদ্যা-দান। যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরি না করিয়া কাজে লাগিয়া যাই, তবে আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধমতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।

এখন আমার যেটুকু বলিবার ছিল, বলিলাম। আমার সঙ্কল্পিত কার্যপ্রণালী বলিয়া বেড়াইতে আমি ভালবাসি না। কি করিতে ইচ্ছা করি বা না করি, মুখে না বলিয়া কাজে দেখানই পছন্দ করি। অবশ্য আমি একটা নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী স্থির করিয়াছি; যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে। জানি না, আমি কৃতকার্য হইব কিনা; তবে একটা মহান্ আদর্শ লইয়া তাহাতেই মনপ্রাণ নিয়োগ করা—ইহাই জীবনের এক মহান্ আদর্শ। তাহা না হইলে হীন পশুজীবন যাপন করিয়া লাভ কি? এক মহান্ আদর্শের অনুগামী হওয়াই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। ভারতে এই মহৎকার্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে ভারতের বর্তমান পুনরুজ্জীবনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি বর্তমান শুভমুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ না করি, তবে মহামূর্খের মত কাজ করিব।

# ৮. মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

[মনমাদুরা হইতে মাদুরায় আসিয়া স্বামীজী রামনাদের রাজার সুন্দর বাঙ্গলায় অবস্থান করেন। অপরাহ্নে, মখমলের খাপে পুরিয়া স্বামীজীকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়—উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ]

আমার খুব ইচ্ছা যে, কয়েকদিন তোমাদের নিকট থাকিয়া সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশমত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় অভিজ্ঞতা ও বিগত চারবৎসরব্যাপী প্রচারকার্যের বিবরণ দিই। দুঃখের বিষয়, সন্ন্যাসিগণকেও দেহভার বহন করিতে হয়। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিয়া এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আর সন্ধ্যাকালে দীর্ঘ বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হাইবে; আর অন্যান্য বিষয় ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে এবং আর একটু অবকাশ পাইলে আমাদের অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। আজ এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। একটি কথা বিশেষভাবে আমার মনে উদিত হইতেছে। আমি এখন মাদুরায় তোমাদের স্বদেশবাসী স্বনামখ্যাত উদারচেতা রামনাদরাজের অতিথি। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান না, উক্ত রাজাই আমার মাথায় চিকাগো-সভায় যাইবার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বরাবরই সর্বান্তঃকরণে ও সর্বশক্তি-দ্বারা আমার কার্য সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং অভিনন্দন-পত্রে আমাকে যে-সকল প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যবাসী এই মহাপুরুষের প্রাপ্য। কেবল আমার মনে হয়, তিনি রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলে আরও ভাল হইত; কারণ তিনি সন্ন্যাসেরই উপযুক্ত।

যখনই পৃথিবীর অংশবিশেষে কোন কিছুর আবশ্যক হয়, তখনই তাহা এক অংশ হইতে অপরাংশে গিয়া সেখানে নূতন জীবন প্রদান করে। কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক—উভয় ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। যদি জগতের কোন অংশে ধর্মের অভাব হয় এবং অপর কোথাও সেই

ধর্ম থাকে, তবে আমরা জ্ঞাতসারে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্মের অভাব সেখানে ধর্মস্রোত আপনা-আপনি প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই—একবার নয়, দুইবার নয়, বার বার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে পৃথিবীকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই—যখনই কোন জাতির দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যে প্রাধান্য উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক জাতি অপর জাতিকে রাজনীতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহার যাহা আছে, তাহাই দিয়াছে। ভারত সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্বেই ভারত পৃথিবীকে আপন আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করিয়াছে। পারস্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা ঘটে। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে তৃতীয়বার। আবার ইংরেজের প্রাধান্যকালে এই চতুর্থবার সে বিধাতৃ-নির্দিষ্ট ব্রতপালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না-করি, পাশ্চাত্যদিগের সংঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও বাহ্যসভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমরাও পাশ্চাত্য জড়বাদপ্রধান সভ্যতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্যসভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতা আবশ্যক। তাহা হইলে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে; আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব-কিছু শিখিতে হইবে বা পাশ্চাত্যকে আমাদের নিকট সব-কিছু শিখিতে হইবে, তাহা নহে। সমগ্র পৃথিবী যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-অবস্থা কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহা রূপায়িত হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ততটুকু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে দেওয়া উচিত। এই আদর্শ-জগতের আবির্ভাব কখনও হইবে কিনা, তাহা জানি না; এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখনও আসিবে কিনা, এই সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে; কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখনও আসুক বা না আসুক, এই অবস্থা

আনিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে, আর কেবল আমার কাজের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অপর সকলে নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া বসিয়া আছে—কেবল একমাত্র আমারই কাজ করার বাকী আছে; আমি যদি নিজের কাজ সম্পন্ন করি; তবেই সমাজ ও সংসারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। আমাদের নিজেদের এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে—ভারতে ধর্মের এক প্রবল পুনরুত্থান হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কারণ ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গোঁড়ামিও আসিয়া থাকে। কখনও কখনও লোকে এত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, অনেক সময় যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুনরভ্যুত্থান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাও উহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। অতএব পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ—ইওরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তিতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুই-ভাব হইতেই সাবধান থাকিতে হইবে প্রথমতঃ আমরা কখনও পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর তোমরা পাশ্চাত্য জাতির হুবহু অনুকরণ করিতে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্তে সমর্থ হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে—তোমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব আর থাকিবে না; ইহা অসম্ভব। কালের প্রারম্ভ হইতে মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; তুমি কি উহাকে উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইওরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা অসম্ভব বোধ হয়, তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা-সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচারমাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য এবং পরস্পরবিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মানিব, আর কোন্‌টি মানিব না? উদাহরণস্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এক টুকরা মাংস খাইতে দেখিলে ভয়ে দুই শত হাত পিছাইয়া যাইবে; আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত, পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগবলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধ; কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহাদের নিজ নিজ পল্লীতে প্রচলিত আচারকে ধর্মের সার বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহাদের মহাভুল।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মুশকিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যস্বরূপ-বিষয়ক—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ক; আর একপ্রকার সত্য কোন বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে; দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ! আর যদি কোন পুরাণ বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন—ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার ঐ যুগের জন্যই অন্যপ্রকার আচার সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতি আবার সত্য-ত্রেতা প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচার সমর্থন করিয়াছেন। এখন দেখ, তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্‌। সনাতন সত্যসমূহ মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ আছে, ততদিন ঐগুলির পরিবর্তন হইবে না—অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্ব অবস্থায় ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপর দিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে সেগুলির পরিবর্তন

হয়। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথা বদলাইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল, মনে করিও না। মনে রাখিও, চিরকালই এই-সকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদপাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করানোর প্রথা ছিল। ক্রমশঃ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী, সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি হত্যা করিলে সমগ্র জাতি বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই গোহত্যা-প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীনশাস্ত্র-পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়তো এমন সব আচার প্রচলিত ছিল, যেগুলিকে এখন আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্তে অন্য সব বিধি প্রবর্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলি আবার পরিবর্তিত হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু কোন স্মৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ পাইবে, আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন; সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না—তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।

এইরূপে আমাদিগকে এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উদার ভাব—হৃদয়ের প্রসারতা আসিবে, অপর দিকে তেমন দৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে; তাহা হইলে তোমরা আমার কথার মর্ম বুঝিবে—বুঝিবে আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া লওয়া, কাহাকেও বর্জন করা নয়। আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু ও তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নত হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমান কালের সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে; আর হিন্দুই কেবল প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন

প্রথাগুলিকে সম্মান করিতে জানে। সহজ কথা বলি—সর্ব ব্যাপারই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ বিষয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য তত্ত্বগুলি সর্বকালের জন্য, আর গৌণ বিষয়গুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি যথাসময়ে সেইগুলির পরিবর্তে অন্য প্রথা প্রবর্তিত না হয়, তবে সেগুলির দ্বারা নিশ্চয় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচারপদ্ধতিসমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে, অতিশয় কুৎসিত আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না; এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে প্রত্যক্ষভাবে জীবনপ্রদ ছিল। এখন যদি সেইগুলি উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময়ও সেইগুলির নিন্দা করিও না; বরং ঐগুলির দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে, সেজন্য ঐগুলির প্রশংসা কর—ঐগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আর আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি কাহারা? তিনিই ঋষি, যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগবিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নহে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোন দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন—‘সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে’; আর আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাকে আমাকে—আমাদের সকলকেই ঋষি হইতে হইবে, অগাধ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে; আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করিব। কারণ সব শক্তি আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। আমাদিগকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে—উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে; তখনই ঋষিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষত্ব লাভ করিব। তখনই আমাদের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হইবে; তখনই আমাদের সম্মুখ হইতে যাহা কিছু মন্দ, তাহা আপনিই পলায়ন

করিবে, আর কাহাকেও নিন্দা বা অভিসম্পাত করিতে হইবে না, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে না। এখানে আজ যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই নিজের ও অপরের মুক্তির জন্য ঋষিত্ব লাভ করিতে শ্রীভগবান্ সাহায্য করুন।

# ৯. কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা

[মাদুরা হইতে ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর হইয়া স্বামীজী কুম্ভকোণম্ আসেন। সেখানে অভিনন্দনের উত্তরে বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।]

গীতাকার বলিয়াছেনঃ 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—অল্পমাত্রও এই ধর্ম পালন করিলে অতি মহৎ ফল লাভ হয়। যদি এই বাক্য সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্যক হয়, তবে আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি।

হে কুম্ভকোণম্ নিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অতি সামান্য কাজ করিয়াছি; কিন্তু কলম্বোয় নামিয়া অবধি এ পর্যন্ত যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই যেরূপ আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, তাহা আমার স্বপ্নের অতীত। সেই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, ইহা হিন্দুজাতির পূর্বাপর সংস্কার ও ভাবের উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ ধর্মই হিন্দুজাতির প্রকৃত জীবনীশক্তি, ধর্মই তাহার মূলমন্ত্র।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখিলাম—সকল জাতিরই এক-একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি; কাহারও-বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও-বা মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও-বা অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, মান্দ্রাজবাসীরা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আমেরিকায় যে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্যদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ

ধর্মবিষয়ে বেশী শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি, ঐ বিষয়ে এখন আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে পৃথিবীর সংবাদ জানিবার এবং ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহের অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত। এখন আমি উহার রহস্য বুঝিয়াছি। আমাদের দেশের লোকও সংবাদ-সংগ্রহে খুব উৎসুক, তবে অবশ্য যে-বিষয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ, সেই বিষয়ের সংবাদেই তাহার আগ্রহ; এ বিষয়ে বরং অন্যান্য যে-সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্যটন করিয়াছি, সেখানকার সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের আগ্রহ আরও বেশী। আমাদের কৃষকগণকে ইওরোপের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরিবর্তনগুলির সংবাদ জিজ্ঞাসা কর, ইওরোপীয় সমাজে যে-সব গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে, সেগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সে-সব কিছুই জানে না, জানিতেও চাহেও না। কিন্তু সিংহলেও—যে সিংহল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন, ভারতের স্বার্থের সহিত যাহার বিশেষ সংস্রব নাই—দেখিলাম—সেখানকার কৃষকেরাও জানিয়াছে, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, আর তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিল, এবং কিছুটা পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—যে-বিষয়ে তাহাদের মনের আগ্রহ, সেই বিষয়ে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলির মতই সংবাদ-সংগ্রহে উৎসুক। আর ধর্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—আগ্রহের বস্তু।

জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত, না রাজনীতি—এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাই না; তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখনও ইহা পরিবর্তন করিতে পার না, একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিষ বসাইতে পার না। একটি বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অন্য স্থানে পুঁতিয়া দিলে উহা যে সেখানে জীবিত থাকিবে, তাহা কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান্ আদর্শে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—ধর্মের এই-সকল আদর্শের মধ্যেই আমরা

পরিবর্ধিত হইয়াছি; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহস্র বৎসর যাবৎ যে-মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া, মহাশক্তি প্রয়োগ না করিয়া তোমরা কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কাজ করিতে পার; ধর্মই ভারতের পক্ষে সেই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথ অনুসরণ করাই ভারতীয় জীবনধারা, ভারতের উন্নতি ও কল্যাণের একমাত্র উপায়।

অন্যান্য দেশে পাঁচ রকম প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে ধর্ম একটি। একটি উদাহরণ দিই। আমি সচরাচর এই দৃষ্টান্তটি দিয়া থাকি—অমুক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে নানা জিনিষ আছে; এখানকার ফ্যাশন—একটি জাপানী পাত্র (Vase) ঘরে রাখা, না রাখিলে ভাল দেখায় না, সুতরাং তাঁহাকে একটা জাপানী পাত্র রাখিতেই হইবে। এইরূপ আমাদের কর্তার বা গিন্নীর অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধর্মও চাই—তবেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইল। এই কারণেই তাঁহাদের একটু-আধটু 'ধর্ম' করা চাই। জগতের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, এক কথায় সংসার। তাহাদের নিকট ঈশ্বর ও ধর্মের প্রয়োজন সংসারেরই একটু সুখবিধানের জন্য—তাহাদের নিকট ঈশ্বরের প্রয়োজন শুধু এইটুকু। তোমরা কি শোন নাই, গত দুই শত বৎসর যাবৎ কতকগুলি অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখে ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে একমাত্র এই অভিযোগ শোনা যাইতেছে যে, এই ধর্ম দ্বারা সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-লাভের সুবিধা হয় না, 'কাঞ্চন' লাভ হয় না, উহা সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না, বলবান্‌কে গরীবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্তপান করিতে সাহায্য করে না! সত্যই, আমাদের ধর্ম এরূপ করে না। ইহাতে অন্যান্য জাতির সর্বস্ব লুণ্ঠন ও সর্বনাশ করিবার জন্য পদভরে ভূকম্পকারী সৈন্যপ্রেরণের ব্যবস্থা

নাই। অতএব তাঁহারা বলেন—এ ধর্মে আছে কি? উহা চলতি কলে শস্য যোগাইয়া কাজ আদায় করিতে জানে না, অথবা উহা দ্বারা পেশীর শক্তি বর্ধিত হয় না। তবে এ ধর্মে আছে কি? তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না যে, ঐ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আমাদের ধর্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, কারণ আমাদের ধর্ম এই দু-তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে না। এই স্বল্প- বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধর্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম এই জগতের সীমার বাহিরে—দূরে, অতি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; সেই রাজ্য অতীন্দ্রিয়—সেখানে দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, অতি দূরে—সেখানে আর সংসারের সুখ-দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, সমগ্র জগৎই সেই মহিমময় ভূমা আত্মা-রূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, কারণ ইহা 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই উপদেশ দিয়া থাকে; আমাদের ধর্ম বলে—'কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য'; তোমরা যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন, সবই ক্ষণিক, এমন কি, জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র; এই জন্যই আমাদের ধর্ম সত্য। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম—কারণ সর্বোপরি ইহা ত্যাগ শিক্ষা দেয়। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সত্যধর্ম আমাদের মহাজ্ঞানী প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের তুলনায় যাহারা সেদিনের শিশুমাত্র, সেই-সকল জাতির নিকট সুদৃঢ় অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিতে থাকেঃ বালক! তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম। এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্মলাভের উপায়। ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, মুক্তির সোপান—ভোগ আমাদের লক্ষ্য নহে। এই জন্য আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। বিস্ময়ের বিষয়, এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত পরাক্রমের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে! কালসমুদ্রে তাহারা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও সৃষ্টি করিতে পারে নাই—নিজেদের কিছু চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল কাক-ভূশণ্ডীর মত বাঁচিয়া আছি—আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না।

আজকাল লোকে ‘যোগ্যতমের উদ্বর্তন’ (Survival of the fittest)-রূপ নূতন মতবাদ লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে—যাহার গায়ের জোর যত বেশী, সেই তত অধিক দিন জীবিত থাকিবে। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে-সকল জাতি কেবল অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটাইয়াছে, তাহারাই মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাকিত এবং এই দুর্বল হিন্দুজাতি, যাহারা কখনও অপর একটি জাতিকে জয় করে নাই, তাহারা এতদিনে বিনষ্ট হইয়া যাইত। জনৈকা ইংরেজ মহিলা আমাকে এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা কোন একটা জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই! পরন্তু এই জাতি এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী লইয়া সদর্পে জীবিত রহিয়াছে! আর ইহা সত্য নহে যে, উহার সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; ইহাও সত্য নহে যে, এই জাতির শরীর পুষ্টির অভাবে ক্ষয় পাইতেছে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যখনই উপযুক্ত সময় আসে, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহাবন্যার মত পৃথিবীকে প্লাবিত করে।

আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র পৃথিবীকে এক মহাসমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে চেষ্টা করিতেছে—কিরূপে তাহারা জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে; আমরা কিন্তু এখানে আর এক সমস্যার মীমাংসায় নিযুক্ত—কত অল্প জিনিষ লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্তমান লক্ষণসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, তবে বলা যায়, যাহারা স্বল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই পরিণামে জয়ী হইবে; আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।

মনুষ্যজীবনে, এমন কি জাতীয় জীবনেও সময়ে সময়ে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হয়। বোধ হয় সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসার-বিরক্তির ভাব

আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের বড় বড় মনীষিগণ ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য-সম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—সবই বৃথা। সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রধান সভ্যতার এই প্রতিযোগিতায়, এই সংঘর্ষে, এই পাশব ভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা আশা করিতেছেন—এই অবস্থা পরিবর্তিত হইবে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা আসিতেছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের এখনও দৃঢ় ধারণা—রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই ইওরোপের সমুদয় অশুভ-প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কিন্তু ঐ দেশে বড় বড় মনীষীদের মধ্যে অন্য এক আদর্শ বিকাশ লাভ করিতেছে; তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনীতিক বা সামাজিক পরিবর্তন যতই হউক না কেন, মনুষ্যজীবনের দুঃখ-কষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করিতে পারিলেই সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে। যতই শক্তিপ্রয়োগ শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন ও আইনের কড়াকড়ি কর না কেন, তাহাতে কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তিত হয় না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে। এই কারণেই পাশ্চাত্য জাতিগুলি কিছু নূতন ভাব—কোন নূতন দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা যে-ধর্ম মানেন, সেই খ্রীষ্টধর্ম অনেক বিষয়ে মহৎ ও সুন্দর হইলেও উহার মর্ম তাঁহারা ভাল করিয়া বোঝেন নাই। আর এতদিন তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মকে যেভাবে বুঝিয়া আসিতেছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নিকট পর্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের প্রাচীন দর্শনসমূহে, বিশেষতঃ বেদান্তেই—এতদিন তাঁহারা যাহা খুঁজিতেছেন—সেই চিন্তাপ্রবাহ, সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যপানীয়ের সন্ধান পাইতেছেন। আর ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

জগতের যতপ্রকার ধর্ম আছে, সেগুলির প্রত্যেকটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেই সেই ধর্মাবলম্বিগণ নানাবিধ অপূর্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। সে-সব শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্প দিনের কথা, আমার বিশেস বন্ধু ব্যারোজ সাহেব—‘খ্রীষ্টধর্মই যে একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম’ ইহা প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, আপনারা তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। এখন বাস্তবিক সার্বভৌম ধর্ম কোন্‌টি হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

আমার ধারণা, বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্মই নয়। আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরম্পরা উপস্থাপিত করিব। আমাদের ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধর্মই তাহাদের নিজ নিজ প্রবর্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই-সকল ধর্মের মত, শিক্ষা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেইগুলি সত্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মপ্রবর্তকদের ঐতিহাসিকতার উপরই যেন সেই-সকল ধর্মের সব-কিছুর ভিত্তি স্থাপিত। যদি তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিকতায় কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, যদি তাঁহাদের তথাকথিত ঐতিহাসিকতার ভিত্তি একবার ভাঙিয়া দেওয়া যায়, তবে সমুদয় ধর্ম-প্রাসাদটিই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে—পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বাস্তবিক বর্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্মপ্রবর্তকের জীবন সম্বন্ধে তাহাই ঘটিতেছে। আমরা জানি, তাঁহাদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা লোকে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে না, আর বাকী অর্ধেকও সন্দেহ করে। আমাদের ধর্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল বড় বড় ধর্মই এইরূপ ঐতিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের ধর্ম কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন পুরুষ বা নারী নিজেকে বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্তা মাত্র। স্থানে স্থানে এই ঋষিগণের নামের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি নামমাত্র। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাও আমরা জানি না। অনেক স্থলে তাঁহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহাও জানা যায় না; আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল আমাদের অজ্ঞাত। বাস্তবিক এই ঋষিগণ নামের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; তাঁহারা সনাতন তত্ত্বসমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই-সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আবার যেমন আমাদের ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের ধর্মও কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও অসংখ্য মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্মে যত অবতার, মহাপুরুষ, ঋষি আছেন, আর কোন্ ধর্মে এত আছেন? শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম বলে—বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক অবতার-মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইবে। ভাগবতে আছে—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'। সুতরাং এই ধর্মে নূতন নূতন ধর্মপ্রবর্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। এই হেতু ভারতের ধর্মেতিহাসে যে-সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক নন, তাহা হইলেও আমাদের ধর্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না; উহা পূর্বের মতই দৃঢ় থাকিবে; কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়—সনাতন সত্যসমূহের উপরই ইহা স্থাপিত। পৃথিবীর সকল লোককে জোর করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইবার চেষ্টা করা বৃথা; এমন কি সনাতন ও সার্বভৌম তত্ত্বসমূহ দ্বারাও অনেককে একমতাবলম্বী করা কঠিন। তবে যদি কখনও পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে ধর্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করা সম্ভব হয়, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে সকলে মানুক—এরূপ চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না, বরং সনাতন তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়া অনেকের একমতাবলম্বী হওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের কথার প্রামাণ্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকে—এ বিষয়ে আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

'ইষ্টনিষ্ঠা'রূপ যে অপূর্ব মত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই অসংখ্য অবতারের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে সকলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যে- কোন অবতারকে তোমার জীবনের আদর্শরূপে ও বিশেষ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পার; এমন কি তাঁহাকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠও মনে করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু সনাতন তত্ত্বসমূহই যেন তোমার ধর্মসাধনের মূলভিত্তি হয়। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য হইবে—যে-কোন অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের মান্য। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

পৃথিবীর সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ এই যে, বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ, জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল বেদান্তের উপদেশের সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। অতি প্রাচীনকালে আকৃতি, বংশ ও ভাবের দিক হইতে সমতুল্য দুইটি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি প্রচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথা বলিতেছি। শেষোক্ত জাতি বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং প্রথমোক্ত জাতি অগ্রসর হইয়াছিল অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া। ইতিহাসে তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্থান-পতনের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই দুই ভিন্ন প্রকার চিন্তাপ্রণালী সেই সুদূর চরমলক্ষ্যের একই প্রকার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল বেদান্তীই—যাহারা নিজেদের 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে—তাহাদের ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিতে পারে; ইহাতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান জড়বাদ নিজের সিদ্ধান্তগুলি পরিত্যাগ না করিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের নিকট এবং যাঁহারা এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নিকট ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্বেই সেই-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল; কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়ের ভাষায় জড় বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে মাত্র।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদান্ত-আলোচনার দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা। আমাকে পাশ্চাত্যদেশের অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার সহিত ইঁহাদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। এদিকে তাঁহার খাইবার বা গবেষণাগার হইতে বাহিরে যাইবার অবকাশ নাই, অথচ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত, বর্তমান যুগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাগুলি বেদান্ত এত সুন্দরভাবে পূরণ করিয়া থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ

যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, সেগুলির সহিত বেদান্তের এত সামঞ্জস্য যে, আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না।

ধর্মগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; সেই দুটির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথম তত্ত্বটি এইঃ সকল ধর্মই সত্য। আর দ্বিতীয়টিঃ জগতের সকল বস্তু আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও সবই এক বস্তুর বিকাশমাত্র। বেবিলনীয় ও য়াহুদীদের ধর্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই—বেবিলনীয় ও য়াহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম ছিল। বেবিলনীয় দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল 'বল'। তাহাদের মধ্যে 'বল মেরোদক' প্রধান। কালে এই একটি শাখা সেই জাতির অন্তর্গত অন্যান্য শাখাগুলিকে জয় করিয়া নিজের সহিত মিশাইয়া লয়। ইহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজেতা জাতির দেবতা অন্যান্য শাখাজাতির দেবতাগুলির উপরে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেমাইট জাতি যে তথাকথিত 'একেশ্বরবাদ' লইয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। য়াহুদী জাতির দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল 'মোলক'। ইঁহাদের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল 'মোলক-য়াভা'। এই ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য কতকগুলি জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্যান্য মোলকগণের অপেক্ষা বড় ও প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপ ধর্মযুদ্ধে যে- পরিণাম রক্তপাত ও পাশবিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। পরবর্তী কালে বেবিলনীয়েরা মোলক-য়াভার এই প্রাধান্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই।

আমার বোধ হয়, ধর্মবিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ জাতির প্রাধান্যলাভের চেষ্টা ভারতের সীমান্ত-প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও সম্ভবতঃ আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধানে ভারতীয় ইতিহাস য়াহুদীদের ইতিহাসের মত হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতকে

পরধর্মে বিদ্বেষশূন্য ও ধর্মসাধনায় গরিষ্ঠ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে ঐ-সকল বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সেই প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত যুগে—কিংবদন্তীও যে-যুগের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়; জগতে এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রচার করেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—পরম সত্যবস্তু এক, ঋষিগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এইরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এইরূপ মহান্ সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রভাবিত করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনের সহিত যেন সর্বাংশে একীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটিকে সর্বতোভাবে ভালবাসি, তাই আমাদের দেশ—পরধর্মে দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিমময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানে—কেবল এইখানেই লোকে তাহাদের ধর্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর জন্যও মন্দির-গির্জাদি নির্মাণ করিয়া দেয়। পৃথিবীর লোককে আমাদের নিকট এই পরধর্মে সহিষ্ণুতা-রূপ মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্ম-বিদ্বেষ রহিয়াছে, তাহা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্ম-বিদ্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, অনেক সময় মনে হইয়াছে, আমাকে হয়তো বিদেশে হাড়-কখানা রাখিয়া যাইতে হইবে। ধর্মের জন্য একজনকে মারিয়া ফেলা এত তুচ্ছ কথা যে, আজ না হউক, কালই এই মহাদৃপ্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে কেহ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিলে তাহাকে সমাজচ্যুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যত প্রকার গুরুতর নির্যাতন সবই সহ্য করিতে হয়। আপনারাও যদি আমার মত পাশ্চাত্যদেশে গিয়া কিছুদিন বাস করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে, এখানে পাশ্চাত্যের

লোকেরা খুব সহজে স্বচ্ছন্দে আমাদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু সেখানকার বড় বড় অধ্যাপকেরা পর্যন্ত—যাঁহাদের কথা আপনারা এখানে খুব শুনিতে পান, তাঁহারাও অত্যন্ত ভীরু; এবং ধর্মসম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করেন না।

এই কারণেই পৃথিবীকে এই পরধর্মসহিষ্ণুতারূপ মহান্ সত্য শিক্ষা করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে বিশেষ কল্যাণ হইবে। বাস্তবিকই এই ভাবে ভাবিত না হইলে কোন সভ্যতাই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার—যতদিন না এগুলি বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হইতে পারে না; যতদিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না; আর এই মৈত্রীভাব-বিকাশের প্রথম সোপান—পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না—পরস্পরের ধর্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক্ হউক না কেন, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা ভারতে ঠিক তাহাই করিয়া থাকি, এইমাত্র আপনাদিগকে আমি সে-কথা বলিয়াছি। এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুর হউক ও অত্যাচার করুক—তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতে বিরত হইব না, যতদিন পর্যন্ত না প্রেমবলে উহাদিগকে জয় করিতে পারি; যতদিন পর্যন্ত না আমরা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখনও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না—ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে, কেবল পশুত্ব ও শারীরিক

শক্তি কখনও জয়লাভ করিতে পারে না, শান্ত স্বভাবই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়, সফল হয়।

পৃথিবীকে, ইওরোপ ও সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে আমাদের আর একটি মহৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক একত্বরূপ এই সনাতন মহৎ তত্ত্ব—সম্ভবতঃ উচ্চজাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অজ্ঞ জনসাধারণের, বলবান্ অপেক্ষা দুর্বলের পক্ষেই বেশী প্রয়োজনীয়।

হে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের নিকট আর বিস্তারিতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইওরোপের আধুনিক গবেষণা জড়বিজ্ঞানের প্রণালীতে কিরূপে সমগ্র জগতের একত্ব প্রমাণ করিয়াছে—পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তুমি আমি সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি সবই অনন্ত জড়সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গস্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র। আবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বেদান্তে দেখানো হইয়াছে—এই আপাত-প্রতীয়মান জগৎপ্রপঞ্চের একত্বভাবেরও পশ্চাতে যে যথার্থ আত্মা রহিয়াছেন, তিনিও 'এক'। জগদ-ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একমাত্র আত্মাই রহিয়াছেন—সবই সেই এক সত্তামাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বাস্তবিক যে এই একত্ব রহিয়াছে—এই মহান্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন! অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদকে ভয় করিয়া থাকেন! এখনও এই মতের অনুগামী অপেক্ষা বিরোধীর সংখ্যাই অধিক! তথাপি আমি বলিতেছি, যদি জগৎকে আমাদের জীবনপ্রদ একটি মহৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ, তিনিই যতই বড় বা ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি হউন না কেন,

যখন কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, তখন তাঁহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা নীতিবিজ্ঞান প্রামাণিক হইতে পারে না। দর্শন বা নীতির প্রমাণের শুধু এই কারণ নির্দেশ করিলে তাহা কখনও উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না; কোন মানুষের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া তাঁহারা দেখিতে চাহেন, চিরন্তন তত্ত্বসমূহের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে, আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন; অনাদী অনন্ত আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি; তোমাতে আমাতে শুধু 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ নহে,—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন-চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থেই এই 'ভাই ভাই' ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।

আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচারে পদদলিত সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, ইওরোপের পক্ষেও তেমনি ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেভাবে রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে এখনই তাহারা এই মহান্ তত্ত্বকে সকল উন্নতির মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতেছে। আর হে বন্ধুগণ, আপনারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা—অনন্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অভিব্যক্ত, সেইখানেই ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শসমূহ পরিস্ফুট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাঁহাদের প্রচারিত ভাবসমূহের মূল উৎস সম্বন্ধে অজ্ঞ, কোন কোন স্থলে তাঁহারা নিজদিগকে মৌলিক গবেষণাশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ আবার নির্ভয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কোথা হইতে তাঁহারা ঐ-সকল তত্ত্ব পাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বেদান্তের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বন্ধুগণ, আমেরিকায় আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করিতেছি, দ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছি না—একবার এইরূপ অভিযোগ শুনিয়াছিলাম। দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি ও উপাসনায় যে কি অসীম আনন্দ লাভ হয়, তাহা আমি জানি; উহার অপূর্ব মহিমা আমি সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবারও সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমলভাব অবলম্বন করিবার সময় নাই। এইরূপে কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা রাশীকৃত তুলার মত কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মত স্নায়ু; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়—যদি-বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদি-বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক; আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন হইতে পারে।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। তোমার যদি এদেশীয় পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহাদের সবগুলির উপরই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাস-বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও এবং বীর্যবান্ হও। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক। আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহস্র বৎসর যাবৎ যে-কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি, কেন? কারণ উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল—আমাদের ছিল না।

আমি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া কি শিখিলাম? খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দেশ করে, এই-সকল বাজে কথার অন্তরালে উহাদের জাতীয়

উন্নতির কি কারণ দেখিলাম?—দেখিলাম ইওরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরেজ বালক তোমাকে বলিবে, 'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে—প্রত্যেক ইওরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ এই কথা বলিতে পারে কি? না, পারে না; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতারা পর্যন্ত পারে না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই জন্যই বেদান্তের অদ্বৈত-ভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি; আর আমি সাম্প্রদায়িকভাবে উহা প্রচার করি না—সার্বভৌম ও সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমি উহা প্রচার করিয়া থাকি।

এই অদ্বৈতবাদ এমনভাবে প্রচার করা যাইতে পারে—যাহাতে দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না; আর এই-সকল মতের সামঞ্জস্যসাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোন ধর্ম নাই যাহাতে বলা হয় নাই যে, ভগবান্ সকলের ভিতরে রহিয়াছেন। বিভিন্ন মতের বৈদান্তিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই পবিত্রতা, বীর্য ও পূর্ণত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! তবে কাহারও কাহারও মতে এই পূর্ণত্ব যেন কখনও কখনও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার অন্য সময়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব যে আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদ-মতে উহা সঙ্কুচিতও হয় না, বিকাশপ্রাপ্তও হয় না, তবে সময়ে সময়ে অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। কার্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত ইহা অনেকটা একরূপই হইল। একটি মত অপরটি অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্যতঃ প্রায় একই প্রকার। এই মূল তত্ত্বটি প্রচার করা জগতের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; আর আমাদের এই মাতৃভূমিতে ইহার যত অভাব, আর কোথাও তত নহে।

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক রূঢ় অপ্রিয় সত্য শুনাইতে চাই। সংবাদপত্রে পড়া যায়, আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন ইংরেজ খুন করিয়াছে, অথবা কাহারও প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। অমনি সমগ্র দেশে হইচই পড়িয়া গেল; সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার মনে প্রশ্ন উদিত হইল—এ-সকলের জন্য দায়ী কে? যখন আমি একজন বেদান্তবাদী, তখন আমি নিজেকে এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; সে নিজের মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করে। আমি যখনই আমার মনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি—কে ইহার জন্য দায়ী? তখন প্রত্যেকবারই আমি এই উত্তর পাইয়া থাকি যে, ইহার জন্য ইংরেজ দায়ী নয়; আমরাই আমাদের দুর্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—একমাত্র আমরাই দায়ী।

আমাদের অভিজাত পুরুষগণ দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল; অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল যে তাহারা মানুষ। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ক্রীতদাস হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া দু-একটি কথা বলিতে বলে, তবে প্রায়ই দেখিতে পাই—আধুনিক কালের শিক্ষাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ এই পদদলিত জনগণের উন্নতি-সাধনরূপ কর্তব্য কর্ম হইতে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

শুধু তাই নয়, আরও দেখিতে পাই—উহারা পাশ্চাত্যদেশের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ (hereditary transmission) ও সেই ধরনের অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মতসহায়ে এমন সব পাশব ও আসুরিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহাতে দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পশুপ্রকৃতি করিয়া ফেলিবার অধিকতর সুবিধা হয়। আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্রো যুবকও আসিয়াছিল, সে খাঁটি আফ্রিকার নিগ্রো। একটি সুন্দর বক্তৃতাও সে দিয়াছিল। ঐ যুবকটি

সম্বন্ধে আমার কৌতূহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে কয়েকটি আমেরিকানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; তাহারা আমাকে ঐ যুবকটি সম্বন্ধে এইরএপ বলিলঃ এই যুবক মধ্য-আফ্রিকার জনৈক নিগ্রো দলপতির পুত্র; কোন কারণে অপর একজন দলপতি ইহার পিতার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। সে এই বালকটিকেও হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিল। বালকটি কোনক্রমে পলায়ন করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়, সেখান হইতে একটি আমেরিকান জাহাজে করিয়া আমেরিকায় আসিয়াছে। সেই বালকটি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিল! এইরূপ ঘটনা দেখিবার পর 'বংশানুক্রমিক সংক্রমণ' মতবাদে আর কিরূপে আস্থা থাকিতে পারে?

হে ব্রাহ্মণগণ! বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণের নিয়ম অনুসারে বিদ্যাশিক্ষায় যদি ব্রাহ্মণের অধিকতর যোগ্যতা থাকে, তবে তাহার শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্বলকে আগে সাহায্য কর; কারণ তাহারই তো সবটুকু সাহায্য প্রয়োজন। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি সেইরূপ বুদ্ধিমান না হয়, তবে কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দিতে থাক—তাহাদিগের জন্যই শিক্ষক নিযুক্ত কর। আমার তো মনে হয়, ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত।

এই দরিদ্রগণকে—ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও শিখাও—সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বল—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। উঠ, জাগ—যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও

না। উঠ জাগ—নিজদিগকে দুর্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ, তাহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতর যে ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, এই মোহজাল ছিন্ন কর। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে ঐ শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে—যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগে, তবে তাহা এই দুইটি মহাবলপ্রদ শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপঃ

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥৭

বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন; কারণ, ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদান্ত-প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট লোকহিতকর কার্যের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্বদ্বয় প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অশুভ—যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়, আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রও বলিয়া থাকেন, যা কিছু অশুভ, ভেদবুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন এবং অভেদবুদ্ধি হইতে, অর্থাৎ সকল বিভিন্নতার মধ্যে এক সত্তা

রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিলে সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহান্ আদর্শ।

তবে সকল বিষয়েই শুধু আদর্শে বিশ্বাস করা এক কথা, আর দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে সেই আদর্শ অনুযায়ী চলা আর এক কথা। একটি উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া অতি উত্তম, কিন্তু ঐ আদর্শে পৌঁছিবার কার্যকর উপায় কই? এখানে স্বভাবতঃ সেই কঠিন প্রশ্নটি আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সর্বসাধারণের মনে বিশেষভাবে জাগিতেছে; সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে—জাতিভেদ ও সমাজসংস্কার-বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা। আমি সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট খোলাখুলি বলিতে চাই যে, আমি একজন জাতিভেদলোপকারী বা সমাজসংস্কারক মাত্র নহি। জাতিভেদ বা সমাজসংস্কার-বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই। তুমি যে-কোন জাতির লোক হও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে সেজন্য অপর জাতির কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না। প্রেম—একমাত্র প্রেমই আমি প্রচার করিয়া থাকি; আর আমার এই উপদেশ বিশ্বাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের সেই মহান্ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিগত প্রায় একশত বৎসর যাবৎ আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকে ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবে প্লাবিত হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছুই বলিবার নাই। ইঁহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য খুব ভাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে স্থায়ী শুভফল কিছু হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দুসভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা শক্ত নহে। নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই ইহার কারণ। প্রথমতঃ তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি, অন্যান্য জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে

হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিবেচনাহীন অনুকরণ-মাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কাজ হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার-আন্দোলনগুলি দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণের দ্বারা কোন কাজ হয় না। আমাদের সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাহা দেখিতে পায়; আর কোন্ সমাজেই বা দোষ নাই?

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, এই অবসরে তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি পৃথিবীর যে-সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক, এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায় যে, সেগুলিই মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই জন্যই আমি কোন সংস্কার চাই না; আমার আদর্শ—জাতীয় আদর্শে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন সমগ্র পৃথিবীতে এমন আর একটি দেশ দেখিতে পাই না, যাহা মানব-মনের উন্নতির জন্য এত অধিক কাজ করিয়াছে। এই কারণেই আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা করি না বা গালি দিই না। আমি বলি—‘যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।’ এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কাজ করা হইয়াছে, কিন্তু আরও বড় বড় কাজ করিবার এখনও যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্থানে বসিয়া থকি, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আমাদিগকে হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে; হয় আমাদিগকে উন্নতি সাধন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। আমাদের পূর্বপূরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া কিরূপে সম্ভব? তাহা হইতেই পারে না, তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে;

অতএব ‘অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান কর’—ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।

আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি। আমি সমাজের বিশেষ কোন অমঙ্গলের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি না; আমি বলিতেছি—তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্বপুরষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিখুঁতভাবে কার্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্ব ও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব—এই বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে, এখন আমাদিগকে যাহা করিতে ইহবে, তাহার প্রত্যেকটি আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং এখন আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, সেগুলিও তাঁহারা যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের মত নহে। তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে বুঝিতেন না যে, শহরের সব লোক মিলিয়া একত্র মদ্যমাংস আহার করুক, অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলিয়া যখন যেখানে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলা-গারদে পরিণত করুক; অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যা দ্বারা কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। এরূপ করিয়া উন্নত হইয়াছে—এমন জাতি তো আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণও—নিজেদের পূর্বপুরুষগণ যে সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিতে সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, এবং যতক্ষণ না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, পথিকের সর্বস্ব-লুণ্ঠনকারী পর্বতনিবাসী কোন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা

কিছুতেই শান্তি পান না। অপর দিকে আবার ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন—কৌপীনধারী অরণ্যবাসী ফলমূলাহারী বেদাধ্যায়ী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তাঁহাদের বংশের উৎপত্তি। এখানে যদি তুমি কোন প্রাচীন ঋষিকে তোমার পূর্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার, তবে তুমি উচ্চজাতীয় হইলে, নতুবা নহে। সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আধ্যাত্মিক-সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। 'ব্রাহ্মণ আদর্শ' বলিতে আমি কি বুঝিতেছি?—যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তাহাই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই হিন্দুজাতির আদর্শ। তোমরা কি শোন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন বিধিনিষেধ নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাঁহার মৃত্যুদণ্ড নাই? এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, অবশ্য সে-ভাবে বুঝিও না; প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিকভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন, যাঁহার জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিতে এবং উহা বিস্তার করিতেই নিযুক্ত—কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও সৎস্বভাব ধর্মপরায়ণ নরনারী দ্বারা যে-দেশ অধ্যুষিত, সে-জাতি ও সে-দেশ যে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! তাঁহাদের শাসনের জন্য আর সৈন্য- সামন্ত পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গস্বরূপ। আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণ-জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে পাঠ করিঃ প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখের

জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে। তোমরা আর্য, অনার্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ, সে আদেশ এইঃ ‘চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।’ বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র পৃথিবীকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক হয়—অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে পূর্ণ হয়, উপাসনা ও ধ্যান-পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর লাভ করিতে পারে।

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার উপায় কি? তোমাদিগকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া তো ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল-প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা যায়, ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি যাহা করিতে চাই এবং ঐ-বিষয়ে দিন দিন আমার মনে যে- সকল নূতন নূতন ভাব উদিত হইতেছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হইবে। অতএব আজ এখানেই বক্তৃতার উপসংহার করিব।

হিন্দুগণ! তোমাদিগকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই মহান্ জাতীয় অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে—হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি

তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই উচিত– এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া ঐ পোতের জীর্ণসংস্কার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। আমাদের স্বদেশবাসী সকলকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া জাগ্রত করিব, নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া কর্তব্য সাধন করিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার কথা অগ্রাহ্য করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীতকালে মহৎ কর্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য করিতে নাও পারি, তথাপি এই সান্ত্বনা লাভ করিব যে, আমরা যেন একসঙ্গে শান্তিতে ডুবিয়া মরিতে পারি।

স্বদেশহিতৈষী হও—যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসো। আমার স্বদেশবাসিগণ! যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়। তোমরা শুদ্ধ, শান্ত, সৎস্বভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই মায়ার জগতে ইহা এক মর্মান্তিক পরিহাস। তাহা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—পরিণামে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। ইত্যবসরে আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, কেবল দেশবাসীর নিন্দা করিলে চলিবে না। আমাদের এই পরম পবিত্র মাতৃভূমির কালজীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না; অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধেও একটি নিন্দাসূচক কথা বলিও না, কারণ সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই সেরূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও সেরূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা কৃষ্টি ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল।

অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুলিয়া যাক। এই দেশের এবং সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধন কর। তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে, সমুদয় ভার তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রতি গৃহে লইয়া যাও, প্রতি গৃহে বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় যে ব্রহ্মত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত কর। তাহা হইলেই—তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন—তুমি এই সন্তোষ লাভ করিবে যে, তুমি মহৎকার্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহৎকার্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহৎকার্য সাধিত হইলেই মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইবে।

# ১০. মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর

[মান্দ্রাজের জনসাধারণ—বিশেষভাবে যুবকগণ, স্বামীজীকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া যুবকগণ নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়। 'কার্নান ক্যাসল'-এ স্বামীজী কয়েকদিন অবস্থান করেন। মান্দ্রাজ অভ্যর্থনা-সমিতির এবং খেতড়ি-মহারাজার পক্ষ হইতে দুইটি অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। এইগুলির উত্তরে স্বামীজী বিভিন্ন দিবসে ছয়টি বক্তৃতা দেন।]

ভদ্রমহোদয়গণ,

একটা কথা আছে—মানুষ নানাবিধ সঙ্কল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়া থাকে। ব্যবস্থা হইয়াছিল, অভ্যর্থনা ইংরেজী ধরনে হইবে; কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধানে কার্য হইতেছে—গীতার ধরনে আমি রথ হইতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি। এরূপ ঘটনার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে বক্তৃতার জোর বাড়িবে, তোমাদিগকে যাহা বলিতে যাইতেছি, সেই কথাগুলির ভিতর একটা শক্তি আসিবে। জানি না, আমার কণ্ঠস্বর তোমাদের সকলের নিকট পৌঁছিবে কিনা, তবে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। ইহার পূর্বে আর কখনও আমার খোলা ময়দানে এত বড় সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ হয় নাই।

কলম্বো হইতে মান্দ্রাজ পর্যন্ত লোকে আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ব সহৃদয়তা দেখাইয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীই যেরূপ অভ্যর্থনা করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা আমি কল্পনায়ও আশা করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার আনন্দই হইতেছে; কারণ ইহা দ্বারা পূর্বে বার বার আমি যাহা বলিয়াছি, সেই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে—প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক-একটি বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জাতিই একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে, আর ধর্মই ভারতবাসীর সেই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহু কার্যের মধ্যে

ধর্ম একটি; প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যথা ইংলণ্ডে, ধর্ম–জাতীয় জীবন-নীতির একটি অংশ মাত্র। ইংলিশ চার্চ ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরেজরা উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, নিজেদের চার্চ মনে করিয়া তাহারা উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্বাহ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারই ঐ চার্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক, কারণ উহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও একই কথা। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়, উহা–হয় রাজনীতি বা বিদ্যাচর্চার উপর, না হয় সমরনীতি বা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে ভাবের উপর সেই শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। সেইটিই তাহার মুখ্য ভাব; ইহা ছাড়া তাহার অনেক গৌণ পোশাকী ভাব আছে–ধর্ম ঐগুলির অন্যতম।

এখানে–এই ভারতে ধর্ম জাতীয় হৃদয়ের মর্মস্থল। এই ভিত্তির উপরই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, ক্ষমতা, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির চর্চাও এখানে গৌণমাত্র; সুতরাং ধর্মই এখানকার একমাত্র কার্য, একমাত্র চিন্তা। ভারতীয় জনসাধারণ জগতের কোন সংবাদ রাখে না, শত শতবার আমি এ কথা শুনিয়াছি–কথাটি সত্য। কলম্বোয় যখন নামিলাম, তখন দেখিলাম–ইওরোপে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, যথা মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না; তাহাদের মধ্যে একজনও সোশ্যালিজম্ (Socialism), এনার্কিজম্ (Anarchism) প্রভৃতি শব্দের অর্থ এবং ইওরোপে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেগুলির কথা কিছুই শোনে নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকার্যও হইয়াছেন, এ-কথা সিংহলের আবালবৃদ্ধবনিতা শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহের অভাব নাই, তবে সেই সংবাদ তাহাদের উপযোগী হওয়া চাই, তাহাদের জীবনযাত্রায় যে-সকল বিষয় অত্যাবশ্যক, তদনুযায়ী কিছু হওয়া চাই। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত

হয় নাই, কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বলেই ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহারই সাহায্যে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে।

পৃথিবীর সকল জাতি দুইটি বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটির এবং অন্যান্য জাতি অপরটির মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি জয়ী হইবে? কিসে জাতিবিশেষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কিসেই বা কোন জাতি অতি শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়? প্রেমের জয় হইবে, না ঘৃণার?—ভোগের জয় হইবে না ত্যাগের?—জড় জয়ী হইবে না চৈতন্য? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাসও সেইরূপ। ঐতিহ্যও যে অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমময় পূর্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন এবং পৃথিবীর নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত—ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা যে-জাতি ত্যাগ করিয়াছে, সেই জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে,—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব, কিছুদিনের জন্য পাপের খেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতিকে অনেক দুঃখ ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অপর কোন জাতিকে করিতে হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও এই জাতি জীবিত রহিয়াছে; কারণ এ জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে; আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?

ইওরোপ এই সমস্যার অপর দিকটি মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছে—মানুষ কতদূর ভোগ করিতে পারে, ভালমন্দ যে-কোন উপায়ে মানুষ কত অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইওরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্ম

প্রতিযোগিতা নষ্ট করে, তাহার শক্তিকে খর্ব করে, উহার নিষ্ঠুরতা হ্রাস করে; বর্ণাশ্রম দ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

এই সময় (প্রায় ১০,০০০ লোকের) জনতা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সকলে স্বামীজীর কথা শুনিতে না পাওয়ায় তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেনঃ

বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেছি; বরং তোমাদের উৎসাহ-প্রকাশে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি; ইহাই চাই—প্রবল উৎসাহ। তবে ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে—সযত্নে ইহা রক্ষা করিতে হইবে; এই উৎসাহাগ্নি যেন কখনও নিবিয়া না যায়। আমাদিগকে ভারতে বড় বড় কাজ করিতে হইবে। সেজন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই। এইরূপ উৎসাহ আবশ্যক। আর সভার কার্য চলা অসম্ভব। তোমাদর সদয় ব্যবহার ও সাগ্রহ অভ্যর্থনার জন্য আমি তোমাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অন্যসময় ধীর-স্থিরভাবে পরস্পর চিন্তা- বিনিময় করিব। বন্ধুগণ, এখন বিদায়।

তোমরা সকলে শুনিতে পাও, এইভাবে বক্তৃতা করা আর অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আজ অপরাহ্নে আমাকে দেখিয়াই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বক্তৃতা সুবিধামত অন্য সময়ে—ভবিষ্যতে হইবে। তোমাদের উৎসাহ ও অভ্যর্থনার জন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি।

# ১১. আমার সমরনীতি

[মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত]

সেদিন অত্যধিক লোকসমাগমের দরুন বক্তৃতায় বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই, সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মান্দ্রাজবাসিগণের নিকট বরাবর যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। অভিনন্দনপত্রগুলিতে আমার প্রতি যে-সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিভাবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না, তবে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ঐ বিশেষণগুলির যোগ্য করেন, আর আমি যেন সারা জীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি। প্রভু যেন আমাকে এই কার্যের যোগ্য করেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে হয়, অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমার কিছুটা সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্যদেশে বহন করিবার জন্য আমার একটি বার্তা ছিল—আমি নির্ভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরেজ জাতিকে সেই বার্তা, সেই বাণী শ্রবণ করাইয়াছি। অদ্যকার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি তোমাদের সকলের নিকট সাহসপূর্বক কয়েকটি কথা বলিতে চাই। কিছুদিন যাবৎ কতকগুলি ব্যাপার এমন দাঁড়াইতেছে যে, ঐগুলির জন্য আমার কাজে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। এমনকি সম্ভব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টাও চলিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই-সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকে। গত তিন বৎসর যাবৎ দেখিতেছি, জনকয়েক ব্যক্তির আমার ও আমার কার্য সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। যতদিন বিদেশে ছিলাম, ততদিন চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি একটি কথাও বলি নাই। কিন্তু এখন মাতৃভূমিতে দাঁড়াইয়া এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির কি ফল হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না; এ কথাগুলি বলার দরুন তোমাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইবে, তাহাও গ্রাহ্য করি না। লোকের মতামত আমি কমই গ্রাহ্য করিয়া থাকি। চার বৎসর পূর্বে দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে

সন্ন্যাসিবেশে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। সারা দুনিয়া আমার সামনে এখনও পড়িয়া আছে। আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই—এখন আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করি।

প্রথমতঃ থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। বলাই বাহুল্য যে, উক্ত সোসাইটির দ্বারা ভারতে কিছু কাজ হইয়াছে। এ কারণে প্রত্যেক হিন্দুই ইহার নিকট, বিশেষতঃ মিসেস বেস্যাণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মিসেস বেস্যাণ্ট সম্বন্ধে যদিও আমার অল্পই জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষিণী, আর সাধ্যানুসারে তিনি প্রাণপণ আমাদের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য প্রত্যেক যথার্থ ভারতসন্তান তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন; তাঁহার ও তৎসম্পর্কীয় সকলের উপরেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ চিরকাল বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথা, আর থিওজফিস্টদের সোসাইটিতে যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা এক কথা, আর কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে তর্কযুক্তি না করিয়া, বিচার না করিয়া বিনা বিশ্লেষণে সবই গিলিয়া ফেলা আর এক কথা।

একটা কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে যে, আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সামান্য কাজ করিয়াছি, থিওজফিস্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, এ-কথা সর্বৈব মিথ্যা। এই জগতে উদার ভাব এবং 'মতভেদ সত্ত্বেও সহানুভূতি' সম্বন্ধে আমরা অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা, কিন্তু আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, যতক্ষণ একজন অপর ব্যক্তির সব কথায় বিশ্বাস করে, ততক্ষণই ঐ ব্যক্তি তাহার প্রতি সহানুভূতি করিয়া থাকে। যখনই কেহ কোন বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে সাহস করে, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায়।

আরও অনেক আছে, তাহাদের নিজেদের এক-একটা স্বার্থ আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে যাহাতে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তবে তাহাদের ভিতর প্রভূত

ঈর্ষা ও ঘৃণার আবির্ভাব হয়; তাহারা তখন কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। হিন্দুরা নিজেদের ঘর নিজেরা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ক্ষতি কি? হিন্দুরা প্রাণপণে নিজেদের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কার-সভাগুলির কি অনিষ্ট হইবে? ইঁহারা কেন হিন্দুদের সংস্কার-চেষ্টায় বিরোধী হইবেন?ইঁহারা কেন এই-সব আন্দোলনের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন? 'কেন?'—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার বোধ হয়, তাঁহাদের ঘৃণা ও ঈর্ষার পরিমাণ এত অধিক যে, এ-বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

প্রথমে থিওজফিস্টদের কথা বলি। চার বৎসর পূর্বে যখন থিওজফিক্যাল সোসাইটির নেতার নিকট গমন করি—তখন আমি একজন দরিদ্র অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র, একজনও বন্ধু-বান্ধব নাই, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে, কিন্তু কাহারও নামে লিখিত কোনপ্রকার পরিচয়পত্র নাই। আমি স্বভাবতই ভাবিয়াছিলাম, ঐ নেতা যখন একজন মার্কিন এবং ভারতপ্রেমিক, তখন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে আমেরিকায় কাহারও নিকট পরিচয়পত্র দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নিকট গিয়া ঐরূপ পরিচয়পত্র প্রার্থনা করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমাদের সোসাইটিতে যোগ দিবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'না, আমি কিরূপে আপনাদের সোসাইটিতে যোগ দিতে পারি? আমি আপনাদের অনেক মতই যে বিশ্বাস করি না।' তিনি বলিলেন, 'তবে যাও, তোমার জন্য আমি কিছু করিতে পারিব না।' 'ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া? আমার থিওজফিষ্ট বন্ধুগণের কেহ যদি এখানে থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া?

যাহা হউক, আমি মান্দ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন, কেবল একজন অনুপস্থিত দেখিতেছি—বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার। আর আমি এই সভায় উক্ত ভদ্রমহোদয়ের উদ্দেশে আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মধ্যে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান, আর এ জীবনে তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই—তিনি ভারতমাতার

একজন যথার্থ সুসন্তান। যাহা হউক, আমি আমেরিকায় পৌঁছিলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সব খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিতেছে। আমার শুধু গ্রীষ্মোপযোগী একখানি পাতলা পরিধেয় ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি রাস্তায় ভিক্ষায় বাহির হই, তবে আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মান্দ্রাজে কয়েকজন বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্রই মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।' ইহাই কি আমার জন্য পথ করিয়া দেওয়া?

আমি এখন এ-সব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই ছিল আমার মূলমন্ত্র, কিন্তু আজ ইহা বাহির হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে, আমি ধর্মমহাসভায় কয়েকজন থিওজফিস্টকে দেখিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে— তাঁহাদের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা প্রত্যেকেই যে-অবজ্ঞাদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাদৃষ্টিতে যেন প্রকাশ পাইতেছিল—'এ একটা ক্ষুদ্র কীট; এ আবার দেবতার মধ্যে কিরূপে আসিল?' ইহাতে কি আমার পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—বলুন, হইয়াছিল কি?

অতঃপর ধর্মমহাসভায় আমার নামযশ হইল। তখন হইতে প্রচণ্ড কার্যের সূত্রপাত হইল। যে-শহরেই আমি যাই, সেখানেই এই থিওজফিস্টরা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সদস্যগণকে আমার বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ করা হইত, আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিলেই তাহারা সোসাইটির সহানুভূতি হারাইবে। কারণ ঐ সোসাইটির এসোটেরিক (গুপ্তসাধনা) বিভাগের মত এইঃ যে-কেহ উহাতে যোগ দিবে, তাহাকে কেবলমাত্র 'কুথুমি ও মোরিয়ার'—তাঁহারা যাহাই হউন, তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা লইতে হইবে। অবশ্য ইঁহারা অপ্রত্যক্ষ, আর ইঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি—মিঃ জজ্ ও

মিসেস বেস্যান্ট। সুতরাং এসোটেরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার অর্থ এই যে, নিজের স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে ইঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য আমি কখনই এরূপ করিতে পারিতাম না, আর যে-ব্যক্তি এরূপ করে, তাহাকে হিন্দু বলিতেও পারি না।

তারপর থিওজফিস্টদের নিজেদের ভিতরই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। পরলোকগত মিঃ জজের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। তিনি একজন গুণবান, সরল, অকপট প্রতিপক্ষ ছিলেন; আর তিনি থিওজফিস্টদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার সহিত মিসেস বেস্যাণ্টের যে বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোনরূপ রায় দিবার অধিকার নাই, কারণ উভয়েই নিজ নিজ ‘মহাত্মা’র বাক্যকে সত্য বলিয়া দাবী করিতেছেন। সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে আশ্চর্য এই যে, উভয়ে একই মহাত্মাকে দাবী করিতেছেন। ঈশ্বর জানেন সত্য কী; তিনিই একমাত্র বিচারক, আর যেখানে উভয়ের পক্ষেই যুক্তিপ্রমাণ সমতুল্য, সেখানে একদিকে বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া রায় দিবার অধিকার কাহারও নাই। এইরূপে তাঁহারা দুই বৎসর ধরিয়া সমগ্র আমেরিকায় আমার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন! তারপর তাঁহারা—অপর বিরুদ্ধপক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহিত যোগ দিলেন। এই শেষোক্তেরা আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ি হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে-কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাকে তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে বলিতে লাগিল।

আর আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা। ইনি প্রতিদিনই প্রচার করিতেছেন, খ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছেন। খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? ইহাই কি ভারত সংস্কারের উপায়? আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বৎসর যাবৎ আমার সহিত এই স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ

হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু তাঁহারই নিকট আমি এই ব্যবহার পাইলাম! যেদিন ধর্ম-মহাসভায় আমি প্রশংসা পাই, যেদিন চিকাগোয় আমি সকলের প্রিয় হই, সেই দিন হইতে তাঁর সুর বদলাইয়া গেল; তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আমার অনিষ্ট করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে তাড়াইয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? জিজ্ঞাসা করি, বিশ বৎসর খ্রীষ্টের পদতলে বসিয়া তিনি কি এই শিক্ষাই পাইয়াছেন? আমাদের বড় বড় সংস্কারকগণ যে বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টশক্তি ভারতবাসিগণের উন্নতিবিধান করিবে, তাহা কি এইরূপে হইবে? অবশ্য যদি ঐ ভদ্রলোককে উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যায়, তবে বড় আশা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আর এক কথা। আমি সমাজ-সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে, তাঁহারা বলিতেছেন, আমি শূদ্র, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেনঃ শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এইঃ যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও—আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণসহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙলা দেশেই আমার জাতি হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের দেশের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জ্ঞান থাকা উচিত ছিল; তাঁহার জানা উচিৎ ছিল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। এ-সব কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইল বলিয়াই বলিলাম। আমি পূর্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত

করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমাকে শূদ্র বলিলে আমার বাস্তবিক কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্বপুরুষগণ দরিদ্রগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধস্বরূপ হইবে।

যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি অবশ্য ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? এই ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী, তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন—ইহাতে কি সে কখনও সম্মত হইতে পারে? সুতরাং গভীর রাত্রে অজ্ঞাতভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি পায়খানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন। দিনের পর দিন এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি নিজেকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিয়া তুলিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি।

হিন্দুরা এইরূপেই তোমাদিগকে ও সর্বসাধারণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারা ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। বিশ বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এমন চরিত্র গঠিত হইয়াছে যে, কেবল বন্ধুর কিছু মানযশ হইয়াছে বলিয়া, সে তাহার অর্থোপার্জনের বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে মনে করিয়া বিদেশে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে! আর খাঁটি পুরাতন হিন্দুধর্ম কিরূপে কাজ করে, অপরটি তাহার উদাহরণ। আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পায়খানা সাফ ও চুল দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হউন, তবেই আমি তাঁহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব, তাহার পূর্বে নহে। সামান্য এতটুকু কাজ হাজার হাজার লম্বা কথার সমতুল।

এখন আমি মান্দ্রাজের সংস্কার-সভাগুলির কথা বলিব। তাঁহারা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি অনেক সহৃদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং

বাঙলা ও মান্দ্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে তাঁহারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আর আমি এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি অনেকবার বলিয়াছি—মান্দ্রাজের এখন বড়ই সুন্দর অবস্থা। বাঙলায় যেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, এখানে সেরূপ হয় নাই। এখানে বরাবর ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে সর্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, এখানে সমাজের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়াছে, কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙলা দেশে পুরাতনের পুনরুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু মান্দ্রাজের উন্নতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে হইতেছে। সুতরাং এখানকার সংস্কারকগণ দুই প্রদেশের সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে যে প্রভেদ দেখান, সে-বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের এক বিষয়ে মতভেদ আছে—সেটি তাঁহারা বুঝেন না।

আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কার-সমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে-ব্যক্তি চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া অনাহারে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে-ব্যক্তি এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে, কোথায় শুইবে—তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাকে এত সহজে ভয় দেখানো যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি [বিদেশে] একরূপ বিনা পরিচ্ছদে হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রী নীচে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি খাইবে—কিছুই ঠিক ছিল না, তাহাকে ভারতে এত সহজে ভয় দেখানো যাইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই যে, তাঁহারা জানিয়া রাখুন—আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে, আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে, আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিবার আছে; আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই মঙ্গলবার্তা মানুষকে দিয়া যাইব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু-আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য

কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা, আমার পদ্ধতি—সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে এই বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না যে, 'তোমায় এদিকে চলিতে হইবে, ওদিকে নয়।' আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মত হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল—ইহাই আমার ভাব।

এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শতাব্দী যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে, এই অদ্ভুত জাতীয় জীবন-নদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে—কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, উহা ভাল কি মন্দ বা কিরূপে উহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত? সহস্র ঘটনাচক্র উহাকে বিশেষরূপে বেগবিশিষ্ট করিয়াছে, তাই কখনও উহা মৃদু—কখনও-বা দ্রুত গতি-বিশিষ্ট হইতেছে। কে উহার গতি নিয়মিত করিতে সাহস করে? গীতার উপদেশ অনুসারে আমাদিগকে কেবল কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করিয়া যাও, কিন্তু জাতীয় জীবন স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হইবে, কাহারও সাধ্য নাই—'এইরূপে বিকশিত হও' বলিয়া উপদেশ দিতে পারে।

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে; অন্যান্য সমাজেও আছে। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে সময় সময় ধরিত্রী সিক্ত হয়, সেখানে—পাশ্চাত্যদেশে অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত। এখানে জীবন দারিদ্র্যবিষে জর্জরিত, সেখানে বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃত; এখানে লোক না খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, সেখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যে লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। দোষ সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মত, পা হইতে দূর করিলে মাথায় ধরে; মাথা হইতে তাড়াইলে উহা আবার অন্যত্র আশ্রয় লয়। কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া বেড়ানো মাত্র—এইটুকুই করা যায়।

হে বালকগণ, অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেয়—ভাল ও মন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। একটি লইলে অন্যটিকে লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে কোথাও-না-কোথাও জল খানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাই নয়, সমুদয় জীবনই দুঃখময়। কাহারও প্রাণনাশ না করিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ পর্যন্ত অসম্ভব; কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া এক টুকরা খাদ্যও গ্রহণ করা যায় না। ইহাই প্রকৃতির বিধান, ইহাই জীবন-দর্শন।

এই কারণে আমাদিগকে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা বলি না কেন, বুঝিতে হইবে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত হইতে ধর্মান্ধতা একেবারে দূর করিয়া আমাদিগকে শান্ত—উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোন সংস্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই এই মাত্র ফল দাঁড়াইয়াছে যে, যে-উদ্দেশ্যে সংস্কার-চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্যেই বিফল হইয়াছে। আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আন্দোলন কল্পনা করা যাইতে পারে না; তোমাদের সকলেরই উহা জানা আছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে। দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে দাসদের যে অবস্থা ছিল, পরে তাহাদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শতগুণ মন্দ হইয়াছে। দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে এই হতভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত—নিজ সম্পত্তিরনাশের আশঙ্কায় অধিকারিগণকে দেখিতে হইত, যাহাতে তাহারা দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া না পড়ে। কিন্তু এখন তাহারা কাহারও সম্পত্তি নয়, তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই; এখন সামান্য ছুতা করিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত পুড়াইয়া ফেলা হয়, গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়; কিন্তু হত্যাকারীর শাস্তির জন্য কোন আইন নাই, কারণ নিহত ব্যক্তি

যে 'নিগার'—ইহারা মানুষ নহে, এমন কি পশু-নামেরও যোগ্য নহে। আইনের দ্বারা অথবা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোন সামাজিক দোষ প্রতিকার করিবার চেষ্টার ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

কোন কল্যাণসাধনের জন্য এইরূপ উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমি ইহা দেখিয়াছি, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এইরূপ দোষারোপকারী কোন সমিতির সহিত যোগ দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দাবাদের প্রয়োজন কি? সকল সমাজেই দোষ আছে; সকলেই তাহা জানে। আজকালকার ছোট ছেলে পর্যন্ত তাহা জানে। সেও মঞ্চে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষগুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে রীতিমত একটি বক্তৃতা শুনিয়া দিতে পারে। যে-কোন অশিক্ষিত বৈদেশিক এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিবার পথে ভারতে আসিয়া থাকেন, তিনিই তাড়াতাড়ি রেলভ্রমণের পর ভারতবর্ষের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইয়া ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর প্রথাসম্বন্ধে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু। সেই জলমগ্ন বালক ও দার্শনিকের গল্পে—দার্শনিক যখন বালককে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন বলিয়াছিল, 'আগে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনিব,' সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, অনেক সমিতি দেখিয়াছি, ঢের কাগজ পড়িয়াছি; এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদের হাত ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন?' এইরূপ লোক চাই। এইখানেই আমার এই-সকল সংস্কার-আন্দোলনের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু উহা দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কী উপকার হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর

সমালোচনা করিয়াছেন, উহার উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; শেষে প্রাচীন সমাজের লোকেরা তাঁহাদের সুর ধরিয়াছেন, ঢিলটি খাইয়া পাটকেলটি মারিয়াছেন; আর তাহার ফল হইয়াছে এই যে, প্রত্যেকটি দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির—সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত! ইহাই কি সংস্কার? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ? ইহা কার দোষ?

অতঃপর আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে—ভারতে আমরা বরাবর রাজশাসনাধীনে কাটাইয়াছি—রাজারাই আমাদের জন্য চিরদিন বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই রাজারা নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইবার কেহ নাই। সরকার সাহস করেন না। সরকারকে সাধারণের মতামতের গতি দেখিয়া নিজ কার্যপ্রণালী স্থির করিতে হয়। কিন্তু নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর, প্রবল জনমত গঠিত হইতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজসংস্কার-সমস্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের নিকটই কোন বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তো অত্যাচার; ইহার মত প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের নিকট কতকগুলি বিষয় দোষযুক্ত হইলেই সেগুলি সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে-চড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনা-আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে—যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই; যে নূতন শক্তিতে—যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সে লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

গত শতাব্দীতে যে-সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশ পোশাকী ধরনের। এই সংস্কার-চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণ (জাতি)-কে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় নারীর কোন স্বার্থই নাই। আর সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে-সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য এ ধরনের সকল আন্দোলন। নিজেদের ঘর পরিষ্কার করিতে এবং বিদেশীদের চোখে সুন্দর প্রতীয়মান হইবার জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহাকে তো সংস্কার বলা যায় না। সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি 'আমূল সংস্কার' বা প্রকৃত সংস্কার বলিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকুক, [আবর্জনা পুড়িয়া যাক] এবং একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠিত হউক।

আর সমস্যা বড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্যা; সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই! এটিও জানিয়া রাখো যে, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ অবহিত ছিলেন। আজকাল বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম ও উহার অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা একটা ঢঙ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচনাকারীরা স্বপ্নেও কখনও ভাবে না যে, আমাদের সমাজে যে-সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, সেগুলি বৌদ্ধধর্ম-জাত। বৌদ্ধধর্মই আমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারস্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস কখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পড়িয়া থাক যে, গৌতমবুদ্ধ-প্রচারিত অপূর্ব নীতি ও তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-গুণে বৌদ্ধধর্ম এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ করঃ বৌদ্ধধর্মের বিস্তার উহার মতবাদের জন্য বা উক্ত মহাপুরুষের চরিত্রগুণে ততটা হয় নাই—বৌদ্ধগণ যে-সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে-সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে-সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, সেগুলির জন্য যতটা হইয়াছিল। এইরূপেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে।

এই-সকল বড় বড় মন্দির ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংগ্রামে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র হোমকুণ্ডগুলি দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অধঃপতিত হইল; অনুষ্ঠানগুলি পরিশেষে এরূপ ঘৃণিত ভাব ধারণ করে যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট আমি তাহা বলিতে অক্ষম। যাঁহারা এ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার কারুকার্যপূর্ণ দক্ষিণ ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলি দেখিয়া আসিবেন। বৌদ্ধগণের নিকট হইতে দায়স্বরূপ আমরা ইহাই মাত্র পাইয়াছি। অতঃপর সেই মহান্ সংস্কারক শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুবর্তিগণের অভ্যুদয় হইল, আর তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্যন্ত কয়েক শত বর্ষ যাবৎ ভারতের সর্বসাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ধর্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই সংস্কারকগণ সমাজের দোষগুলি বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি তাঁহারা সমাজকে নিন্দা করেন নাই। তাঁহারা এ কথা বলেন নাই—তোমাদের যাহা আছে সব ভুল, তোমাদিগকে সব ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি সম্প্রতি পড়িতেছিলাম—আমার বন্ধু ব্যারোজ সাহেব বলিতেছেন, ৩০০ বৎসরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রীক ও রোমক প্রভাবকে একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছিল। যিনি ইওরোপ—গ্রীস ও রোম দেখিয়াছেন, তিনি কখনও এ-কথা বলিতে পারেন না। রোমক ও গ্রীক ধর্মের প্রভাব—এমন কি প্রোটেস্টাণ্ট দেশসমূহে পর্যন্ত রহিয়াছে, নামটুকু বদলাইয়াছে মাত্র; প্রাচীন দেবগণই নূতন বেশে বিদ্যমান—কেবল নাম বদলানো। দেবীগণ হইয়াছেন মেরী, দেবগণ হইয়াছেন সাধুবৃন্দ (Saints) এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন উপাধি 'পণ্টিফেক্স্ ম্যাক্সিমাস' ৮ পর্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতেই পারে না, ইহা বড় সহজ নহে—আর শঙ্করাচার্য এ তত্ত্ব জানিতেন, রামানুজও জানিতেন, এরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। সুতরাং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্মকে ধীরে ধীরে উচ্চতম আদর্শের অভিমুখে গড়িয়া তোলা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি তাঁহারা অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা একেবারে সব উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কপট হইতে হইত; কারণ তাঁহাদের ধর্মের প্রধান মতই ক্রমোন্নতিবাদ—এই-সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দিয়া আত্মা তাঁহার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবে—ইহাই তাঁহাদের মূল মত। সুতরাং এই

সোপানগুলি সবই আবশ্যক এবং আমাদের সহায়ক। কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে সাহসী হইবে?

আজকাল একটি কথা চালু হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই বিনা আপত্তিতে এটি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা অন্যায়। আমিও এক সময়ে ঐরূপ ভাবিতাম, এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন একজনের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুলপূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কি চাও?—সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সৃষ্টি করিতে পার, তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা সাফল্য লাভ কর। যে-কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহান্ চরিত্র সৃষ্টি কর। আর পুতুলপূজাকে লোকে গালি দেয়! কেন?—তাহা কেহই জানে না। কারণ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে জনৈক য়াহুদী-বংশসম্ভূত ব্যক্তি পুতুলপূজাকে নিন্দা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই য়াহুদী বলিয়াছিলেন, যদি কোন বিশেষ ভাব-প্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, মহা পাপ; কিন্তু যদি একটি সিন্দুকের দুইধারে দুইজন দেবদূত, তাহার উপরে মেঘ—এইরূপে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র। ঈশ্বর যদি ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র; কিন্তু যদি গভীর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা হিদেনদের কুসংস্কার! অতএব উহার নিন্দা কর।

দুনিয়া এইভাবেই চলিয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন, 'আমরা মর্ত্যমানব কি নির্বোধ!' পরের চক্ষে দেখা ও বিচার করা কি কঠিন ব্যাপার! আর ইহাই মনুষ্যসমাজের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। ইহাই ঈর্ষা ঘৃণা বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মূল। বালকগণ, অর্বাচীন শিশুগণ, তোমরা মান্দ্রাজের বাহিরে কখনও যাও নাই; তোমরা সহস্র সহস্র প্রাচীনসংস্কার-নিয়ন্ত্রিত ত্রিশকোটি লোকের উপর আইন চালাইতে চাও—তোমাদের লজ্জা করে না? এরূপ বিষম

দোষ হইতে বিরত হও এবং আগে নিজেরা শিক্ষা লাভ কর। শ্রদ্ধাহীন বালকগণ, তোমরা কেবল কাগজে গোটাকতক লাইন আঁচড় কাটিতে পার, আর কোন আহাম্মককে ধরিয়া উহা ছাপাইয়া দিতে পার বলিয়া নিজদিগকে জগতের শিক্ষক—ভারতের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেছ! তাই নয় কি?

এই কারণে আমি মান্দ্রাজের সংস্কারকগণকে এইটুকু বলিতে চাই যে, তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে; তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার জন্য আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। কিন্তু ভাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইভাবে আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি—তাঁহাদের কার্যপ্রণালী ঠিক নহে। শত বৎসর যাবৎ এই প্রণালীতে কার্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন আমাদিগকে অন্য কোন নূতন উপায়ে কাজ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য। ভারতে কি কখনও সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা তো ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর ? নানক? চৈতন্য? কবীর ? দাদু? এই যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মত একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন?রামানুজের হৃদয় কি নীচজাতির জন্য কাঁদে নাই? তিনি কি সারাজীবন পারিয়াদিগকে৯ পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিতে চেষ্টা করেন নাই? তিনি কি হিন্দু মুসলমানকে পর্যন্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া সমাজে নূতন অবস্থা আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই? তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কাজ এখনও চলিতাছে। তবে প্রভেদ এই—তাঁহারা আধুনিক সংস্কারকগণের মত চীৎকার ও বাহ্যাড়ম্বর করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের মত তাঁহাদের মুখ হইতে কখনও অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্বাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখনও সমাজের উপর দোষারোপ করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন, হিন্দুজাতিকে চিরকাল ধরিয়া ক্রমাগত উন্নতি করিতে হইবে। তাঁহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন—হিন্দুগণ, তোমরা এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ,

আমাদিগকে আরও ভাল কাজ করিতে হইবে। তাঁহারা এ-কথা বলেন নাই যে, তোমরা এতদিন মন্দ ছিলে, এখন তোমাদিগকে ভাল হইতে হইবে। তাঁহারা বলিতেন, তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদিগকে আরও ভাল হইতে হইবে। এই দুই প্রকার কথার ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙিয়া-চুরিয়া অপর জাতির মত গড়িতে পারা অসম্ভব, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। প্রথমে এইটিই শিক্ষা করিতে হইবে। এক ধরনের বিজ্ঞান, ঐতিহ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হওয়ায় তাহাদের আধুনিক সমাজব্যবস্থা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে আবার একপ্রকার ঐতিহ্য এবং সহস্র সহস্র বৎসর কর্ম রহিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কার অনুযায়ী চলিতে পারি, এবং আমাদিগকে সেইরূপ করিতে হইবে।

তবে আমি কি প্রণালীতে কাজ করিব? আমি প্রাচীন মহান্ আচার্যগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে চাই। আমি তাঁহাদের কাজ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারা কি প্রণালীতে কাজ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই মহাপুরুষগণ সমাজদেহ সংগঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাতে বিশেষভাবে বল, পবিত্রতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও ঐরূপ কার্য করিতেই হইবে। এখন অবস্থাচক্রের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, সেজন্য কার্যপ্রণালীর সামান্য পরিবর্তন করিতে হইবে, আর কিছু নয়।

আমি দেখিতেছি—ব্যক্তির পক্ষে যেমন, প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনি জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর, অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া

ঐক্যতান সৃষ্টি করিতেছে। কোন দেশের—যথা ইংলণ্ডের জীবনীশক্তি রাজনীতিক ক্ষমতায়। কলাবিদ্যার উন্নতিই হয়তো অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্মই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার নিজস্ব গতিধারা চলিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফলে তোমরা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, সেজন্য তোমাদিগকে তোমাদের প্রাণশক্তি—ধর্মের মধ্য দিয়া সব কাজ করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি তোমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ সুরে বাজিতে থাকুক। আমি দেখিয়াছি, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ধর্ম কিভাবে কাজ করিবে—ইহা না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। বেদান্তের দ্বারা কিরূপ অদ্ভুত রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হইবে, ইহা না দেখাইয়া আমি ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। এইভাবে ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, সেই নূতন সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা জীবন কতটা আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে, উহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি কত অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয়; প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতে হইবে। আর এই পন্থা-নির্বাচন এমন কিছু খারাপ হয় নাই। জড়ের পরিবর্তে চৈতন্য, মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বরের চিন্তাকে কি বিশেষ মন্দ পথ বলিতে পার? তোমাদের মধ্যে পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ়বিশ্বাস বিদ্যমান। কই, এই ভাব ত্যাগ কর দেখি! তোমরা কখনই ইহা ত্যাগ করিতে পার না। তোমরা জড়বাদী হইয়া কিছুদিন জড়বাদের কথা বলিয়া আমাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের স্বভাব জানি। যখনই

তোমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে একটু ভুল করিয়া বুঝাইয়া দিব, অমনি তোমরা পরম আস্তিক হইবে। স্বভাব বদলাইবে কিরূপে? তোমরা যে ধর্মগতপ্রাণ।

এই জন্য ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিকভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর। প্রথমেই এইটি করা আবশ্যক। প্রথমেই আমাদিগকে এই কাজে মন দিতে হইবে যেঃ আমাদের উপনিষদে—আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে-সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সেগুলি ঐ-সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিতে হইবে, যেন ঐ-সকল শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মত উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম—হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই-সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে; কারণ শাস্ত্র বলেন—প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন কর্তব্য। প্রথমে লোকে শাস্ত্রবাক্যগুলি শুনুক, আর যে ব্যক্তি জনসাধারণকে তাহাদের ধর্মগ্রন্থের ও শাস্ত্রের অন্তর্গত মহান্ সত্যগুলি শুনাইতে সাহায্য করে, সে আজ এমন এক কাজ করিতেছে, যাহার সঙ্গে অন্য কোন কাজের তুলনা হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, ‘এই কলিযুগে মানুষের একটি কাজ করিবার আছে। আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় কোন ফল হয় না। এখন দানই একমাত্র কর্ম।১০ দানের মধ্যে ধর্মদান—আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান; দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। এই অপূর্ব দানশীল হিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টপাত কর। এই দরিদ্র—অতি দরিদ্র দেশে লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এমন অতিথিপরায়ণ যে, যে-কোন ব্যক্তি বিনাসম্বলে ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন। লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, সেইরূপ তিনি যেখানেই যাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ পর্যন্ত এক টুকরা রুটি থাকে, ততক্ষণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া মরিতে হয় না।

এই দানশীল দেশে আমাদিগকে প্রথম দুই প্রকার দানে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান। এই জ্ঞানদান আবার শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—সমগ্র বিশ্বে ইহা প্রচার করিতে হইবে। ইহাই বরাবর হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন ভারতীয় চিন্তারাশি কখনও ভারতের বাহিরে যায় নাই—যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন, ভারতের বাহিরে ধর্মপ্রচারের জন্য আমিই প্রথম সন্ন্যাসী গিয়াছি, তাঁহারা নিজেদের জাতির ইতিহাস জানেন না। এই ধর্মপ্রচারের ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত বন্যা সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। অগণিত সৈন্যদল লইয়া উচ্চরবে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রাজনীতিক শিক্ষা বিস্তার করা যাইতে পারে; লৌকিক জ্ঞান বা সামাজিক জ্ঞান বিস্তার করিতে হইলেও তরবারি বা কামানের সাহায্যে উহা হইতে পারে; শিশিরবিন্দু যেমন অশ্রুত ও অদৃশ্যভাবে পতিত হইয়াও রাশি রাশি গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান তেমনি নীরবে—সকলের অজ্ঞাতসারেই হওয়া সম্ভব।

ভারত বার বার জগৎকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপহার দিয়া আসিতেছে। যখনই কোন শক্তিশালী দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যখনই তাহারা পথঘাট নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সুগম করিয়াছে, অমনি ভারত উঠিয়া সমগ্র জগতের উন্নতিকল্পে তাহার যাহা দিবার আছে—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব জন্মিবার বহুদিন পূর্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে। চীন, এশিয়া-মাইনর ও মালয়-দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে এখনও তাহার চিহ্ন বর্তমান। যখন সেই প্রবল গ্রীক দিগ্বিজয়ী তদানীন্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিলেন, তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল—তখনও ভারতীয় ধর্মভাব সেই-সকল স্থানে ছুটিয়া গিয়াছিল। আর পাশ্চাত্য দেশ এখন যে-সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে, তাহা সেই মহাবন্যারই অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র। এখন আবার সেই সুযোগ উপস্থিত। ইংলণ্ডের শক্তি পৃথিবীর জাতিগুলিকে সংযুক্ত করিয়াছে; এরূপ আর পূর্বে কখনও হয় নাই। ইংরেজদের রাস্তা ও যাতায়াতের অন্যান্য উপায়গুলি জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, ইংরেজ-প্রতিভায় জগৎ আজ অপূর্বভাবে একসূত্রে গ্রথিত। আজকাল

যেরূপ নানাস্থানে বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসে পূর্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সুতরাং এই সুযোগে ভারত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব না করিয়া জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দান করিতেছে। এখন এই-সকল পথ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাবরাশি সমগ্র জগতে ছড়াইতে থাকিবে।

আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমাদের ইচ্ছায় হয় নাই। ভারতের ভগবান্, যিনি তাহার ভাগ্যবিধাতা, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই এইরূপ শত শত ব্যক্তিকে জগতের সকল জাতির নিকট প্রেরণ করিবেন। পার্থিব কোন শক্তিই ইহাকে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও ধর্মপ্রচারে যাইতে হইবে। এই ধর্মপ্রচারের জন্য তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতেই হইবে; জগতের সকল জাতির নিকট, সকল ব্যক্তির নিকট প্রচার করিতে হইবে। প্রথমেই এই ধর্মপ্রচার আবশ্যক।

ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনি আসিবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি, এত বড় যে বৌদ্ধধর্ম, তাহাও কতকটা এই কারণেই এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

হে বন্ধুগণ, এই জন্য আমার সঙ্কল্প এই যে, ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত সত্যসমূহ প্রচার করিবার কাজে শিক্ষালাভ করিবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্য কিছু অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির কাছে আর সবই শক্তিহীন হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছার শক্তি অসীম।

তোমরা কি বিশ্বাস কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ প্রচার কর, প্রচার কর; জগৎ এই-সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তাহার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হইতেছে; তাহাদিগকে শেখানো হইয়াছে—তাহারা কিছুই নয়। সর্বত্র জনসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখানো হইয়াছে—ক্রমশঃ তাহারা সত্যসত্যই পশুস্তরে নামিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক; তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে—নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন; সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তরবারি তাঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; তিনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী।

অতএব আত্মবিশ্বাসী হও। ইংরেজ জাতির সঙ্গে তোমাদের এত প্রভেদ কিসে?তাহারা তাহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্তব্যজ্ঞান ইত্যাদির কথা যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিয়াছি, উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ কোথায়। প্রভেদ এই—ইংরেজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা বিশ্বাসী নও। ইংরেজ বিশ্বাস করে—সে যখন ইংরেজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। এই বিশ্বাসবলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই—কাজেই তোমরা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ। অতএব আত্মবিশ্বাসী হও।

আমাদের এখন প্রয়োজন—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই-সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়েকাণ্ড—সব আসিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কিছু মহৎ তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলি আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহের মত পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে

মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন। কোন বিষয় সত্য কি অসত্য—জানিতে হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এইঃ উহা তোমাকে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে কিনা; যদি করে তবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর—উহাতে প্রাণ নাই, উহা কখনও সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ, সত্যই পবিত্রতা-বিধায়ক, সত্যই জ্ঞানস্বরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, হৃদযের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, হৃদয়ে বল দেয়। এই-সকল রহস্যময় গুহ্য মতে কিছু সত্য থাকিলেও সাধারণতঃ উহা মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। আমাকে বিশ্বাস কর, সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বুঝিয়াছি। আমি ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, এদেশের প্রায় সকল গুহা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, হিমালয়েও বাস করিয়াছি। এমন অনেককে জানি, যাহারা সারা জীবন সেখানে বাস করিতেছে। আমি ঐ-সকল গুহ্য মত সম্বন্ধে এই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐগুলি মানুষকে কেবল দুর্বল করিয়া দেয়। আর আমি আমার স্বজাতিকে ভালবাসি; তোমরা তো এখনই যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ, তোমাদিগকে আর দুর্বলতর—হীনতর হইতে দেখিতে পারি না। অতএব তোমাদের কল্যাণের জন্য এবং সত্যের জন্য, আমার স্বজাতির যাহাতে আর অবনতি না হয় সেজন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছিঃ আর না, অবনতির পথে আর অগ্রসর হইও না—যতদূর গিয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে।

এখন বীর্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই-সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদ্‌রূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য অতি সহজ। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য-সমূহ অবলোকন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।

আর একটি কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে। লোকে স্বদেশহিতৈষিতার আদর্শের কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাস করি। স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিষ প্রয়োজন প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই-সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে?এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে

জানিতে, তাহারা অবশ্য এ-কথা জান। ধর্মমহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস-স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর কে লয়?

ইহাই স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান। মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? দেশবাসীকে গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি?—কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, 'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু—আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে একবিন্দু বিচলিত হন না।১১ সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমার কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার?তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্বতের গুহায় গিয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়তো শত শত বৎসর যাবৎ উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তার এমনই শক্তি।

আর এককথা—আমার আশঙ্কা হয়, তোমাদের বিলম্ব হইতেছে; হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-সমুদ্রের পারে লইয়া যাইতেছে। ইহার সহায়তায় অনেক শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানব জীবন-সমুদ্রের অপর পারে অমৃতধামে নীত হইয়াছে। আজ হয়তো তোমাদের নিজ-দোষেই উহাতে দু-একটি ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিষ অপেক্ষা যে-জিনিষ আমাদের অধিক কাজে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই ঐ ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমরা বন্ধ করিতে না পারি, তবে মরিতে হইবে। আমরা আমাদের বুদ্ধিসহায়ে ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিব, কিন্তু কখনই উহার নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না। আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ তোমরা দেবতাদের বংশধর, তোমরা মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের সন্তান। তোমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক। তোমাদিগকে কি নিন্দা করিব বা গালি দিব?—কখনই নয়। হে আমার সন্তানগণ, তোমাদের নিকট আমার সমুদয় পরিকল্পনা বলিতে আসিয়াছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি না শোন, এমন কি আমাকে ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব—আমরা সকলে ডুবিতেছি। এই জন্যই আমি তোমাদের ভিতর তোমাদেরই একজন হইয়া তোমাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ডুবিতেই হয়, তবে আমরা যেন সকলে একসঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারও প্রতি যেন কটূক্তি প্রয়োগ না করি।

# ১২. ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা

[মান্দ্রাজে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা]

আমাদের জাতি ও ধর্মের অভিধা বা সংজ্ঞা-স্বরূপ একটি শব্দ খুব চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি 'হিন্দু' শব্দটি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। 'বেদান্তধর্ম' বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা বুঝাইবার জন্য এই শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধু-নদকে 'হিন্দু' বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় যেখানে 'স' আছে, প্রাচীন পারসীক ভাষায় তাহাই 'হ'-রূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সিন্ধু হইতে 'হিন্দু' হইল। আর তোমরা সকলেই জান, গ্রীকগণ 'হ' উচ্চারণ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা একেবারে 'হ' টিকে উড়াইয়া দিল—এইরূপে আমরা 'ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত হইলাম।

এখন কথা এই, প্রাচীনকালে এই শব্দের অর্থ যাহাই থাকুক, উহা সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসিগণকেই বুঝাক বা যাহাই বুঝাক, বর্তমানে এই শব্দের আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ এখন আর সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসিগণ একধর্মাবলম্বী নহে। এখানে এখন আসল হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান, কিছু বৌদ্ধ ও জৈন বাস করিতেছেন। 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইঁহাদের সকলকেই হিন্দু বলিতে হয়, কিন্তু ধর্মহিসাবে ইঁহাদের সকলকে হিন্দু বলা চলে না। আর আমাদের ধর্ম যেন নানা মত, নানা ভাব এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি—এইসব একসঙ্গে রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের একটা সাধারণ নাম নাই, একটা মণ্ডলী নাই, একটা সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই। এই কারণে আমাদের ধর্মের একটি সাধারণ বা সর্ববাদিসম্মত নাম দেওয়া বড় কঠিন। বোধ হয়, একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, আমরা সকলেই আমাদের

শাস্ত্র—বেদে বিশ্বাসী। এটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে-ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে ‘হিন্দু’ বলিবার অধিকার নাই।

তোমরা সকলেই জান, এই বেদসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে নানাবিধ যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে, উহাদের মধ্যে অধিকাংশই আজকাল প্রচলিত নাই। জ্ঞানকাণ্ডে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ—উহা ‘উপনিষদ্’ বা ‘বেদান্ত’ নামে পরিচিত। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী আচার্য ও দার্শনিকগণ—সকলেই উহাকে উচ্চতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় প্রত্যেক দর্শন ও প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই দেখাইতে হয় যে, ঐ দর্শন বা সম্প্রদায় উপনিষদ্-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে সেই দর্শন বা সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং বর্তমানকালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ ‘বৈদান্তিক’ বা ‘বৈদিক’—এই দুইটির মধ্যে যেটি তোমাদের ইচ্ছা বলিলেই ঠিক বলা হইবে। আর আমি ‘বৈদান্তিক ধর্ম’ ও ‘বেদান্ত’ শব্দ দুইটি ঐ অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি।

আর একটু স্পষ্ট করিয়া এইটি বুঝাইতে চাই; কারণ ইদানীং বেদান্তদর্শনের ‘অদ্বৈত’ ব্যাখ্যাকেই ‘বেদান্ত’ শব্দের সমার্থক-রূপে প্রয়োগ করা অধিকাংশ লোকেরই একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে-সকল বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাহাদের অন্যতম মাত্র। উপনিষদের প্রতি অদ্বৈতবাদীর যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও ততটা আছে; এবং অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদের দর্শন বেদান্ত-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতটা দাবী করেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও ততটাই করিয়া থাকেন। দ্বৈতবাদী ও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিও এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের মনে ‘বৈদান্তিক’ ও ‘অদ্বৈতবাদী’ সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহার কিছু কারণও আছে।

যদিও বেদই আমাদের প্রধান শাস্ত্র, তথাপি বেদের পরবর্তী স্মৃতি-পুরাণও আমাদের শাস্ত্র; কারণ সেগুলিতে বেদেরই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত

হইয়াছে। এগুলি অবশ্য বেদের মত প্রামাণিক নহে। আর ইহাও শাস্ত্রবিধান যে, যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির মতই গ্রাহ্য হইবে এবং স্মৃতির মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন আমরা দেখিতে পাই—অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামী আচার্যগণের ব্যাখ্যায় প্রমাণরূপে উপনিষদ্ অধিক পরিমাণে উদ্বৃত হইয়াছে। কেবল যেখানে এমন বিষয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা শ্রুতিতে কোনরূপে পাওয়া যায় না, এমন অল্পস্থলেই কেবল স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য মতবাদিগণ কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন; যতই আমরা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের পর্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহাদের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্য শ্রুতির তুলনায় এত অধিক যে, বৈদান্তিকের নিকট তাহা আশা করা উচিত নয়। বোধ হয়, ইঁহারা স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণের উপর এত অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন যে, কালে অদ্বৈতবাদীই খাঁটি বৈদান্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 'বেদান্ত' শব্দ দ্বারা ভারতীয় ধর্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর বেদান্ত যখন বেদ, তখন ইহা সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক, হিন্দুরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন যে, বেদের কিছু অংশ এক সময়ে, আবার এবং কিছু অংশ অন্য সময়ে লিখিত হইয়াছে। হিন্দুরা অবশ্য এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সমগ্র বেদ এককালে উৎপন্ন হইয়াছিল, অথবা যদি আমার এরূপ ভাষা-প্রয়োগে কেহ আপত্তি না করেন—বেদ কখনই সৃষ্ট হয় নাই, চিরকালই সৃষ্টিকর্তার মনে উহা ছিল। 'বেদান্ত' শব্দে আমি উহাকেই—অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি; ভারতের দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ আমরা বৌদ্ধধর্ম, এমন কি জৈনধর্মের অংশবিশেষও গ্রহণ করিতে পারি—যদি উক্ত ধর্মাবলম্বিগণ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্যে আসিতে সম্মত হন। আমাদের হৃদয় তো যথেষ্ট প্রশস্ত—আমরা তো তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—তাঁহারাই আসিতে অসম্মত। আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, বৌদ্ধধর্মের সারভাগ ঐ-সব উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত; এমন কি বৌদ্ধধর্মের নীতি—তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব—কোন না কোন

উপনিষদে অবিকল বর্তমান। এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি উপনিষদে রহিয়াছে, কেবল অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলি নাই। পরবর্তী কালে ভারতীয় ধর্মচিন্তার যে-সকল পরিণতি হইয়াছে, সেগুলিরও বীজ আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই। সময়ে সময়ে বিনা যুক্তিতে এরূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, উপনিষদে 'ভক্তি'র আদর্শ নাই। যাঁহারা উপনিষদ্ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন—এ অভিযোগ মোটেই সত্য নহে। অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক উপনিষদেই যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়, যাহা পরবর্তী কালে পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে বিশেষরূপে পরিণত হইয়া ফলপুষ্পশোভিত মহীরূহের আকার ধারণ করিয়াছে, উপনিষদে সেগুলি মাত্র বীজভাবে বর্তমান। উপনিষদে যেন ঐগুলি চিত্রের প্রথম রেখাপাত অথবা কাঠামোরূপে বর্তমান। কোন না কোন পুরাণে ঐ চিত্রগুলি পরিস্ফুট করা হইয়াছে, কঙ্কালসমূহে মাংস-শোণিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্বভাবের খনিস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। ভালভাবে উপনিষদের জ্ঞান অর্জন করেন নাই, এরূপ কয়েকজন ব্যক্তি প্রমাণ করিবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভক্তিবাদ বিদেশ হইতে আগত; কিন্তু তোমরা সকলেই জান, তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তোমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, সেটুকু সবই উপনিষদের কথা কি, সংহিতাতেই রহিয়াছে—উপাসনা প্রেম ভক্তিতত্ত্ব—যাহা কিছু আবশ্যক, সবই রহিয়াছে; কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। সংহিতা ভাগে স্থানে স্থানে ভীতি-প্রসূত ধর্মের চিহ্ন পাওয়া যায়। সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে দেখা যায়, উপাসক—বরুণ বা অন্য কোন দেবতার সম্মুখে ভয়ে কাঁপিতেছে; স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা নিজদিগকে পাপী ভাবিয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছে; কিন্তু উপনিষদে এ-সকল বর্ণনার স্থান নাই। উপনিষদে ভয়ের ধর্ম নাই; উপনিষদের ধর্ম—প্রেমের, উপনিষদের ধর্ম—জ্ঞানের।

এই উপনিষদ্‌সমূহই আমাদের শাস্ত্র। এইগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখিতে পাই, আমরা শতকরা নব্বই জন পৌরাণিক আর বাকী শতকরা

দশজন বৈদিক—তাহাও হয় কিনা সন্দেহ। আরও দেখিতে পাই—আমাদের মধ্যে নানাবিধ অত্যন্ত-বিরোধী আচার বিদ্যমান; দেখিতে পাই—আমাদের সমাজে এমন সব ধর্মমত রহিয়াছে, যেগুলির কোন প্রমাণ হিন্দুদের শাস্ত্রে নাই। আর শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই এবং দেখিয়া আশ্চর্য হই যে, আমাদের দেশে অনেক স্থলে এমন সব প্রথা প্রচলিত আছে, যেগুলির প্রমাণ বেদ স্মৃতি পুরাণ কোথাও নাই—সেগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচারমাত্র। তথাপি প্রত্যেক অজ্ঞ গ্রামবাসীই মনে করে, যদি তাহার গ্রাম্য আচারটি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম ও এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও সে বুঝিতে পারে না—সে যাহা করিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই! তাহার পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠে যে, ঐ-সকল আচার পরিত্যাগ করিলে তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং সে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইবে, মানুষের মত মানুষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ আর এক অসুবিধা—আমাদের শাস্ত্র অতি বৃহৎ ও অসংখ্য। পতঞ্জলি-প্রণীত ‘মহাভাষ্য’ নামক শব্দশাস্ত্রে পাঠ করা যায়, সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। সেগুলি গেল কোথায়, কেহই জানে না। প্রত্যেক বেদ সম্বন্ধেই এইরূপ। এই-সকল গ্রন্থের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে, সামান্য অংশমাত্র আমাদের নিকট অবশিষ্ট আছে। এক এক ঋষি-পরিবার এক এক শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই-সকল পরিবারের মধ্যে অধিকাংশেরই হয় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বংশলোপ হইয়াছে, অথবা বৈদেশিক অত্যাচারে বা অন্য কারণে তাঁহাদের বিনাশ ঘটিয়াছে। আর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে-বেদের শাখাবিশেষ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক; কারণ যাহারা কিছু নূতন কিছু প্রচার করিতে চায় বা বেদের বিরোধী কোন বিষয় সমর্থন করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে এই যুক্তিটি চরম অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। যখনই ভারতে শ্রুতি ও দেশাচার লইয়া তর্ক উপস্থিত হয় এবং যখনই দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, এই দেশাচারটি শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তখন অপর পক্ষ এই উত্তর দিয়া থাকে, ‘না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, উহা শ্রুতির সেই-সকল শাখায় ছিল, যেগুলি এখন লোপ পাইয়াছে। ঐ প্রথাটিও বেদসম্মত।’ শাস্ত্রের এই-সকল নানাবিধ টীকা-টিপ্পনীর ভিতর কোন সাধারণ

সূত্র বাহির করা অবশ্যই বিশেষ কঠিন। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই-সকল নানাবিধ বিভাগ ও উপবিভাগের একটি সাধারণ ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। অট্টালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নিশ্চয় একটি সাধারণ নকশা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে আমাদের 'ধর্ম' বলি, সেই আপাতবিশৃঙ্খল মতগুলির নিশ্চয় কোন সাধারণ ভিত্তি আছে; তাহা না হইলে উহা এতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

আবার আমাদের ভাষ্যকারদিগের ভাষ্য আলোচনা করিতে গেলে আর এক বাধা উপস্থিত হয়ঃ অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার সোজাসুজি অর্থ করেন; কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন উহার শব্দার্থ বিকৃত করিয়া উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন। ভাষ্যকার নিজ মনোমত অর্থ বাহির করিবার জন্য সময়ে সময়ে 'অজা' (জন্মরহিত) শব্দের অর্থ 'ছাগী' করিয়াছেন—কি অদ্ভুত পরিবর্তন! দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরাও এইরূপ, এমন কি আরও বিকৃতিভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে তাঁহারা দ্বৈতপর শ্রুতি পাইয়াছেন, সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদের কথা আসিয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সেই-সকল শ্রুতির যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাষা এত জটিল—বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র এত সুপরিণত যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের যদি খেয়াল হয়, তবে তিনি যে-কোন যে-কোন অর্থহীন উক্তিকেও যুক্তিবলে এবং শাস্ত্র ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন। উপনিষদ্ বুঝিবার পক্ষে এই-সকল বাধাবিঘ্ন আছে। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমি শুধু অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টরূপে প্রথমে উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিতে শিখিয়াছি। আমি এ-বিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-সকল শাস্ত্রবাক্য পরস্পরবিরোধী নহে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা

করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রুতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত আর উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, ঐগুলির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। আমি এই-সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা—উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈতভাবের অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সেগুলি সমাপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং এখন এই মহাপুরুষের জীবনালোকে আমি দেখিতেছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনে উভয়েরই বিশেষ স্থান আছে। দ্বৈতবাদী থাকিবেই—অদ্বৈতবাদীর ন্যায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না, একটি অপরটির পরিণতি; একটি যেন কাঠামো, অপরটি ছাদ; একটি যেন মূল, অপরটি ফল।

আর উপনিষদের শব্দার্থ বিকৃত করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়; কারণ আমি দেখিতে পাই, উহার ভাষাই অপূর্ব। শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে উহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, মানবজাতির মুক্তিপথ-প্রদর্শক ধর্মজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান্ ভাবের যেমন অতি অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমন নাই। এখানেই মানবমনের সেই ব্যক্তিভাবাপন্ন বৈশিষ্ট্য—সেই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হিন্দুমন পরিপূর্ণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

অন্যান্য সকল জাতির ভিতরেই এই মহান্ ভাবের চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমর বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্‌মন্ত্রে বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব অতি গম্ভীরভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই

দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে-সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ—অনন্ত বিস্তার—অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাঁহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।

উপনিষদের ভাষা নূতন মূর্তি ধারণ করিল—উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, উহা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অর্ধ পথে গিয়াই ক্ষান্ত হইয়া তোমাকে কেবল এক ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস দেখাইয়া দেয়, তথাপি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকে না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে?—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুহোঽয়মগ্নিঃ।১২ সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই বিদ্যুৎও সেই স্থানকে আলোকিত করিতে পারে না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি?

পৃথিবীর সমগ্র দার্শনিক ভাবের পূর্ণতর চিত্র আর কোথায় পাইবে? হিন্দুজাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির মুক্তির সামগ্রিক কল্পনার সারাংশ যেমন অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, যেমন অপূর্ব রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, তেমন আর কোথায় পাইবে?

‘দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি || ’ ১৩

একই বৃক্ষের উপর সুন্দরপক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী রহিয়াছে—উভয়েই পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন; তন্মধ্যে একটি সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটি না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্নশাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখনও মিষ্ট কখনও-বা কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে এবং সেই কারণে কখনও সুখী, কখনও-বা দুঃখী হইতেছে; কিন্তু উপরের শাখার পক্ষীটি স্থির গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট—সে ভালমন্দ কোন ফলই খাইতেছে না, সে সুখ-দুঃখ উভয়েই উদাসীন—নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া আছে। এই পক্ষিদ্বয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মানবাত্মার ইহাই যথার্থ চিত্র। মানুষ ইহজীবনের স্বাদু ও কটুফল ভোজন করিতেছে—সে কাঞ্চনের অন্বেষণে মত্ত—সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবমান, সংসারের ক্ষণিক বৃথা সুখের জন্য মরিয়া হইয়া পাগলের মত ছুটিতেছে।

অন্য আর এক স্থলে উপনিষদ্ সারথি ও তাহার অসংযত দুষ্ট অশ্বের সহিত মানবের এই ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণের তুলনা করিয়াছেন।১৪ মানুষ এইরূপে জীবনের বৃথা সুখানুসন্ধান-চেষ্টায় ছুটিতেছে। জীবনের ঊষাকালে মানুষ কত সোনার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারে, সেগুলি স্বপ্নমাত্র—বার্ধক্যে সে তাহার অতীত কর্মসমূহেরই রোমন্থন করিতে থাকে, পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, কিন্তু কিসে এই ঘোর সংসারজাল হইতে বাহির হইবে, তাহার কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। ইহাই মানুষের নিয়তি। কিন্তু সকল মানুষেরই জীবনে সময়ে সময়ে এমন শুভ মুহূর্ত আসিয়া থাকে—গভীরতম শোকে, এমন কি গভীরতম আনন্দের মধ্যেও মানুষের এমন শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সেই সূর্যালোক-অবরোধকারী মেঘের খানিকটা যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া যায়। তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য সেই সর্বাতীত সত্তার চকিত দর্শন লাভ করি; দূরে, দূরে—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের বহু দূরে—এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ ও সুখদুঃখ হইতে অনেক দূরে—দূরে, দূরে—প্রকৃতির পরপারে—ইহলোকে বা পরলোকে আমরা যে সুখভোগের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হইতে বহু দূরে, বিত্তৈষণা লোকৈষণা প্রজৈষণা হইতে বহু দূরে—মানুষ ক্ষণিকের জন্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে, সে তখন বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত অপর পক্ষীটির শান্ত ও মহিমময় রূপ অবলোকন করে;

সে দেখে—ঐ পক্ষীটি স্বাদু কটু কোন ফল ভক্ষণ করিতেছে না—নিজ মহিমায় নিজে বিভোর, আত্মতৃপ্ত—যেমন গীতায় উক্ত হইয়াছেঃ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ‖

যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার আর কোন কার্য অবশিষ্ট থাকে না। তিনি আর কেন বৃথা কার্য করিয়া সময় কাটাইবেন?

একবার চকিতভাবে দর্শন করিয়া মানুষ আবার ভুলিয়া যায়, আবার সংসারবৃক্ষে স্বাদু ও তিক্ত ফল ভোজন করিতে থাকে—তখন আর তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না। আবার হয়তো কিছুদিন পরে সে আর একবার পূর্বের ন্যায় চকিত দর্শন লাভ করে এবং যতই আঘাত পায়, ততই সেই নিম্নশাখাস্থিত পক্ষী উপরের পক্ষীর নিকটবর্তী হইতে থাকে। যদি সৌভাগ্যক্রমে সে ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পায়, তবে সে তাহার সঙ্গী—তাহার প্রাণ—তাহার সখা সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবর্তী হইতে থাকে। আর যতই সে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, ততই দেখে উপরের সেই পক্ষীর দেহজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুর্দিকে খেলা করিতেছে; যতই সমীপবর্তী হয়, ততই তাহার রূপান্তর হইতে থাকে। ক্রমশঃ যতই সে নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে, ততই দেখে—সে যেন মিলাইয়া যাইতেছে; অবশেষে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে—তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না, পত্ররাশির ভিতর সঞ্চরণশীল পক্ষীটি শান্ত গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট অপর পক্ষীর প্রতিবিম্বমাত্র। তখন সে জানিতে পারে—সে নিজেই ঐ উপরের পক্ষী, সে সর্বদাই শান্তভাবে অবস্থিত ছিল; ঐ মহিমা তাহারই। তখন আর কোন ভয় থাকে না, তখন সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া ধীর শান্তভাবে অবস্থান করে। এই রূপকের মাধ্যমে উপনিষদ্ তোমাদিগকে দ্বৈতভাব হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত অদ্বৈতভাবে লইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের এই অপূর্ব কবিত্ব, মহত্ত্বের চিত্র, মহোচ্চ ভাবসমূহ দেখাইবার জন্য শত শত উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বক্তৃতায় আমাদের আর সময় নাই। তবে আর একটি কথা বলিব, উপনিষদের ভাষা, ভাব—সব-কিছুরই ভিতর কোন জটিলতা নাই, উহার প্রত্যেকটি কথাই তরবারি-ফলকের মত, হাতুড়ির ঘায়ের মত সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেকটি সুরের একটা শক্তি আছে, প্রত্যেকটি তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয়। কোন ঘোরফের নাই, একটিও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটিও জটিল বাক্য নাই যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক-বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ভাবটিকে ক্রমাগত জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টি একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল, তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না—উপনিষদে এ-ধরনের চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যে-জাতি তখনও তাহার জাতীয় তেজবীর্য একবিন্দুও হারায় নাই। প্রতি পৃষ্ঠা ইহা আমাদিগকে তেজবীর্জের কথা বলিয়া থাকে।

এই বিষযটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, সমগ্র জীবনে আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপনিষদ্ বলিতেছেন—হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য হও।

আমার মনে সুদূর অতীতের সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে। আমি যেন দেখিতেছি—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া

অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন; সম্রাট্ সন্ন্যাসীর অপূর্ব জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ-মানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া গ্রীসে যাইতে অস্বীকার করিলেন; তখন সম্রাট্ নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিযা বলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ কথা বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বল নাই। আমাকে কে বধ করিতে পারে? ঐহিকজগতের সম্রাট্, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অব্যয়। আমি কখনও জন্মাই নাই, কখনও মরিবও না! আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ! তুমি শিশু, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য।

হে বন্ধুগণ, হে স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই উপনিষদ্ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের জন্য অশ্রুবিসর্জন করিয়া থাকি; কারণ উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই। শক্তি আমাদের বিশেষ আবশ্যক। কে আমাদিগকে শক্তি দিবে? আমাদিগকে দুর্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্পও যথেষ্ট আছে। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যেগুলি পৃথিবীর গ্রন্থাগারসমূহের তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ করিতে পারে—এ-সকলই আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে দুর্বল করিতে পারে, তাহাও বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। বোধ হয় যেন বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—কিভাবে দুর্বল হইতে দুর্বলতর হওয়া যায়। অবশেষে আমরা কেঁচোর মত হইয়া পড়িয়াছি—এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগকে পদদলিত করিতেছে। বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমার শোণিতের সম্বন্ধ, তোমাদের জীবনে মরণে আমার জীবনমরণ। তাই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের প্রয়োজন—শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্‌সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার

দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। উহা সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতকে উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিকমুক্তি বা স্বাধীনতা—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহা পরিত্রাণের (salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।

আর উপনিষদ্ দেখাইয়া দেন যে, ঐ মুক্তি তোমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মতটি উপনিষদের আর এক বিশেষত্ব। তুমি দ্বৈতবাদী, তা হউক; কিন্তু তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি কাজের দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র। আধুনিক পরিণামবাদীরা (Evolutionists) যাহাকে ক্রমবিকাশ (Evolution) ও পূর্বানুকৃতি (Atavism) বলিয়া থাকেন, রামানুজের সঙ্কোচ-বিকাশের মতও ঠিক সেইরূপ। আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পূর্ণতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যেন সঙ্কোচপ্রাপ্ত হন, তাঁহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাব ধারণ করে; সৎকর্ম ও সৎচিন্তা দ্বারা উহা পুনরায় বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহার স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রভেদ এইটুকু যে, অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করেন, আত্মার নয়। মনে কর, একটি যবনিকা রহিয়াছে, আর ঐ যবনিকাটিতে একটি ছোট ছিদ্র আছে। আমি ঐ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই মহতী জনতাকে দেখিতেছি। প্রথমে কেবল কয়েকটি মুখ দেখিতে পাইব। মনে কর, ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ছিদ্রটি যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমি এই সমবেত জনতার অধিকতর অংশ দেখিতে পাইব। বড় হইতে হইতে শেষে ছিদ্রটি যবনিকার সমান হইয়া যাইবে। তখন তোমাদের ও আমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। এস্থলে তোমাদের বা আমার কোন পরিবর্তন হয় নাই; যাহা কিছু পরিবর্তন কেবল যবনিকাতেই ঘটিয়াছে। তোমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একরূপই ছিলে, কেবল যবনিকাটির পরিবর্তন হইল। পরিণাম সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর মতঃ প্রকৃতির পরিণাম ও অন্তরাত্মার প্রকাশ। আত্মা কোনরূপে সঙ্কুচিত হইতে পারে না, ইহা অপরিণামী ও অনন্ত। আত্মা যেন মায়ারূপ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছিল—যতই এই মায়ার আবরণ

ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, ততই আত্মা সহজাত স্বাভাবিক মহিমায় প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশ অধিকতর অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

ভারতের নিকট এই মহান্ তত্ত্বটি শিখিবার জন্য পৃথিবীর লোক অপেক্ষা করিতেছে; তাহারা যাহাই বলুক, যতই নিজেদের গরিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করুক, ক্রমশঃ যতই দিন যাইবে তাহারা বুঝিবে, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া কোন সমাজই টিকিতে পারে না। তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না পূর্বে সব-কিছুকে স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া মনে করিবার রীতি ছিল, কিন্তু এখন সব-কিছু ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে? কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মাদের চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্যন্ত প্রাচীন নিয়ম ছিল—সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া। আধুনিক নিয়ম কি? আধুনিক বিধান বলে—শরীর স্বভাবতই সুস্থ, নিজ প্রকৃতিবশে উহা ব্যাধির উপশম করিযা থাকে। ঔষধ বড়জোর শরীরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে, তাহা সঞ্চয় করিতে সাহায্য করে। অপরাধী সম্বন্ধে এই নববিধান কি বলে? নূতন বিধান স্বীকার করিয়া থাকে—কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তাহার মধ্যে যে-দেবত্ব আছে, তাহার কখনও পরিবর্তন হয় না; সুতরাং অপরাধিগণের প্রতি আমাদের তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত। এখন পূর্বের ভাব সব বদলাইয়া যাইতেছে। এখন কারাগারকে অনেক স্থলে 'সংশোধনাগার' বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব আছে—এই ভারতীয় ভাবটি ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে। আর কেবল তোমাদের শাস্ত্রেই ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে; অন্যান্য জাতিকে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্তন আসিবে, আর কেবল দোষ প্রদর্শনরূপ পুরাতন ভাবটি লোপ পাইবে। এই শতাব্দীর মধ্যেই ঐ ভাবগুলি চরম আঘাত পাইবে। এখন লোকে আমার সমালোচনা করিতে পারে। 'জগতে পাপ নাই'—আমি নাকি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি; জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকে আমাকে এজন্য গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এখন যাহারা আমায় গালি দিতেছে, তাহাদেরই বংশধরগণ আমাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিবে যে—আমি

অধর্ম প্রচার করি নাই, ধর্মই প্রচার করিয়াছি। অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার না করিয়া জ্ঞানালোকে বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।

আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর একটি মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব। অতি প্রাচীন কালে এক বস্তু ও আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য করা হইত, এখন অতি দ্রুত তাহা চলিয়া যাইতেছে। তড়িৎ ও বাষ্প-শক্তি জগতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ আমরা হিন্দুগণ এখন আর আমাদের দেশ ছাড়া অন্য সব দেশকে কেবল ভূত-প্রেত ও রাক্ষস-পিশাচে পূর্ণ বলি না, এবং খ্রীষ্টান দেশের লোকেরাও বলেন না যে, ভারতে কেবল নরমাংসভোজী ও অসভ্য মানুষের বাস।

আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন অবস্থায় প্রয়োগ করি না কেন, দেখা যায়, ঐ তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। অজ্ঞতাবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই। যখনই আমরা পরস্পরকে ঠিকমত জানিতে পারি, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, হইবেই তো—কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের একত্ব-ভাব স্বভাবতই আসিয়া থাকে।

রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বিপুলায়তন হইতেছে, বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্ব-ভাব বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

বিজ্ঞানেও জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উদার ভাব এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে—সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড় সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাক; তুমি আমি, চন্দ্র সূর্য, এমন কি আর যাহা কিছু—সবই এই মহান্ সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত আর চৈতন্যদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল অপরিণামী অখণ্ড সত্তা—অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। নৈতিক আদর্শের জন্যও জগৎ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে—তাহাও আমাদের গ্রন্থে রহিয়াছে। নীতিতত্ত্বের ভিত্তি সম্বন্ধেও জগৎ জানিতে উৎসুক, তাহাও আমাদের শাস্ত্র হইতেই পাইবে।

ভারতে—আমাদের কি প্রয়োজন? বৈদেশিকগণের যদি এই-সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের বিশগুণ প্রয়োজন আছে। কারণ আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি—শত শত শতাব্দী যাবৎ এই লইয়া বিবাদ করিতেছি—তিলক ধারণ এইভাবে করিতে হইবে কি ঐভাবে। কোন মানুষের দৃষ্টিতে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কিনা—এই ধরনের গুরুতর সমস্যার উপর বড় বড় বই লিখিতেছি। যে-জাতির মস্তিস্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, সে-জাতির নিকট হইতে বড় রকমের একটা কিছু আশা করা যায় না, এরূপ আচরণে আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখনও কখনও লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি তাহা করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক কিছু, কিন্তু কাজে পরিণত করি না। এইরূপে তোতাপাখির মত কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—

আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিস্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। অনেক সময় লোকে আমার অদ্বৈতমত-প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এখন কেবল আবশ্যকঃ আত্মার এই অপূর্ব তত্ত্ব—অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধতা ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে শুনাইতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা অবশ্যই পুরাণে রানী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। এই উপাখ্যানের মধ্যে মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। ইংরেজ 'পাপ, পাপী' ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে; বাস্তবিক যদি সকল

ইংরেজ নিজেদের পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে এ-কথা বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে—সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে; সে নিজের মহত্ত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে—সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে সূর্যালোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে। যদি সে ধর্মযাজকদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিত—সে ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাপী মাত্র, অনন্ত কাল ধরিয়া তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ তাহাকে যেরূপ দেখিতেছ, সে কখনও সেরূপ হইত না। এইরূপে আমি প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতেরা যাহাই বলুক এবং তাহারা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মভাব কখনও বিলুপ্ত হয় না, উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি। তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?– আমরা ইংরেজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, হাজারগুণ কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরেজ নরনারী যখন আমাদের ধর্মতত্ত্ব একটু-আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহাতে মাতিয়া উঠে, আর যদিও তাহারা রাজার জাতি, তথাপি স্বদেশের লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ করিতে পার? কথাটি একবার ভাবিয়া দেখ। আর কেন তোমরা ইহা করিতে পার না কেন?তোমরা কি জান না বলিয়া যে করিতে পার না—তাহা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিতে পার না। যতটা জানিলে তোমাদের পক্ষে কল্যাণ, তোমরা তাহা অপেক্ষা বেশী জান—ইহাই তোমাদের মুশকিল। তোমাদের রক্ত পাতলা, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিলতাপূর্ণ ও অসাড়, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরের এ অবস্থা পরিবর্তন করিতে হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নয়। গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাজের সময় আর তোমাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; আর 'সংস্কার' নামটা পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার কারণ কি? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কমতি আছে? জ্ঞানের কমতি কোথায়? তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্বল, অতি দুর্বল—তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শতাব্দী যাবৎ অভিজাত সম্প্রদায়, রাজা ও বৈদেশিকরা অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদেরই স্বজনবর্গ তোমাদের সব শক্তি হরণ করিয়াছে। তোমরা এখন পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের মত হইয়াছ। কে আমাদিগকে এখন বল দিবে? আমি বলিতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য।

এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, আমি সর্বশক্তিমান্, আমি সর্বজ্ঞ।' অতএব এই আশাপ্রদ মুক্তিপ্রদ বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ কর; বলিও না—আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। আত্মায় বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার মত বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমার ইচ্ছা—তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক, তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ- আলোড়নকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্বপ্রকার অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও; আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তি লাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এ সবই উপনিষদে রহিয়াছে।

এ যে শুধু সন্ন্যাসীর জন্য ছিল, এ যে রহস্য-বিদ্যা! প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চা করিতেন! শঙ্কর একটু সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখনও যায় নাই যে, উপনিষদে কেবল সন্ন্যাসীদের

আরণ্যক জীবনের কথাই আছে। আমি তোমাদিগকে সেদিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা—একমাত্র প্রামাণিক টীকা 'গীতা'— চিরকালের মত রচিত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকা-টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপবিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে-কাজই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎসজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যায়নাগারে—সর্বত্র এই-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—সে যে-কাজই করুক না কেন, সে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

আর ভয়ের কোন কারণ নাই। উপনিষদ্-নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালা প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; অনন্ত পথ আছে—ধর্ম অনন্ত, ধর্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহই যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি ইত্তম। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অতি সামান্য কর্মও অদ্ভুত ফল দিয়া থাকে; অতএব যে যতটুকু পারে করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র।

আর ইহার ফল হইবে এই যে, জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু,

তুমি বেদপাঠে পটু! তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে। জাতবিভাগ ভাল জিনিষ। জীবনসমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। লোকে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—তুমি যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎসজীবী; কিন্তু তোমার ভিতর যে-ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতর সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এ কথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি এই নারীর বা ঐ ছেলেটির মুক্তির জন্য সাধনা করিয়া দিব, তবে সেটি অতি অন্যায়, অত্যন্ত ভুল কথা। আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'আপনি বিধবাদিগের ও নারীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি চিন্তা করেন?' এ প্রশ্নের আমি শেষ বারের মত উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছে? আমি কি নারী যে, আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? তুমি কি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক নারীর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর? তফাত হও! তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে। কি আপদ! যথেচ্ছাচারী তোমরা ভাবিতেছ—সকলের জন্য সব করিতে পার! তফাত! ভগবান্ সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করিতেছ?

হে নাস্তিকগণ, তোমরা ঈশ্বরের উপর কর্তৃত্ব করিতে সাহস কর কিসে? কারণ তোমরা কি জান না, প্রত্যেকটি আত্মাই পরমাত্মস্বরূপ? নিজেদের চরকায় তেল দাও, তোমাদের

ঘাড়ে এক বোঝা কর্ম রহিয়াছে। হে নাস্তিকগণ, সমগ্র জাতি তোমাদিগকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, সমাজ তোমাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, মূর্খেরা তোমাদের সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নন; ইহলোকে বা পরলোকে নিশ্চয়ই তোমাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইবে।

প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তোমরা কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদের, যদি সৌভাগ্য হয় তবে স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে ধন্য হইবে। নিজেদের খুব বড় কিছু ভাবিও না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনাবোধে ঐটুকু কর। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখি, নিজ মুক্তির জন্য তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের পূজা করিব—ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। কতকগুলি লোক যে দুঃখ পাইতেছে, তাহা তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে, কারণ তোমার আমার জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই-সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পার—এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়িতে থাকে, তোমরাও সেইভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক—আলোক লইয়া আইস। প্রত্যেকে যেন জ্ঞানের আলো পায়; যতদিন না সকলেই ভগবান্ লিভ করে, ততদিন যেন তোমাদের কাজ শেষ না হয়। দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরও অধিক আলোক লইয়া যাও, কারণ দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোক প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া যাও, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরও অধিক আলোক

লইয়া যাও, কারণ আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল। এইভাবে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু প্রভুই করিবেন, কারণ ভগবানই বলিয়াছেনঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে; তুমি এমনভাবে কর্ম করিও না, যাহাতে তোমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়; অথচ কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে এমন মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করিবার শক্তি দান করেন।

# ১৩. ভারতীয় মহাপুরুষগণ

[মান্দ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা]

ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই প্রাচীনকালের কথা উদিত হইতেছে, ইতিহাস যে-কালের কোন ঘটনার উল্লেখ করে না এবং ঐতিহ্য যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার হইতে রহস্য-উদ্‌ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—বাস্তবিক হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ অসংখ্য মহাপুরুষের জন্ম দেওয়া ব্যতীত আর কি করিয়াছে? সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যুগপ্রবর্তক শ্রেষ্ঠ আচার্যের কথা অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব।

প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিদ সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমটি সনাতন সত্য; দ্বিতীয়টি প্রথমোক্তের ন্যায় ততদূর প্রামাণিক না হইলেও বিশেষ দেশকালপাত্রে প্রযোজ্য। সনাতন সত্য –জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য—স্মৃতি, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় এবং পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র-বিধান। তাৎপর্য এই যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাঁহার চরমলক্ষ্য-বিষয়ক মুখ্য তত্ত্বসমূহের বিশদ বর্ণনা আছে, কেবল গৌণ বিষয়গুলি—যেগুলি উহাদের বিস্তার, সেগুলিই বিশেষভাবে বর্ণনা করা স্মৃতি ও পুরাণের কার্য। সাধারণভাবে উপদেশ দিতে শ্রুতিই পর্যাপ্ত; ধর্মজীবন-যাপনের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিনির্দিষ্ট উপদেশের বেশী আর কিছু বলা যাইতে পারে না, আর কিছু জানিবারও নাই। এ-বিষয় যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্য যে-সকল উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে সেগুলি সবই কথিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই; স্মৃতি বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দিয়া

গিয়াছেন। শ্রুতির আর একটি বিশেষত্ব আছে। যে-সকল ঋষি শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী, তবে কয়েকজন নারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যথা তাঁহাদের জন্মের সন-তারিখ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা—তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া বলিলেই ভাল হয়—আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যরূপে বেদে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী ও কার্যকলাপই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঙ্গিতমাত্রে সমগ্র জগতকে নাড়া দিতে পারেন, এমন অদ্ভুত মহাশক্তিশালী মনোহরচরিত্র মহাপুরুষগণের পরিচয় পুরাণ বা স্মৃতিতেই আমরা সর্বপ্রথম পাইয়া থাকি—তাঁহাদের চরিত্র এত উন্নত যে, তাঁহাদের উপদেশাবলীও যেন উহার নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের ধর্মে যে-ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। উহাতে ব্যক্তিভাবরহিত অনন্ত সনাতন তত্ত্বসমূহের সঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তিভাবাপন্ন অবতারের কথা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধর্মের মূল—উহাতে কেবল সনাতন তত্ত্বের উপদেশ; বড় বড় অবতার, আচার্য ও মহাপুরুষগণের বিষয় সবই স্মৃতি ও পুরাণে রহিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্মই কোন বিশেষ ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের, মুসলমানধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঐ-সকল ধর্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। যদি কখনও এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ববিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্বল হয়, তবে তাঁহাদের ধর্মরূপ অট্টালিকা ধসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা এই বিপদ এড়াইয়াছি। কোন মহাপুরুষ, এমন কি, কোন

অবতার বলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই যে তোমরা ধর্ম মানিয়া চল, তাহা নহে। কৃষ্ণের কথায় বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদানুগত বলিয়াই কৃষ্ণবাক্যের প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের যত প্রচারক হইয়াছেন, তাঁহাদার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা গোড়াতেই এ-কথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সবই বেদে কথিত হইয়াছে; নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে না। তোমরা কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশী অগ্রসর হইতে পার না। বেদ অনেক দিন পূর্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল; এই 'তত্ত্বমসি' বেদে রহিয়াছে। বাকী রহিল কেবল বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে সময়ে সময়ে লোকশিক্ষা। এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা—ইহাই বাকী রহিল; সেইজন্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বজনবিদিত বাণীতে এই তত্ত্বটি যেমন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, আর কোথাও তেমন হয় নাইঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত |
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ||

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুভাব রক্ষা করিবার জন্য আমি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া থাকি; দুর্নীতি বিনষ্ট করিবার জন্য আমি সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকি, ইত্যাদি।—ইহাই ভারতীয় ধারণা।

ইহা হইতে কি পাওয়া যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, একদিকে সনাতন তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, ঐগুলি স্বতঃপ্রমাণ,—কোনরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করে না, ঋষিগণ—যত বড়ই হউন বা অবতারগণ যত মহিমাসম্পন্নই হউন—তাঁহাদের বাক্যের উপরও ঐগুলি নির্ভর করে না। আমরা এখানে এ-কথা বলিতে পারি যে, ভারতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা বেদান্তকেই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম বলিয়া দাবী করিতে পারি, বেদান্তই জগতের

একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না, উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম সমগ্র মানবজাতি কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশেই আমরা দেখিতে পাই, এখানে কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! একটা ক্ষুদ্র শহরেই দেখিতে পাই, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মহাপুরুষকে নিজেদের আদর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং মহম্মদ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট—এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিভাবে সমগ্র জগতের একমাত্র আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন? অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্যপ্রমাণেই বা সমগ্র নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ধর্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? বৈদান্তিক ধর্মে এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই ইহার প্রমাণ; ইহার নীতিতত্ত্ব মানবজাতির সনাতন আধ্যাত্মিক একত্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাভ করিবার নয়, উহা পূর্ব হইতেই লব্ধ।

অন্যদিকে আবার আমাদের ঋষিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। লোকের কোন না কোন আকারে একটি ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর চাই। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকেই 'ঈশ্বর' করিয়া তুলিল। ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। আমরা জানি, ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা অপেক্ষা—অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য—মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর অপেক্ষা—আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু অপেক্ষা অর্থাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর পূজ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ—জীবন্ত আদর্শ। সেই জন্যই সর্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহারা

চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আমাদের ঋষিগণ ইহা জানিতেন, সেইজন্য তাঁহারা সকল ভারতবাসীর জন্য এই মহাপুরুষ-উপাসনার—এই অবতার-পূজার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেনঃ

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা |
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ || ১৫

মানুষের মধ্যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয়, জানিও আমি সেখানে বর্তমান; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল অবতারকে উপাসনা করিবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু যে-কোন দেশের যে-কোন সাধু-মহাত্মার পূজা করিতে পারে। কার্যতও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খ্রীষ্টানদের চার্চে ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এভাবে উপাসনা করিব না? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম সার্বভৌম। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে সর্বপ্রকার আদর্শকেই উহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারে; জগতে যতপ্রকার ধর্মের আদর্শ আছে, সেগুলিকে এখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর ভবিষ্যতে যে-সকল বিভিন্ন আদর্শ আসিবে, সেগুলির জন্য আমরা ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে পারি। ঐগুলিকে ঐভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, বৈদান্তিক ধর্মই তাহার অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া সবগুলিকে আলিঙ্গন করিয়া লইবে।

ঈশ্বরাবতার-সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই। দ্বিতীয় শ্রেণীর আর এক প্রকার মহাপুরুষ আছেন; বেদে 'ঋষি' শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর আজকাল ইহা একটি চলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে,—ঋষিবাক্যের বিশেষ প্রামাণ্য। আমাদিগকে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি কোন তত্ত্ব 'দর্শন' করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলঃ ধর্মের

প্রমাণ কি? বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না—ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেনঃ ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’১৬—মনের সহিত বাক্যও যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। ‘ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ॥১৭—সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে।

শত শত যুগ ধরিয়া ইহাই ঋষিদের ঘোষণা। বাহ্য প্রকৃতি আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত জীবন, মানবের চরম লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্বদা পরিণাম হইতেছে, সর্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা সসীম, উহা যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাঙিয়া চুরিয়া যায়। উহা কিরূপে সেই অনন্ত অপরিবর্তনীয় অখণ্ড অবিভাজ্য সনাতন বস্তুর সংবাদ দিবে?—কখনই দিতে পারে না। আর যখনই মানবজাতি চৈতন্যহীন জড়বস্তু হইতে এই-সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাসই জানে—তাহার ফল কতখানি অশুভ হইয়াছে। তবে ঐ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানলাভ হয়,—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না। ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কি মানুষের সর্বস্ব? কে ইহা বলিতে সাহস করে? আমাদের জীবনে—আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে, হয়তো আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হইল বা আমরা অন্য কোনরূপে আঘাত পাইলাম, অথবা অতিশয় আনন্দের কিছু ঘটিল; এই-সব অবস্থায় সময়ে সময়ে মন যেন একেবারে স্থির হইয়া যায়। অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে, মনটা শান্ত হইয়া যায়, বহির্জগতে অনাসক্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে, ক্ষণকালের জন্য অনন্তের একটু আভাস তখন আমাদের চোখে প্রকাশিত হয়; মন বা বাক্য—কিছুই সেখানে যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে; অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থাকে প্রগাঢ়, স্থায়ী, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত করিতে হইবে। মানুষ শত শত যুগ পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছে—আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বদ্ধ বা সীমিত নহে, এমন কি চেতনা দ্বারাও নহে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, চেতনা সেই অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম মাত্র। চেতনা সত্তার সহিত অভিন্ন নহে, উহা সত্তার একটি অংশ মাত্র। ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য

লাভ করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতে সমর্থ। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে, কারণ ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটিকে আমি যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিয়া থাকি, বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত। টেবিলটিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ জীবাত্মার অতিচেতন অবস্থায় প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। এই ঋষিত্ব-লাভ দেশ-কাল-লিঙ্গ বা জাতিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছেন যে, এই ঋষিত্ব বংশধরগণের, আর্য-অনার্য—এমন কি ম্লেচ্ছদেরও সাধারণ সম্পত্তি।

বেদের ঋষিত্ব বলিতে ইহাই বুঝায়; আমাদিগকে ভারতীয় ধর্মের এই আদর্শ সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে, জগতের অন্যান্য জাতিও এই আদর্শটি স্মরণ রাখিবেন, তাহা হইলেই বিভিন্ন ধর্মে বিবাদ-বিসংবাদ কমিয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠ করিলেই ধর্ম লাভ হয় না; বা মতমতান্তর ও বচন দ্বারা, এমন কি যুক্তিতর্ক-বিচার দ্বারাও ধর্মলাভ হয় না। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে—ঋষি হইতে হইবে। বন্ধুগণ, যতদিন না তোমাদের প্রত্যেকেই ঋষি হইতেছ, যতদিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষাৎ করিতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভ হয় নাই, জানিবে। যতদিন না অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায়, ততদিন তোমাদের পক্ষে ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র, ততদিন কেবল ধর্মলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, ততদিন পরোক্ষ বিবরণ দিতেছ মাত্র।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ব্রাহ্মণের তর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা করিতে আসেন। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘ আপনি কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন?’ ব্রাহ্মণ বলিলেন, ‘না, দেখি নাই।’ বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনার পিতা?’ ‘না, তিনিও দেখেন নাই।’ ‘আপনার পিতামহ?’ ‘বোধ হয়, তিনিও দেখেন নাই।’ তখন বুদ্ধ বলিলেন, ‘বন্ধু, আপনার পিতৃ-

পিতামহগণও যাঁহাকে দেখেন নাই, এমন পুরুষ সম্বন্ধে আপনি কিরূপে বিচার দ্বারা অন্যকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?' পৃথিবীর সকলে এইরূপই করিতেছে। বেদান্তের ভাষায় আমাদিগকেও বলিতে হইবেঃ 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'১৮ বাগাড়ম্বর দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয়।

পৃথিবীর সকল জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বেদের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবেঃ তোমাদের বাদ-বিসংবাদ বৃথা; তোমরা যে-ঈশ্বরকে প্রচার করিতে চাও, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বৃথাই তোমার প্রচার; তুমি কি বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না; আর যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাক, তবে তুমি আর বিবাদ করিবে না, তোমার মুখই উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে।

এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। সে যখন ফিরিল, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শিখিয়াছ?' পুত্র বলিল, সে নানা বিদ্যা শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, 'কিছুই শেখ নাই; আবার গুরুগৃহে যাও।' পুত্র আবার গুরুগৃহে গেল; ফিরিয়া আসিলে পিতা পূর্ববৎ প্রশ্ন করিলেন। পুত্রও পূর্ববৎ উত্তর দিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে যাইতে হইল। এবার যখন সে ফিরিল, তখন তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া গিয়াছে। তখন পিতা বলিলেন,১৯ 'বৎস, আজ তোমার মুখমণ্ডল ব্রহ্মবিদের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' যখন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখ, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার সমগ্র আকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি মানবজাতির নিকট মহাকল্যাণস্বরূপ হইবে, কেহই তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না। ইহাই ঋষিত্ব এবং ইহাই আমাদের ধর্মের আদর্শ। অবশিষ্ট যাহা কিছু—পরস্পর কথাবার্তা, যুক্তি-বিচার, দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি বেদ পর্যন্ত—এই ঋষিত্বলাভের প্রস্তুতি মাত্র, ও-গুলি গৌণ। ঋষিত্বলাভই মুখ্য। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি—সবই গৌণ। 'তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা আমরা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারি।' যাঁহারা এই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক ঋষি। ঋষি-অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ-

অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। যথার্থ হিন্দু হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের কোন এক অবস্থায় এই ঋষিত্বলাভ করিতে হইবে, আর ঋষিত্বলাভই হিন্দুর নিকট মুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহস্র সহস্র মন্দির দর্শন বা পৃথিবীতে যত নদী আছে সবগুলিতে স্নান করিলে হিন্দুমতে মুক্তি হইবে না। ঋষি হইলে—মন্ত্রদ্রষ্টা হইলে তবেই মুক্তিলাভ হইবে।

পরবর্তী সময়ের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তখন সমগ্র জগৎ-আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ—শ্রেষ্ঠ অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবতারের সংখ্যা অনেক। ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ—সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই মহাকবি যে-ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শুদ্ধ, মধুর, অথচ সহজ সরল ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়তো কয়েকটি হইয়াছেন, কিন্তু সীতা আর হন নাই। ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শস্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং

উহার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

অতঃপর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী—সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'২০—অন্যান্য অবতার সেই পুরুষের অংশ ও কলামাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন তাঁহার প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ করি না। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন—তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; যিনি সমগ্র ভারতের নেতা—যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। বাল্যকালে যিনি সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই প্রেমের অপূর্ব বিকাশের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; প্রেমমদিরা-পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কে গোপীদের প্রেম-জনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে। আমরা জানি, মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে পারে না। আমরা ইহাও জানি, দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরে—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশ, সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়—এমন বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানব-মনের সর্ব্বোচ্চ ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহাই সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা—যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেনঃ যদি একজন সগুণ, সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরককুণ্ড—সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। এই সমস্যার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না; তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান্—তাহাও তাহারা জানিতে চাহিত না। তাহারা কেবল বুঝিত—তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের

পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু সেনাবাহিনীর নেতা রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন।

‘ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ||’ ২১

হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না; হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম; আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, প্রলোভনের ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; নরকের ভীতি ও স্বর্গ-সুখের প্রলোভন সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম-রূপ আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এ প্রেমের মহিমা কি আর বলিব! এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। আমি আবার বলিতেছি, আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে শুধু এইটুকু বলিতে চাই—নিজের মন আগে শুদ্ধ কর; আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সেই চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব; উহা কেবল দোকানদারি—আমি তোমাকে কিছু দিতেছি, প্রভু, তুমি আমাকে কিছু দাও। আর ভগবান্‌ও বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি মরিলে পর তোমাকে দেখিয়া লইব, চিরকাল আমি তোমাকে দগ্ধ করিয়া মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এই-সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

‘সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ | ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ || ’ ২২

একবার, একবারমাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।

প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টাই করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চনযশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে চায় এবং উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে— আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণদর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মত দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা!

কৃষ্ণজীবনের ছোটখাটো খুঁটিনাটি লইয়া সময় নষ্ট করিও না; তাঁহার জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর। কৃষ্ণের জীবনচরিতে হয়তো অনেক ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য আছে, অনেক বিষয় হয়তো প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এ সবই সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে সমাজে যে-এক অপূর্ব নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার

অবশ্যই ভিত্তি ছিল। অন্য যে-কোন মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র; আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার নিজ দেশে, এমন কি সেই সময়ে যে-সকল ভাব প্রচলিত ছিল, শুধু সেগুলিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কিনা, সে-সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নহে—ইহা প্রমাণ কর দেখি। যদি না পার, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ তত্ত্বগুলি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ কৃষ্ণের আবির্ভাবকালে আকাশে বাতাসে ঐ তত্ত্ব ভাসিতেছিল বলিয়া জানা যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস ঐ তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা জানিতে পারিবে প্রেম কি বস্তু! যখন তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের অন্য সব চিন্তা লুপ্ত হইবে, যখন তোমরা শুদ্ধচিত্ত হইবে, যখন তোমাদের আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি সত্যানুসন্ধানস্পৃহা পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম লাভ করিলে, তখন সব পাইলে।

এইবার আমরা একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়—সেটা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম! সাহেবেরাও ইহা বড় পচ্ছন্দ করে না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটা বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও! সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া? টিকিতেই

পারেন না! মহাভারতে দু-একটি গুরুত্বহীন স্থানে ছাড়া অন্য কোথাও গোপীদের কোন উল্লেখই নাই! যথা—দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবন কথা আছে মাত্র!

এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত! সাহেবেরা যাহা না চায়, সব উড়াইয়া দিতে হইবে! গোপীদের কথা, এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত! যে-সকল ব্যক্তি এইরূপ ঘোরতর বণিক্‌মনোভাবাপন্ন, যাহাদের ধর্মের আদর্শ পর্যন্ত ব্যবসাদারি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মনোভাব এই যে, তাহারা ইহলোকে কিছু করিয়া স্বর্গে যাইবে। ব্যবসাদার চক্রবৃদ্ধি-হারে সুদ চাহিয়া থাকে, তাহারা এখানে এমন কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যাইতে চায়, যাহার ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিবে! ইহাদের ধর্মপ্রণালীতে অবশ্য গোপীদের স্থান নাই।

আমরা এখন সেই আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া আর একটু নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার মত বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান্ নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন—সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নহে। আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ—এমন কি গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও অনেক সময়ে ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আধুনিক ভাষ্যকারগণের লেখাতেই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; শ্রুতিতে অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া তাহা হইতে নিজের মনোমত অর্থ বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য এরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান্

বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য; জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতায় এইভাবে বেদের তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে, এমন কি কর্মকাণ্ড পর্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে, আর ইহা দেখান হইয়াছে যে, কর্মকাণ্ড—সাক্ষাৎভাবে না হইলেও গৌণভাবে মুক্তির সহায়, অতএব উহাও সত্য; মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, শুধু একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় এবং আমাদিগকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এই-সব বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে সেগুলির সৃষ্টি হইল কেন? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত—বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট ও দুষ্ট লোকে চালু করিয়াছে; তাহারা কিছু অর্থ-লালসায় এই-সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এ কথা একেবারে ভুল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে; ঐগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হয় নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনেই ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্যই ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই। যে-দিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সে-দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সঙ্গে সেগুলিও লোপ পাইবে, আর যতদিন প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই ঐগুলির বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই থাকিবে। তরবারি-বন্দুকের সাহায্যে পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমাপূজা থাকিবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান অবশ্যই থাকিবে, আর আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। গীতাতেই দূরাগত ধ্বনির মত সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ-কোলাহল আমাদের কানে আসে, আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ

মিটাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেছেন, ‘ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।’—যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতেই সব ওতপ্রোত রহিয়াছে।

আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দূরশ্রুত অস্ফুটধ্বনি তখন হইতেই শুনিতে পাই। সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ কিছুকাল মন্দীভূত হইয়া সমন্বয় ও শান্তি আসিয়াছিল; কিন্তু আবার বিরোধ বাধিল। শুধু ধর্মমত লইয়া নহে, সম্ভবতঃ জাতি লইয়া এ বিবাদ চলিয়াছিল; আমাদের সমাজের দুইটি প্রবল অঙ্গ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল; এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখিতে পাই। তিনি আর কেহ নহেন—আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, পৃথিবী এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজের শিষ্যরূপে নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। আবার সেই বাণী উচ্চারিত হইল, যাহা গীতায় শিক্ষা দিয়াছিলঃ স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—এই ধর্মের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ —স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রগণ পর্যন্ত পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গীতার বাক্যসমূহ—শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর মহতী বাণী সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরমপদলাভের অধিকার ঘোষণা করে।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ||

যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ |
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ||

পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না, আত্মহিংসাশূন্য হইয়া পরমগতি লাভ করেন।

গীতার এই উপদেশের জীবন্ত উদাহরণরূপে—উহার এক বিন্দুও অন্ততঃ যাহাতে কার্যে পরিণত হয় এইজন্য—সেই গীতা-উপদেষ্টাই অন্যরূপে আবার মর্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেজন্য ইনি দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণলোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইনি দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় রামের মত ইনি চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

তোমরা সকলেই তাঁহার মহান্ চরিত্র ও অদ্ভুত প্রচারকার্যের বিষয় অবগত আছ। কিন্তু এই প্রচারকার্যের মধ্যে একটা বিষম ত্রুটি ছিল, তাহার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা ভুগিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধের কোন দোষ নাই, তাঁহার চরিত্র পরম পবিত্র ও মহামহিমময়। দুঃখের বিষয়—বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ফলে যে-সকল বিভিন্ন অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহারা বুদ্ধদেব-প্রচারিত উচ্চ আদর্শগুলি ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না। এই-সকল জাতি তাহাদের নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনা-পদ্ধতিগুলি সঙ্গে লইয়া দলে দলে আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য বোধ হইল তাহারা যেন সভ্য হইয়াছে, কিন্তু এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের সর্প ভূত প্রভৃতির উপাসনা সমাজে চালাইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ লীলাক্ষেত্র হইয়া অত্যন্ত অবনত হইল। প্রথমে বৌদ্ধগণ প্রাণিহিংসা নিন্দা করিতে গিয়া বৈদিক যজ্ঞসমূহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে প্রত্যেক গৃহে এই-সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, গৃহকোণে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত থাকিত, ইহাই ছিল উপাসনার যা-কিছু সাজসজ্জা। বৌদ্ধদের প্রচারে এই যজ্ঞগুলি লোপ পাইল, তৎপরিবর্তে বিরাট বিরাট মন্দির, জাঁকালো অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদল এবং বর্তমানকালে ভারতে আর যাহা কিছু দেখিতেছ,

সেইগুলির আবির্ভাব হইল। বুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁহাদের আরও বেশী জ্ঞান থাকা উচিত ছিল, এমন কয়েকজন আধুনিক ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পৌত্তলিকতা ধ্বংস করেন। উহা পড়িয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তাঁহারা জানেন না যে, বৌদ্ধধর্মই ভারতে পৌরোহিত্য ও প্রতিমাপূজার সৃষ্টি করিয়াছিল।

দু-এক বৎসর পূর্বে একজন রুশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি যীশুখ্রীষ্টের একখানি অদ্ভুত জীবনচরিত পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি সেই পুস্তকখানির একস্থলে বলিতেছেন, খ্রীষ্ট ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্মশিক্ষার্থ জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ও মূর্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে তিব্বতের লামাদের নিকট ধর্মশিক্ষার্থ গমন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সিদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাঁহারা ভারতের ইতিহাস কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের নিকট পূর্বোক্ত বিবৃতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, পুস্তকখানি আগাগোড়া প্রতারণা। কারণ জগন্নাথ-মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ঐটিকে এবং অন্যান্য বৌদ্ধমন্দিরকে হিন্দুমন্দির করিয়া লইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার আমাদিগকে এখনও অনেক করিতে হইবে। ইহাই জগন্নাথ- মন্দিরের ইতিহাস, আর সে-সময়ে সেখানে একজনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তথাপি বলা হইতেছে—যীশুখ্রীষ্ট সেখানে ব্রাহ্মণদের নিকট উপদেশ লইবার জন্য আসিয়াছিলেন! আমাদের রুশীয় দিগ্‌গজ প্রত্নতাত্ত্বিক এই কথা বলিতেছেন!

পূর্বোক্ত কারণে বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রাণীতে দয়া, উহার উচ্চ নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মা আছে কি নাই—এই লইয়া চুলচেরা বিচারসত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎতা দেখা দিল, তাহা বর্ণনা করিবার সময় আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠান-পদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থরাজি—যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখনও বাহির হয় নাই বা মানবমস্তিষ্ক যাহা আর কখনও কল্পনা করে নাই; অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতিসমূহ, যেগুলি আর কখনও ধর্মের নামে চলে নাই—এ-সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি', তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। এবার তাঁহার আবির্ভাব হইল দাক্ষিণাত্যে। সেই ব্রাহ্মণযুবক, যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থের রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতের এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক! তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন পবিত্রভাবে লইয়া যাইতে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ—এই কার্য কত কঠিন ও কত বিরাট! সে-সময়ে ভারতের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু আভাস দিয়াছি। তোমরা যে-সকল বীভৎস আচারের সংস্কার করিতে অগ্রসর হইতেছ, সেগুলি সেই অধঃপতনের যুগ হইতে আসিয়াছে। তাতার বেলুচি প্রভৃতি দুর্দান্ত জাতিসকল ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং তাহাদের জাতীয় আচারগুলিও সঙ্গে লইয়া আসিল। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন অতি ভয়ানক পাশবিক আচারসমূহ দ্বারা কলুষিত হইল। উক্ত ব্রাহ্মণযুবক বৌদ্ধদের নিকট হইতে দায়স্বরূপ ইহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এই অবনত বৌদ্ধধর্ম হইতে বেদান্তের পুনর্বিজয় চলিতেছে, এখনও এ-কার্য চলিতেছে, এখনও উহা শেষ হয় নাই। মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে বুদ্ধদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরা পতিত হয় এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে—শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন; তখন বৌদ্ধেরা সকলেই তাহাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যে-সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; সেগুলির কি হইবে—ইহাই এক মহাসমস্যা হইল।

তখন মহানুভব রামানুজের অভ্যুদয় হইল। শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার হৃদয় মস্তিষ্কের অনুরূপ ছিল না। রামানুজের হৃদয় শঙ্করের হৃদয় অপেক্ষা উদার ছিল। পতিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি তাহাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব

করিতে লাগিলেন। কালে যে-সকল নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য সংস্কার করিলেন এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি, নূতন নূতন উপাসনাপ্রণালী সৃষ্টি করিয়া ঐগুলি যাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহাদিগকে সেগুলি উপদেশ দিতে লাগিলেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এইরূপে রামানুজের প্রচারকার্য চলিল। তাঁহার প্রচারের প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর্যাবর্তে ঐ তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেখানে কয়েকজন আচার্য ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা বহুদিন পরে—মুসলমান-শাসনকালে ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর্যাবর্তবাসী আচার্যগণের মধ্যে চৈতন্যই শ্রেষ্ঠ।

রামানুজের সময় হইতে ধর্মপ্রচারে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিও; তখন হইতে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। শঙ্করের পূর্ববর্তী আচার্যগণের যেমন ইহাই ছিল মূলমন্ত্র, রামানুজের পরবর্তী আচার্যগণেরও তাহাই হইল। শঙ্করকে কতকটা বর্জনশীল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাঁহার লিখিত গ্রন্থে এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী যেমন তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, তেমনি শঙ্করাচার্যের উপদেশাবলীর উপর যে সঙ্কীর্ণতার দোষ আরোপিত হয়, সম্ভবতঃ তাহাতে শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাঁহার শিষ্যদের বুঝিবার অক্ষমতার দরুনই এই দোষ শঙ্করে আরোপিত হইয়া থাকে।

আমি এখন এই উত্তরভারতের মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক অতি বিচারশীল পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনিও ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া তর্কে পণ্ডিতদের পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হন। বাল্যকাল হইতে তিনি শিখিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কোন মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল; তখন তিনি বাদানুবাদ, তর্ক-ন্যায়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীতে ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্যদের অন্যতম প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য।

তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্লাবিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল। তাঁহার প্রেমের কোন সীমা ছিল না। পুণ্যবান্ পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত—সকলেই তাঁহার ভালবাসার ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন; যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, যেমন কালপ্রভাবে সকলেরই অবনতি হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত—সমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাকে সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহেই আমরা অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাই। শঙ্করমতাবলম্বী কেহই এ কথা স্বীকার করেন না যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ আছে। এদিকে কিন্তু জাতি-ব্যাপারে শঙ্কর অত্যন্ত বর্জনের ভাব পোষণ করিতেন। জাতিভেদের প্রশ্নে আমরা প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যের উপদেশে অপূর্ব উদারতা দেখিতে পাই, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মত সঙ্কীর্ণ।

শঙ্করের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, রামানুজ ও চৈতন্যের ছিল বিশাল হৃদয়। এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, যাঁহার মধ্যে একাধারে এইরূপ হৃদয় ও মস্তিষ্ক থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের মহতী মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় এক মহৎ ভাবে—ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয়সাধন করিবে এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

এইরূপ এক ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইয়াছিল—প্রয়োজন হইয়াছিল; আর অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়, যে-শহর

পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল—ভারতের অন্যান্য শহর অপেক্ষা বেশী পরিমাণেই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না; মহামনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নাম পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সে অনেক কথা, আজ রাত্রে তোমাদিগের নিকট তাঁহার বিষয়ে কিছু বলিবার সময় নাই। সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামটুকু উল্লেখ করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতে হইবে—এই মহাপুরুষের উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ। ঐ ব্যক্তির ভিতর যে ঐশ্বরিক শক্তি খেলা করিত, সেটি লক্ষ্য করিও। ইনি দরিদ্রব্রাহ্মণ-সন্তান, বঙ্গদেশের অজ্ঞাত অপরিচিত কোন সুদূর পল্লীতে ইঁহার জন্ম। আজ ইওরোপ-আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সত্য-সত্যই ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে এবং পরে আরও সহস্র সহস্র লোক পূজা করিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি ইহাতে বিধাতার হাত না দেখিতে পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্ধ; যদি সময় আসে, যদি আর কখনও তোমাদের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ হয়, তবে তোমাদিগকে ইঁহার বিষয় আরও বিস্তারিতভাবে বলিব; এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, যদি আমার জীবনে একটিও যথার্থ তত্ত্ব কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার—তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যেগুলি অসত্য—ভ্রমাত্মক, যেগুলি মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, সেগুলির জন্য আমি—আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

# ১৪. আমাদের উপস্থিত কর্তব্য

[এই বক্তৃতা ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টাতেই স্বামীজী চিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।]

পৃথিবী যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই দিন দিন জীবন-সমস্যা আরও গভীর ও ব্যাপক হইতেছে। অতি প্রাচীনকালে যখন সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব-রূপ বৈদান্তিক সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতেই উন্নতির মূলমন্ত্র ও সারতত্ত্ব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে না টানিয়া জগতের একটি পরমাণু পর্যন্ত নড়িতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে একই সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর না করাইয়া পৃথিবীর কোন স্থানে কোনরূপ উন্নতি সম্ভব নহে। আর প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু জাতীয় বা কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যে-কোন বিষয়—যে-কোন ভাব হউক, উহাকে উদার হইতে উদারতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহা সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায়; যে-কোন আকাঙ্ক্ষাই হউক, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাড়াইতে হইবে, যেন উহা সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহা নয়, সমগ্র প্রাণিজগৎকে পর্যন্ত নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশ যে উচ্চাসনে আরূঢ় ছিল, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ আর তাহা নাই। যদি আমরা এই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা—আমাদের কার্যক্ষেত্রের সঙ্কোচনই ইহার অন্যতম কারণ।

জগতে দুইটি আশ্চর্য জাতির আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। একই মূল জাতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নির্দিষ্ট পন্থায় জীবন-সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত দুইটি প্রাচীন জাতি ছিল—আমি হিন্দু ও গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। উত্তরে হিমাচলের হিমশিখরসীমাবদ্ধ, পৃথিবীর প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অন্তহীন অরণ্যানী ও

সমতলে প্রবহমান সমুদ্রবৎ বিশাল স্বাদুসলিলা স্রোতস্বতী-বেষ্টিত ভারতীয় আর্যের মন সহজেই অন্তর্মুখ হইল। আর্যজাতি স্বভাবতই অন্তর্মুখ, আবার চতুর্দিকে এই-সকল মহাভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবগ্রাহী মস্তিষ্ক স্বভাবতই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল, নিজের মন বিশ্লেষণ করাই ভারতীয় আর্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীকজাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিত, যেখানে গাম্ভীর্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের বেশী সমাবেশ—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দিকের নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী প্রকৃতি—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল, উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিতে চাহিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগপূর্বক বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইবার বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।

হিন্দু মন নিজ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি বিস্ময়কর ফল লাভ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্তি, ভারতীয় মস্তিষ্ক এখনও যেরূপ শক্তির আধার, তাহার সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের যুবকগণ অন্য যে-কোন দেশের যুবকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্বদাই জয়ী হইয়া থাকে; তথাপি যখন, সম্ভবতঃ মুসলমানকর্তৃক ভারতবিজয়ের দু-এক শতাব্দী পূর্বে জাতীয় প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জাতির এই বিশেষত্বটিকে—বিচারশক্তিকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করা হইল যে, উহারও অবনতি হইল। আর আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান—সকল বিষয়েই এই অবনতির কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্পের আর সেই উদার ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আর রহিল না। সকল বিষয়েই প্রচণ্ড অলঙ্কারপ্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সমগ্র জাতির মৌলিকত্ব যেন অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীতে প্রাচীন সংস্কৃতের হৃদয়-আলোড়নকারী গভীর ভাব আর রহিল না, পূর্বে যে প্রত্যেকটি সুর স্বতন্ত্র থাকিয়াও অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না; সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীতে নানাবিধ সুরের তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রে অবনতির চিহ্ন। তোমাদের ভাবরাজ্যের অন্যান্য

বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য এবং মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইবে, আর তোমাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র—ধর্মের ঘোর ভয়াবহ অবনতি হইয়াছিল। যে-জাতি শত শত বৎসর যাবৎ এক গ্লাস জল 'ডান হাতে খাইব, কি বাঁ হাতে খাইব'—এইরূপ গুরুতর সমস্যাগুলির বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পার? যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলি শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচারে ব্যাস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, জগতে প্রচারিত ঈশ্বর ও আত্মা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মহত্তম ও গৌরবময় সিদ্ধান্তসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হইল, গভীর অরণ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসীর দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে কেবল খাদ্যখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত রহিল। মুসলমানগণ ভারতবিজয় করিয়া—তাহারা যাহা জানিত, এমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আমাদের জাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিতে পারে নাই।

অবশেষে আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশ-বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখনও কখনও শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরেজের এই ভারত-বিজয়ে বিশেষ শুভ ফল হইয়াছে। ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী; ইওরোপের সব-কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা বলিতেছে; উহার প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেকটি আসবাবপত্রে পর্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ; ইওরোপের বিজ্ঞান শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানবজীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে। আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি, আর যদিও আমরা প্রথমে ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের ভাবগুলিকে একটু সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, চতুর্দিকে যে-সব উদার ভাব

দেখা যাইতেছে, সেগুলি এবং জীবনের এই প্রশস্ততর ধারণাগুলি আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের স্বাভাবিক পরিণতি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পর ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশঃ নিজেদের সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি—বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছি।

আমাদের উন্নতির পথে যত বিঘ্ন আছে, সেগুলির মধ্যে একটি এই গোঁড়ামি যে— 'জগতে আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি।' ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সর্বদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তথাপি পৃথিবীর নিকট আমাদের যে অনেক কিছু শিখিতে হইবে—এ ধারণা আমি ত্যাগ করিতে পারি না। আমাদিগকে সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, সকলেই আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। আমাদেরই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনু বলিয়াছেনঃ

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি |
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি || ২৩

অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি।

সুতরাং যদি আমরা মনুর উপযুক্ত বংশধর হই, তবে তাঁহার আদেশ আমাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যে-কোন ব্যক্তি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই ঐহিক বা পারত্রিক বিষয়ে শিক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতের বাহিরের দেশগুলির সহিত আমাদের সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে একসময়ে অপরের সহিত সংস্রব না রাখিবার কথা ভাবিয়াছিলাম, তাহা শুধু আমাদের নির্বুদ্ধিতা, আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বৎসর যাবৎ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমরা যে অন্যান্য জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতের বাহিরে যাওয়া অনুচিত—এ-সব আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষি। এ-সব ধারণা সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত মিশিবে, ততই তোমাদের ও দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ব হইতেই—শত শত বৎসর পূর্ব হইতেই—যদি ইহা করিতে, তবে আজ এরূপ হইত না—যে-কোন জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত হইতে না। জীবনের প্রথম স্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি তোমরা বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িতে হইবে। যে-মুহূর্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই-মুহূর্ত হইতেই জানিবে মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে। আমি ইওরোপ-আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সহৃদয়ভাবে তাহা উল্লেখ করিয়াছ। আমাকে যাইতে হইয়াছিল, কারণ এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম চিহ্ন। এই পুনরভ্যুদয়শীল জাতীয় জীবন ভিতরে ভিতরে বিস্তৃত হইয়া আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদি এই জাতি আদৌ বাঁচিয়া থাকে, তবে এরূপ হইবেই হইবে। সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্বপ্রধান লক্ষণ; এই বিস্তারের সহিত মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের যাহা দিবার আছে, সমগ্র পৃথিবীর উন্নতিবিধানে আমাদের যেটুকু দেয় আছে, তাহাও ভারতের বাহিরে যাইতেছে।

ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, হিন্দুরা চিরকাল তাহাদের দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তোমরা তোমাদের

প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই, তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাস যথাযথ অধ্যয়ন কর নাই। যে-কোনজাতিই হউক, বাঁচিতে হইলে তাহাকে কিছু দিতেই হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে, কিছু গ্রহণ করিলে উহার মূল্যস্বরূপ অপর সকলকে কিছু দিতেই হইবে। এত সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা যে বাঁচিয়া আছি—এ-কথা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন কিরূপে আমরা এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে—আমরা চিরকালই পৃথিবীকে কিছু না দিয়া আসিতেছি, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক না কেন।

তবে ভারতের দান—ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা; ধর্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক সত্য শ্রোণিতপ্রবাহের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদর্পে অগ্রসর হয় না, ঐগুলি শান্তি ও প্রেমের পক্ষদ্বয়ে ভর করিয়া শান্তভাবে আসিয়া থাকে, আর এইরূপই বরাবর হইয়াছে। অতএব দেখা গেল, ভারতকেও বরাবর পৃথিবীকে কিছু না কিছু দিতে হইয়াছে। লণ্ডনে জনৈকা মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমরা কখনও একটি জাতিকেও জয় কর নাই!' ইংরেজ জাতির পক্ষে—বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরেজ জাতির পক্ষে এ কথা শোভা পায়; তাহাদের পক্ষে একজন অন্যকে জয় করিতে পারিলে তাহাই শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাদের দৃষ্টিতে উহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, 'ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি?' উত্তর পাই, 'কারণ এই যে, আমরা কখনও অপর জাতিকে জয় করি নাই।' ইহাই আমাদের গৌরব। তোমরা আজকাল সর্বদাই আমাদের ধর্মের এই নিন্দা শুনিতে পাও যে, উহা পরধর্ম-বিজয়ে সচেষ্ট নহে; আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম যে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, ইহাই তাহার একটি প্রধান কারণ; আমাদের ধর্ম কখনই অপর ধর্মকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত করে নাই, উহা সর্বদাই আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, সকলকে

উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই পরধর্মসহিষ্ণুতা-বিষয়ক ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এইখানেই পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ইহা কেবল মতবাদে পর্যবসিত। এখানে—কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ নির্মাণ করিয়া দেয়। অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বুঝিতেছেন—আমাদের ভাব পৃথিবীতে বহুবার প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু অতি ধীরে, নীরবে ও অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ উহার শান্তভাব, উহার নীরবতা। আবার উহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বল-বাচক কোন শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনীশক্তি বলা যাইতে পারে। কোন বৈদেশিক যদি আমাদের সাহিত্য-অধ্যায়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহা তাহার নিকট অতিশয় বিরক্তিকর লাগে; উহাতে হয়তো তাহার দেশের সাহিত্যের মত উদ্দীপনা নাই, তীব্র গতি নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়া উঠিবে। ইওরোপের বিয়োগান্তক নাটকগুলির সহিত আমাদের নাটকগুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, ক্ষণকালের জন্য উদ্দীপিত করে; কিন্তু শেষ হইবা মাত্র মনে প্রতিক্রিয়া আসে, স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। ভারতের বিয়োগান্ত নাটকগুলি ঐন্দ্রজালিকের শক্তির মত ধীরে নিঃশব্দে কাজ করে; একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত হইতে থাকে। আর কোথায় যাইবে? তুমি বাঁধা পড়িলে। যিনিই আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছে, তিনিই উহার বন্ধন অনুভব করিয়াছেন—তিনিই উহার চিরপ্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে।

শিশিরবিন্দু যেমন নিঃশব্দে অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে ভারতের দান সেইরূপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে যুগান্তর আনিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না—কখনও এরূপ হইল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ বলিয়াছিল, 'ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার!' ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, 'ইহাই ভারতীয় ভাব।' তাঁহারা আধুনিক

গ্রন্থকারগণের মত ছিলেন না। আধুনিক গ্রন্থকার অন্যান্য লেখকের গ্রন্থ হইতে শতকরা নব্বই ভাগ চুরি করে, শতকরা দশভাগমাত্র তাহার নিজস্ব, কিন্তু গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলে না, ‘এই-সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।’

যে-সকল মহামনীষী মানবজাতির হৃদয়ে মহান্ ভাবরাশি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, গ্রন্থে নিজেদের নাম পর্যন্ত দেন নাই, তাঁহারা সমাজকে তাঁহাদের গ্রন্থরাশি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তাঁহারা সকলেই ‘ব্যাস’, ‘কপিল’ প্রভৃতি উপাধিমাত্র দ্বারা পরিচিত। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সন্তান। তাঁহারাই যথার্থভাবে গীতার শিক্ষা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ উপদেশ—‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’ (কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে)—জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তবে ইহার জন্য একটি পরিবেশ প্রয়োজন। পণ্যদ্রব্য যেমন অপরের নির্মিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, ভাবরাশি সম্বন্ধেও সেইরূপ। এক দেশ হইতে অপর দেশে ভাবরাশি লইয়া যাইতে হইলে তৎপূর্বে পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; আর পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে, তখনই সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বৌদ্ধদের পূর্বেও ভারতীয় চিন্তারাশি পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই চীন, পারস্য ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে বেদান্ত প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহতী গ্রীকশক্তি প্রাচ্যজগতের বিভিন্ন অংশকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল, তখন আবার সেখানে ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টধর্ম যে-সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে, তাহাও ভারতীয় চিন্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই

নহে। আমরা সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম—উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও—যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম যাহার অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন অনুকরণমাত্র।

আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডের দোর্দণ্ড শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে আবার একত্র করিয়াছে। ইংরেজের পথ রোমক রাজপথগুলির মত কেবল স্থলে নহে, অতলস্পর্শ সমুদ্রের সব দিকে ছুটিয়াছে। ইংলণ্ডের পথগুলি সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। পৃথিবীর এক অংশ অন্য সকল অংশের সহিত যুক্ত হইয়াছে, আর বিদ্যুৎ নবনিযুক্ত দূতরূপে উহার অতি অদ্ভুত অংশ অভিনয় করিতেছে। এই-সকল অনুকূল অবস্থা পাইয়া ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ প্রকৃতি যেন আমাকে জোর করিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, উহার সময় আসিয়াছে। সকল দিকেই শুভচিহ্ন দেখা যাইতেছে; ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবী জয় করিবে। সুতরাং আমাদের জীবনসমস্যা ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে, ইহা তো অতি সামান্য কথা; আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি, আমার ধারণা হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে; আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী ভারতের মহান্ সম্রাট্ অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন; আর আমি ইচ্ছা করি—যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, তাহাদের সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কাজে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কাজের বিরাম না হয়। লোকে তোমাকে প্রতিদিন বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া থাক। যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ করিয়া থাক,

বিদেশী ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাববিস্তারের চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ করিতেছ, আর এই সভা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে–তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপর দেশে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিভাবে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ, আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ জয়–ইহার কম কিছুতেই নয়; আর আমাদের সকলকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে। বৈদেশিকগণ আসিয়া তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা ভারত প্লাবিত করিয়া দিক–ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় কর। এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিলঃ ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়। আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখগুলিকে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে, এবং ক্রমশঃ ঐরূপ পশুসংখ্যা বাড়িতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যজাতিগুলিকে জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, জাতিরূপে যদি বাঁচিতে হয়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা উহার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে?ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি বহন করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত–এমন মানুষ কোথায়? এই মঙ্গলবার্তা যাহাতে পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেক অলিতে-গলিতে পৌঁছায়, তাহার জন্য সর্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত–এমন মানুষ কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্য করিবে–এইরূপ বীরহৃদয় মানুষের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ-প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্মী প্রয়োজন। আজ ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, এরূপ না হইলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু

কোথাও শান্তি পায় নাই; সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এখন এমন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে মনে করাইয়া দিতেছি—আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—যে জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল, তাহাকে পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগদ্‌বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে কুসংস্কাররাশিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে; ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পর্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ঐগুলি একেবারে মরিয়া যায়। ঐগুলি জাতীয় অবনতির কারণ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্বীর্যতা আসিয়া থাকে। আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, আমাদের মস্তিষ্ক যেন উচ্চ ও মহৎ চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়া না পড়ে, উহা যেন মৌলিকতা না হারায়, উহা যেন নিস্তেজ হইয়া না যায়, উহা যেন ধর্মের নামে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে নিজেকে বিষাক্ত করিয়া না ফেলে। আমাদের এখানে—এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে একদিকে ঘোর জড়বাদ, অপরদিকে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘোর কুসংস্কার—দুই-ই পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। একদিকে পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরাপানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তূপ, হিন্দুদর্শন কেবল শিশুর আধ-আধ বুলি এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কিন্তু কতকটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁহারা আবার উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। ঐ ব্যক্তি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত

তাহার, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার বা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলি প্রতিপালন করার উপরই জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এই-সব হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

তোমরা প্রত্যেকে বরং ঘোর নাস্তিক হও, কিন্তু আমি তোমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে বুদ্ধিনাশ হয়, মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে; পতনের ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা চাই নির্ভীক সাহসী লোক, আমরা চাই—রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হইক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে, এমন-সব ভাবের প্রয়োজন নাই; সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্বপ্রকার রহস্যের দিকে ঝোঁক ত্যাগ কর। ধর্মে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদান্ত বা বেদে, সংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে? প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের জন্য কোথাও কি গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আবিষ্কৃত মহান্ সত্যসমূহ সমগ্র পৃথিবীকে দিবার জন্য তাঁহারা কি কোন চাতুরী বা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন—ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখিয়াছ কি? গুপ্তভাব লইয়া নাড়াচাড়া করা ও কুসংস্কার সর্বদাই দুর্বলতার চিহ্ন, উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব ঐগুলি হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর দঁড়াও। সংসারে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যতদূর, তদনুযায়ী ঐগুলিকে অপ্রাকৃত বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটি গুপ্ত নহে। ধর্মের সত্যসমূহ গুপ্ত অথবা ঐগুলি হিমালয়ের শিখরে অবস্থিত গুপ্তসমিতিসমূহের একচেটিয়া সম্পত্তি—এ কথা ভারতভূমিতে কখনই প্রচারিত হয় নাই। আমি হিমালয়ে গিয়াছিলাম, তোমরা যাও নাই। তোমাদের দেশ হইতে উহা শত শত মাইল দূরে। আমি একজন সন্ন্যাসী, গত চতুর্দশ বৎসর যাবৎ পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—এইরূপ গুপ্তসমিতি কোথাও নাই। এই-সকল কুসংস্কারের পিছনে ছুটিও না। তোমাদের এবং তোমাদের সমগ্র

জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ নাস্তিক হইলে অন্ততঃ তোমাদের একটু তেজ থাকিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন হওয়া অবনতি ও মৃত্যুস্বরূপ। সতেজ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এই-সকল কুসংস্কার লইয়া তাহাদের সময় কাটায়, ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করে—ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয়। সাহসী হও, প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কালো দাগ—অনেক ক্ষত আছে, ঐগুলি একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কাটিয়া ফেলিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি তাহাতে অক্ষতই থাকিবে; বরং এই কালো দাগগুলি যতই মুছিয়া যাইবে, ততই মূলতত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে—সতেজে প্রকাশিত হইবে। ঐ তত্ত্বগুলিকে ধরিয়া থাক।

তোমরা শুনিয়াছ, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই নিজেকে সার্বভৌম ধর্ম বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই, সম্ভবতঃ কোন ধর্মই কোন কালে সার্বভৌম ধর্মরূপে পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধর্মের এই দাবী করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের ধর্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে; কারণ অন্যান্য সকল ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য সকল ধর্মই কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সহিত জড়িত। ঐ-সকল ধর্মাবলম্বীরা মনে করে, ঐতিহাসিকতাই তাহাদের ধর্মের শক্তি, কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা শক্তি মনে করিতেছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা; কারণ যদি ঐ ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাদের ধর্মরূপ প্রাসাদ একেবারে ধসিয়া পড়ে। ঐ-সকল ধর্মের স্থাপক মহাপুরুষদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পর্কে বিশেষরূপে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল তাঁহাদের কথার উপর যে-সকল সত্যের প্রামাণ্য ছিল, সেগুলি আবার শূন্যে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের ধর্মে যদিও মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ধর্মের সত্যসকল তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণের

মাহাত্ম্য নয়, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের মত তাঁহার নামও ভারতের ধর্মজগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত।

সুতরাং আমরা ব্যক্তিবিশেষের মতানুগামী নহি, আমরা চিরকালই ধর্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের বাস্তবরূপমাত্র—উদাহরণস্বরূপ। যদি ঐ তত্ত্বগুলি অবিকৃত থাকে, তবে শত সহস্র মহাপুরুষের, শত সহস্র বুদ্ধের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যদি ঐ তত্ত্বগুলি লোপ পায়, যদি মানুষ ঐগুলি ভুলিয়া যায়, আর সমগ্র জাতীয় জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মত অবলম্বন করিয়া চলিতে যায়, তবে সেই ধর্মের অবনতি অনিবার্য, সেই ধর্মের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কেবল আমাদের ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়, উহা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর দিকে আবার উহাতে লক্ষ লক্ষ অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নূতন মহপুরুষেরও আমাদের ধর্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইতে হইবে—এইটি ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ধর্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে, আর এইগুলি যাহাতে কালে মলিন হইয়া না পড়ে, সেজন্য আমাদের সকলকে সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের জাতীয় জীবনে ঘোর অবনতি ঘটিলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনই মলিন হয় নাই। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও ঐগুলি দূষিত করিতে সাহস করে নাই। আমাদের শাস্ত্রসমূহ পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা ভালভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূলের বিকৃতি অথবা ভাবের বিপর্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমে যেমন ছিল, এখনও ঠিক সেইভাবেই উহা রহিয়াছে এবং মানুষের মনকে সেই আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতেছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকার উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান্ আচার্য উহা প্রচার করিয়াছেন এবং উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। আর তোমারা দেখিবে—এই বেদগ্রন্থে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া মনে হয়;

কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবদ্যোতক। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি একেবারে চাপা দিতে চান। দ্বৈতবাদী ধর্মাচার্য ও পুরোহিতগণ সকলকেই দ্বৈতভাবে উহাদের ব্যাখ্যা করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈত শ্লোকগুলিকে সেইরূপ অদ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা তো বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে—এটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মূর্খোচিত কার্য। আবার সমগ্র বেদ অদৈতভাবের সমর্থক, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টাও সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা। বেদে দ্বৈত অদ্বৈত—দুই-ই আছে। আমরা নূতন নূতন ভাবের আলোকে ইহা আজকাল আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিতেছি। এই-সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ধারণার দ্বারা পরিশেষে এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মনের ক্রমোন্নতির জন্যই এই-সব মতের প্রয়োজন, আর সেজন্যই বেদ এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপান দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পরবিরোধী, তাহা নহে; শিশুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য বেদ ঐ-সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

ঐগুলির প্রয়োজন আছে—শুধু শিশুদের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই শরীরকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থূলজগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তি-ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ মহান্ রামানুজ প্রমাণ করিয়াছেনঃ ঈশ্বর, জীব, জগৎ—এই তিনটির মধ্যে একটি স্বীকার করিলে অপর দুটিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা পরিহার করিবার উপায় নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা বাহ্যজগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর অস্বীকার করা ঘোর বাতুলতা।

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখনও কখনও এমন সময় আসিতে পারে, যখন জীবাত্মা তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির পারে চলিয়া যায়—সেই সর্বাতীত প্রদেশে চলিয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেনঃ

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’
‘ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।’
‘নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।’

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।–সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।–আমি তাঁহাকে জানি, ইহা মনে করি না; জানি না, ইহাও মনে করি না।২৪

তখনই জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই, কেবল তখনই তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব–আমি ও সমগ্র জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক–এই ভাব উদিত হয়।

আর শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয়, তাহা নহে; প্রেমবলেও আমরা ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। ভাগবতে পড়িয়াছ, গোপীগণের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে বিলাপ করিতে করিতে গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-বোধে তাঁহারই মত বেশভূষা করিয়া তাঁহারই লীলার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং বুঝিতেছ, প্রেমবলেও এই একত্ব-অনুভূতি আসিয়া থাকে। জনৈক প্রাচীন পারস্যদেশীয় সুফীর একটি কবিতায় এই ভাবের কথা আছেঃ প্রেমাস্পদের নিকট গিয়া দেখিলাম–গৃহদ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিলাম, ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, ‘কে?’ উত্তর দিলাম, ‘আমি।’ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম। আবার সেই প্রশ্ন ‘কে?’ আবার উত্তর দিলাম, ‘আমি অমুক।’ তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে?’ তখন বলিলাম–‘হে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি।’ তখন দ্বার খুলিয়া গেল।

সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে–ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন সোপান আছে; আর যদিও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে–যাঁহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত, তাঁহাদের মধ্যে–বিবাদ থাকে, তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ জ্ঞানের

ইতি করা যায় না। প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে সর্বজ্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে। অতীত কালে যদি ঋষি-মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিও বর্তমানকালেও অনেক ঋষির অভ্যুদয় হইবে; যদি প্রাচীনকালে ব্যাস-বাল্মীকি-শঙ্করাচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যকেই এক একজন শঙ্করাচার্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটিও তোমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; অন্যান্য ধর্মেও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের বাক্যই শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ পুরুষের সংখ্যা এক দুই বা কয়েকজন মাত্র—তাঁহাদেরই মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সত্য প্রচারিত হইয়াছে; আর সকলকে তাঁহাদের কথা মানিতে হয়। খ্রীষ্টধর্ম বলেঃ নাজারেথের যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল; আমাদের সকলকে উহাই মানিয়া লইতে হইবে, আমরা আর বেশী কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের ধর্ম বলেঃ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন দুইজন নহে, অনেকের মধ্যে ঐ সত্য আবির্ভূত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। 'মন্ত্রদ্রষ্টা' শব্দের অর্থ মন্ত্র বা তত্ত্বসমূহ যিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন—কেবল বাক্যবাগীশ, শাস্ত্রপাঠক, পণ্ডিত বা শব্দবিৎ নহে—তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

বহু বাক্যব্যয় দ্বারা, অথবা মেধা দ্বারা, এমন কি বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।২৫

বেদ নিজে এ-কথা বলিতেছেন। তোমরা কি অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ নির্ভীক বাণী শুনিতে পাও—'বেদপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না?' হৃদয় খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র-বিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে। বাহিরের রঙ ও আড়ম্বরাদি যতক্ষণ পর্যন্ত

আমাদের ধর্মজীবনের সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময় শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্মজীবনে সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্মকে এক করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়াই ধর্মজীবন হইয়া দাঁড়ায়, এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা কখনও ধর্মানুভূতি লাভ করা যায় না। যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎ করায় তাহাই ধর্ম; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য। যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ঋষি হইয়াছেন। সহস্র বৎসর পূর্বে যিনি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনিও যেমন ঋষি, সহস্র বৎসর পরেও যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিও তেমনি ঋষি। আর যতদিন না তোমরা ঋষি হইতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন শুরু হইবে না; ঋষি হইলে তোমাদের প্রকৃত ধর্ম আরম্ভ হইবে, এখন কেবল প্রস্তুত হইতেছ মাত্র; তখনই তোমাদের ভিতর ধর্মের প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—আমাদের ধর্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যে-কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। ইহাই মুক্তি।

আর ইহাই যদি আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তবে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা নিজে নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব, এবং তাহাই করিতে হইবে। আবার প্রাচীন ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে সম্মান দেখাইতে হইবে। এই প্রাচীনগণ মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরও বড় হইতে চাই। তাঁহারা অতীতকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষাও বড় বড় কাজ করিতে হইবে। প্রাচীন

ভারতে শত শত ঋষি ছিলেন, এখন লক্ষ লক্ষ ঋষি হইবেন, নিশ্চয় হইবেন। আর তোমাদের প্রত্যেকেই যত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ততই মঙ্গল। তোমরা যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই হইবে। তোমরা যদি নিজেদের নির্ভীক বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে নির্ভীক হইবে। যদি সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই তোমরা সাধুরূপে পরিগণিত হইবে; কিছুই তোমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। কারণ আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায়গুলির ভিতর যদি একটি সাধারণ মতবাদ থাকে, তবে তাহা এইঃ ‘আত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিত্রতা রহিয়াছে।’ কেবল রামানুজের মতে আত্মা কখনও সঙ্কুচিত হন ও কখনও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর শঙ্করের মতে ঐ সঙ্কোচ ও বিকাশ ভ্রমমাত্র। এ প্রভেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই তো স্বীকার করিতেছেন—ব্যক্তই হউক, আর অব্যক্তই হউক, যে-কোন আকারে হউক, ঐ শক্তি ভিতরেই রহিয়াছে। আর যত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করা যায়, ততই তোমাদের কল্যাণ। সব শক্তি তোমাদের ভিতরে রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পার। ইহা বিশ্বাস কর। মনে করিও না—তোমরা দুর্বল। আজকাল অনেকে যেমন নিজেদের অর্ধোন্মাদ বলিয়া মনে করে, সেরূপ মনে করিও না। অপরের সাহায্য ব্যতীতই তোমরা সব করিতে পার। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে; উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ কর।

# ১৫. ভারতের ভবিষ্যৎ

[মান্দ্রাজে এই শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়—প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।]

এই সেই প্রাচীনভূমি, অন্য কোন দেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে তত্ত্বজ্ঞান যে-দেশকে নিজ বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিল। এই সেই ভারতভূমি, যে-ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—সমুদ্রে প্রবহমানা এবং 'সমুদ্রায়মানা' বিশাল স্রোতস্বতীসমূহ দ্বারা, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এইখানেই মানবমন নিজ স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল; এইখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-বিষয়ক মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শগুলি এইখানেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার মত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার সেইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও সেইরূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারতসন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি; ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য—তোমাদিগকে প্রকৃত কার্যের পথে

আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, কেবল পূর্বগৌরব-স্মরণে মনের অবনতি হয়, উহাতে কোন ফল হয় না, অতএব আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। সত্য কথা; কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, আমাদিগকে প্রথমেই ইহা স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমেই জানিতে হইবে—আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে বহিতেছে। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া সেই বিশ্বাসবলে অতীত মহত্ত্বের চেতনা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও মহত্তর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্তব্যের মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সে কথা জানি; ঐ অবনতির প্রয়োজন ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল, ফলটি মাটিতে পড়িয়া পচিয়া গেল, তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয়তো প্রথম বৃক্ষ অপেক্ষা মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল। এইরূপে যে অবনতি-যুগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল; সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান্ প্রকাণ্ড 'ঊর্ধ্বমূলম্' বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আমি আজ তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ অপেক্ষা এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি একটি করিয়া জাতি লইয়া এই জাতির সহিত তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে—অন্যান্য জাতি যে-সকল উপাদানে গঠিত, সেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প। আর্য, দ্রাবিড়,

তাতার, তুর্ক, মোগল, ইওরোপীয়—পৃথিবীর সকল জাতির শোণিত যেন এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ—আর আচার-ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ, ইওরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই।

কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ—সর্বত্র সকলকে এক ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম—এ কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে-হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে-হিসাবে 'এক ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে—যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায়সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক, সকলেই সেগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই, এশিয়ায়—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতি, ভাষা, সমাজ সম্বন্ধে সমুদয় বাধা ধর্মের সমন্বয়ী শক্তির নিকট তিরোহিত হয়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নাই; ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর ইহাও জানি—আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে পারি।

ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ—ইহা তো সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সে-কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি, ভারতের পক্ষে কাজ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়—প্রথমে ধর্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে গেলে সর্বনাশ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনাই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের প্রথম কর্মসূচি, যুগযুগান্তর ধরিয়া অবস্থিত কালজয়ী ঐ মহাচল হইতেই এই প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আর নিজেদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, এই-সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহা অননুমোদন করেন না, আর যাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবী করিয়া থাকি, যাঁহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, সেই মহাপুরুষগণ অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া তাঁহাদের সন্তানগণের এইরূপ বিবাদ অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এই- সকল দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে-দেহে কোন রোগের বীজ বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই ‘রক্ত’ বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দ্রারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কারণ যদি রোগের বীজই শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইল, তখন আর সেই রক্তে অন্য কোন বাহ্য বস্তু কিভাবে প্রবেশ করিবে? আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি উপমার সাহায্যে বলা যায়, রোগোৎপত্তির দুইটি কারণ—বাহিরে কোন বিষাক্ত জীবাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যতক্ষণ না দেহ রোগের বীজকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়, যতদিন না দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগের বীজ প্রবেশের ও তাহার বৃদ্ধির অনুকূল হয়, ততদিন জগতের কোন জীবাণুর

শক্তি নাই যে, শরীরে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। বাস্তবিক প্রত্যেকের শরীরের মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ বীজাণু ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন ঐগুলির অস্তিত্ব কেহ বুঝিতেই পারে না। শরীর যখন দুর্বল হয়, তখনই বীজাণুগুলি শরীর দখল করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। জাতীয় জীবনসম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ। যখনই জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনীতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার রোগবীজাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপন্ন করে। অতএব জাতীয় দুর্বলতার প্রতিকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি, তাহা দেখিতে হইবে এবং রক্তের সর্ববিধ দোষ দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্বপ্রকার বাহ্য বিষের প্রবেশ প্রতিরোধ করিতে পারে ও ভিতরের বিষ বাহির করিয়া দিতে পারে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমন কি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। আমি এখন এ বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্মে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থাপন করায় পরিণামে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে; ভালই হউক বা মন্দই হউক, ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি, তোমরা উহা ত্যাগ করিতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি, সুতরাং আমাদের ধর্মে আমার যেমন বিশ্বাস আছে, তোমাদের যদি তেমন না-ও থাকে, তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হইবে। তোমরা এই ধর্মবন্ধনে চির আবদ্ধ; যদি ধর্ম পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ধর্মই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। এই ধর্মরক্ষার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সাহসপূর্বক সব-কিছুই সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙিয়াছে—কিন্তু এই অত্যাচার-স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহা না শিখিতে পার, দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির, গুজরাটের সোমনাথের মত অনেক মন্দির দেখিয়া তোমরা তদপেক্ষা বেশী শিক্ষা পাইতে পার—তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পার। লক্ষ্য করিয়া দেখ, ঐ মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে—বার বার বিধ্বস্ত হইয়াছে, আবার সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া, নূতন জীবনলাভ করিয়া পূর্বেরই মত অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে।

ইহাই আমাদের জাতীয় চেতনা, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ। এই ভাব অনুসরণ কর, গৌরবান্বিত হইবে। এই ভাব পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবন-প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে 'বিনাশ'—আমি অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই; আমার বক্তব্য এইটুকু—আর আমার ইচ্ছা তোমরা ইহা ভুলিও না যে, ঐগুলি গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।

কিরূপে উহা সাধিত হইবে? আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় কার্যপ্রণালী বলিব। আমেরিকা যাইবার জন্য মান্দ্রাজ ছাড়িবার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পগুলি ছিল, এই ভাব প্রচার করিবার জন্যই আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম। ধর্মমহাসভা প্রভৃতির জন্য আমার বড় ভাবনা হয় নাই—উহা শুধু একটি সুযোগরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার মনে যে সঙ্কল্প ঘুরিতেছিল, তাহাই আমাকে সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরাইয়াছে। আমার সঙ্কল্প এইঃ প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলি—যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই বাহিরে ঐগুলি বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে

সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্বসাধারণের—প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃত ভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই-সকল ভাবপ্রচারের এক মহান্ অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে। সংস্কৃতভাষা যে কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে। যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পার। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃত-শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে তাঁহাদের জীবৎকালেই অদ্ভুত ফল-লাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার কিছু কারণ আছে; এই মহান্ আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমন কি, মহান্ বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফল-লাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবন্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত

ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; অতি দূরে দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব-বোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। মজ্জাগত হইয়া শিক্ষা কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য; কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব। তাহাদের সভ্যতা যেমন গভীর নয়, জ্ঞানও তদ্রূপ; একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।

এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে; এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছুর প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে, যে জাতি সংস্কৃত ভাষার সুবিধা লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও পূর্বের মতই প্রভুত্ব করিবে। নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের বলিতেছি—তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা, আর উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলিতেছে উহা বৃথা; উহাতে কোনরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না; উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব হইতেই নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে। জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তি কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা; তাহা যদি করিতে পার, তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য মান্দ্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটি মত আছেঃ দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তনিবাসী আর্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রাবিড়জাতির নিবাস ছিল; দাক্ষিণাত্যের এই ব্রাহ্মণগণ শুধু আর্য্যাবর্তনিবাসী ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি বলি, এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে; আমি তো আর কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমরা এতগুলি আর্যাবর্তের লোক এখানে রহিয়াছি, আর আমি আমার ইওরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য-বাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করি। উহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একটু ভাষার প্রভেদমাত্র। পূর্বোক্ত মতবাদীরা বলেন, দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা আর্যাবর্ত হইতে যখন আসেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃতভাষী ছিলেন, এখন এখানে আসিয়া দ্রাবিড়ভাষা বলিতে বলিতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেই বা ও-কথা খাটিবে না কেন? অন্যান্য জাতিও আর্যাবর্তনিবাসী ছিল, তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়া দ্রাবিড়ভাষা লইয়াছে—এ কথাই বা বলা যাইবে না কেন? যে-যুক্তি দ্বারা তুমি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইতেছ, সেই যুক্তিদ্বারাই আমি তাহাদিগকে আর্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। ও-সব মূর্খের কথা, ও-সব কথায় বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে, একটি দ্রাবিড় জাতি ছিল—তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা বনে-জঙ্গলে বাস করিতেছে। খুব সম্ভব ঐ দ্রাবিড় ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সকলেই আর্য—আর্যাবর্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোন জাতি নাই।

আবার আর এক মত আছে যে, শূদ্রেরা নিশ্চয় অনার্য জাতি—তাহারা আর্যগণের দাসস্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু মার্কিন, ইংরেজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান হতভাগ্যদের ধরিয়া জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করাইয়াছে এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া

দিয়াছে; যেহেতু ঐ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানগণকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, যেহেতু এই ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীতে ছুটিয়া গিয়া এরূপ কল্পনা করে যে, ঐরূপ ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল—উজ্জ্বলবর্ণ আর্যগণ আসিয়া সেখানে বাস করিলেন; তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কাহারও কাহারও মতে মধ্য-তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন মধ্য-এশিয়া হইতে। অনেক স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ আছেন, যাঁহারা মনে করেন—আর্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দ-মত তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কালো হইলে তিনি আর্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্যগণ সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদগুলির তীরে বাস করিতেন—সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি এই-সব মতামতের সঙ্গে সেখানে ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না! আজকাল কেহ কেহ বলেন, আর্যগণ উত্তরমেরুনিবাসী ছিলেন। আর্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হইক! আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে—আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই; এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাস করাই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচ মিনিটে আর্যদের চাটনির মত খাইয়া ফেলিত। জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য

ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।

সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছেঃ উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান্ উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্যমানব, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও পূর্ণমানবের প্রয়োজন আছে; তাঁহার লোপ হইলে চলিবে না। আধুনিক জাতিভেদ-প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি—ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হইয়াছে, ইহা সত্য। অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণদের এ গৌরবটুকু প্রাপ্য। যথেষ্ট সাহস অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা—যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, সেটুকু তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দাও'—এই ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যটি মনে রাখিও।

অতএব বন্ধুগণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই। বিবাদে কি ফল হইবে? উহা আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের—একচেটিয়া দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে, ভারত হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, আর ইহা ভারতে ইংরেজ-শাসনের অন্যতম সুফল। মুসলমান শাসনকালেও এই একচেটিয়া অধিকার-লোপের যে সুফল ফলিয়াছে, সে-জন্য আমরা উহার নিকট ঋণী। তাহাদের রাজত্বে যে সবই মন্দ ছিল, তাহা নহে। জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ মন্দ নহে, সম্পূর্ণ ভালও নহে। মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। দারিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই।

কেবল তরবারি ও অগ্নির বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল—এ কথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি।

আর তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে মান্দ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি অর্ধেক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খতা জগতে আর কিছু কি থাকিতে পারে? 'পারিয়া' বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে খ্রীষ্টান হইয়া পূর্বনাম বদলাইয়া একটা যা-হোক ইংরেজী নাম লইল বা মুসলমান হইয়া মুসলমানী নাম লইল, আর কোন গোল নাই, সব ঠিক। এইরূপ দেখিয়া ইহা ছাড়া আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারবাসীরা সব পাগল, তাহাদের গৃহগুলি এক-একটি উন্মাদ-আশ্রম, আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতের প্রত্যেক জাতির ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিবে। এরূপ দূষিত ও পৈশাচিক প্রথাসমূহ যে এখনও অবাধে রাজত্ব করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোরতর লজ্জার বিষয় নয়? নিজেদেরই সন্তানগণ অনাহারে মরিতেছে— আর যে মুহূর্তে তাহারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, অমনি তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায়! বিভিন্ন জাতির ভিতর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আর থাকা উচিত নয়।

উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি লোক—অবশ্য ইহাদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রাচীনদের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা কিছুই নাই—অন্যরূপ বলিয়া থাকে, তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যপ্রণালী। তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারাই ঐ কার্যের ব্যাপক উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ। তাঁহারা দূরে থাকিয়া—যুগ যুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব শোভাযাত্রা চলিয়াছে, তাহার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অনুধাবন করেন। তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক সকল গ্রন্থের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন।

কি সেই কার্যপ্রণালী? একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই তাঁহাদের কার্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র, সেগুলিতে দেখিবে নিম্নতর জাতিদের ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইতেছে। এমন শাস্ত্রও আছে, যাহাতে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে যে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার বেদ কিছু স্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্বরতা সন্দেহ নাই, আর ইহা বলাও বাহুল্যমাত্র। কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা সমাজের অংশবিশেষের প্রথাবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রাচীনদের ভিতর কখনও কখনও অসুরপ্রকৃতি লোকের জন্ম হইয়াছিল। সকল যুগে সর্বত্রই অল্পবিস্তর অসুরপ্রকৃতির লোক ছিল। পরবর্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়াছে—'শূদ্রগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না।' ক্রমশঃ আমরা আরও আধুনিক—বিশেষতঃ যেগুলি এই যুগের জন্য বিশেষভাবে উপদিষ্ট—সেই-সকল স্মৃতিতে দেখিতে পাই, 'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।' এইরূপে ক্রমশঃ যতই দিন যাইতেছে, ততই শূদ্রদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে। এইরূপে মূল কার্যপ্রণালীর এবং বিভিন্ন সময়ে উহার বিভিন্ন পরিণতির, অথবা কিরূপে বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া উহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে, তাহা দেখাইবার সময় আমার নাই; কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘটনা বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে।

এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণজাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ জাতিবিশেষ যদি নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতকগুলি জাতি আছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ হাজার লোক, উহারা যদি সকলে মিলিয়া নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে

না। আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে, আর যখনই তাহারা সকলে একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে? কারণ আর যাহাই হউক, এক জাতির সহিত অপর জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এক জাতি অপর জাতির কাজে হস্তক্ষেপ করে না—এমন কি, এক জাতির বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।

শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্যগণ—জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না, আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পার। ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি, আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি-মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

তোমাদিগকেও ঋষি-মুনি হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য হইবার গোপন রহস্য। অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই ঋষি হইতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ কি? বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। আগে শুদ্ধচিত্ত হও—তোমাতেই শক্তি আসিবে। কেবল 'আমি ঋষি' এ কথা বলিলেই চলিবে না; যখনই তুমি যথার্থ ঋষিত্ব লাভ করিবে, দেখিবে—অপরে তোমার কথা কোন-না-কোনভাবে শুনিতেছে। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য শক্তি আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে; তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার অনুবর্তী হইবে, বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনিবে, এমন কি তাহাদের অজ্ঞাতসারে—নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহারা তোমার সংকল্পিত কার্যের সহায়ক হইবে। ইহাই ঋষিত্বের প্রমাণ।

কি করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে—তাহার খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করিলাম না। বংশপরম্পরাক্রমে পূর্বোক্ত ভাব লইয়া কাজ করিতে করিতে কার্যপ্রণালীর খুঁটিনাটি আবিষ্কৃত হইবে। বিবাদ-বিসংবাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহা দেখাইবার জন্য

আমি দু-একটি কথার আভাস-মাত্র দিলাম। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, আজকাল বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ঘোর বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। এটি বন্ধ হওয়া চাই। ইহাতে কোন পক্ষেরই কিছু লাভ নাই। উচ্চতর বর্ণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাভ নাই; কারণ একচেটিয়া অধিকারের দিন গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাহারা এই কার্য করে, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, ততই তাহারা পচিবে আর ধ্বংসও তত ভয়ানক হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকল জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা; ব্রাহ্মণ যদি ঐরূপ চেষ্টা করেন এবং যতদিন করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ; তিনি যদি শুধু টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই সাহায্য করা উচিত, তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে; কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে স্বর্গলাভ না হইয়া বীপরিত ফল হয়—আমাদের শাস্ত্র এই কথা বলে। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি বৈষয়িক কোন কর্ম করেন না। সাংসারিক কার্য অপর জাতির জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি—তাঁহারা যাহা জানেন তাহা অপর জাতিকে শিখাইয়া, বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা অপরকে দান করিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণ কাজ করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি, তাহা স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেনঃ

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ||২৬

ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ—তাঁহারই নিকট ধর্মের ভাণ্ডার রহিয়াছে। তাঁহাকে ঐ ভাণ্ডার খুলিয়া রত্নরাজি জগতে বিতরণ করিতে হইবে। এ কথা সত্য যে, ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ

করেন, আর তিনিই সর্বাগ্রে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাগুলির রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য সব-কিছু ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন জ্ঞান লাভ করিল না, কেন তাঁহাদের মত অনুষ্ঠান করিল না? কেন তাহারা প্রথমে অলসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জয়লাভের সুযোগ দিয়াছিল?

তবে অধিকতর সুবিধা লাভ করা এক কথা, আর অসদ্ব্যবহারের জন্য ঐগুলিকে রক্ষা করা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা আসুরিক ভাব ধারণ করে; কেবল সদুদ্দেশ্যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই বহু-যুগ সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—ব্রাহ্মণ এতদিন যাহার অছি বা রক্ষক হইয়া আছেন, আজ তাহা সর্বসাধারণকে বিলাইয়া দিতে হইবে; তাঁহারা সর্বসাধারণকে উহা এতদিন দেন নাই বলিয়াই মুসলমান-আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই জন্যই সহস্র বৎসর যাবৎ যে-কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সে-ই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

আমাদের সর্বপ্রথম কার্য—আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে নিরাপদ স্থানে ধর্মরূপ অপূর্ব রত্নরাজি গোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখান হইতে সেগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য আগে করিতে হইবে। বাঙলাদেশে২৭ একটি প্রাচীন বিশ্বাস আছে—যে-সাপ কামড়াইয়াছে, সে যদি নিজেই নিজের বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই রোগী বাঁচিবে। সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজের বিষ নিজেকেই উঠাইয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি,

তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? এতদিন তোমরা কি করিতেছিলে? কেন তোমরা এতদিন উদাসীন ছিলে? আর অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর মস্তিষ্ক, বীর্য, সাহস—অধিকতর ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছে বলিয়া এখন বিরক্তি প্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই-সকল বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসংবাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত না থাকিয়া, সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে-শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত-ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলাভের ইহাই রহস্য।

ভারতে 'সংস্কৃতভাষা' ও 'মর্যাদা' সমার্থক। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমার সাহায্যে বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ নিজ আত্মসম্মোহনে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে; আর তাঁহার নিজের মন ভাবের যে স্তরে অবস্থিত, উহা অন্যের মনে ঠিক সেই স্তরের ভাব উৎপন্ন করে; এইরূপ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যখনই আমাদের মধ্যে একজন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শক্তিতে অনেকের ভিতর তদনুরূপ ভাবের উদয় হয়, তখনই আমরা শক্তিশালী হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ—চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে! সংহতিই শক্তির মূল—এ কথা বলিলে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা তো জড়শক্তি-বলেই সাধিত হয়; আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তবে কোথায় রহিল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বইকি! এই চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে, এবং উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি

লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি—শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।

আর এখনই আমার মনে অথর্ববেদ সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক প্রতিভাত হইতেছেঃ ‘সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।২৮ তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই তাঁহাদের যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন। একচিত্ত হওয়াই সমাজ-গঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপযোগী শক্তি-সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য। প্রত্যেকটি চীনার মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন, আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাপানী একচিত্ত—ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা তোমরা জান। জগতের ইতিহাসে চিরকালই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। দেখিবে—ক্ষুদ্র সংঘবদ্ধ জাতিগুলি চিরকালই বৃহৎ অসংবদ্ধ জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা খুবই স্বাভাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিগুলির বিভিন্ন ভাব ও ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা অতি সহজ—আর তাহাতেই তাহারা সহজে উন্নত হইয়া থাকে। আর যে-জাতির লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার পক্ষে সমবেতভাবে কার্য পরিচালনা করা তত কঠিন। উহা যেন একটা অনিয়ন্ত্রিত জনতা, তাহারা কখনও একত্র মিলিতে পারে না। যাহা হউক, এই সব মত-বিরোধের ইতি করিতে হইবে।

আমাদের ভিতর আর একটি দোষ আছে। ভদ্রমহিলাগণ, আমায় ক্ষমা করিবেন, কিন্তু বহু শতাব্দী দাসত্বের ফলে আমরা যেন একটা স্ত্রীলোকের জাতিতে পরিণত হইয়াছি। এদেশে বা অপর যে-কোন দেশে যাও, দেখিবে—তিনজন স্ত্রীলোক যদি পাঁচ মিনিটের জন্য একত্র হইয়াছে তো বিবাদ করিয়া বসে! পাশ্চাত্য-দেশগুলিতে বড় বড় সভা করিয়া মেয়েরা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার-ঘোষণায় আকাশ ফাটাইয়া দেয়; তারপর দুইদিন যাইতে

না যাইতে পরস্পর বিবাদ করিয়া বসে, তখন কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখা যায়—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন! আমরাও এইরূপ স্ত্রীজাতির তুল্য হইয়াছি। যদি কোন নারী আসিয়া নারীর উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না, জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবে তাহারা মনে করে, ঠিকই হইয়াছে। তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে—ঐরূপ প্রভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে! সমগ্র জগৎই জাদুকর ও সম্মোহনকারী দ্বারা পূর্ণ—শক্তিশালী ব্যক্তি সর্বদা এইরূপে অপরকে বশীভূত করিতেছে। যদি তোমাদের দেশে একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে নামাইয়া আনিতে চেষ্টা কর, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, মনে কর—ঠিকই হইয়াছে। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছ। এই দাসত্বতিলক কপালে লইয়া তোমরা আবার বড় বড় নেতা হইতে চাও? অতএব দাস-মনোভাব ছাড়িয়া দাও।

আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে। তোমরা আধ মাইল পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের মত সমুদ্র পার হইতে চাহিতেছ! তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে—কর্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? এ কি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ, আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবেন! এ কি তামাশা? এ-সব অর্থহীন বাজে কথা! আবশ্যক—

চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই-সব মানুষ ও পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পর বিবাদ না করিয়া প্রথমেই এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্মের ফলে কষ্ট পাইতেছ, এত কষ্টেও তোমরা চোখ খুলিবে না?

বিষয়টি এত বড়—কোথায় যে থামিব, তাহা জানি না। সুতরাং মান্দ্রাজে আমি যেভাবে কার্য করিতে চাই, দু-চার কথায় তাহা তোমাদের নিকট বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিব। আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এটি কি বুঝিতেছ? তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে কল্পনা করিতে হইবে—আলোচনা করিতে হইবে, ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, পরিশেষে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। যতদিন না তাহা করিতেছ, ততদিন এ জাতির মুক্তি নাই। তোমরা এখন যে-শিক্ষা পাইতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে; আর দোষগুলি এত বেশী যে, গুণভাগ নগণ্য হইয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে-কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়—মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। বালক স্কুলে গিয়া প্রথমেই শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আর্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সির ভিতরে মৌলিকচিন্তাযুক্ত একটি মানুষও পাওয়া যায় না। যিনি মৌলিকভাবপূর্ণ, তিনি অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন—এদেশে নয়; অথবা তিনি নিজেকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। মাথায় কতকগুলি তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে সেগুলি মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা

বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে-ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'—চন্দনভারবাহী গর্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না, ইত্যাদি।

যদি শিক্ষা বলিতে শুধু কতকগুলি বিষয় জানা বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানসমূহই তো ঋষি। সুতরাং আদর্শ এই হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে। অবশ্য ইহা একটি গুরুতর ব্যাপার—কঠিন সমস্যা। জানি না, ইহা কখনও কার্যে পরিণত হইবে কিনা। কিন্তু আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

কিভাবে আমাদের কাজ করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মান্দ্রাজের কথাই ধর। আমাদিগকে একটি মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে—কারণ হিন্দুগণ সকল কাজেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার, ঐ মন্দিরে কোন্ দেবতার পূজা হইবে—এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদ করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তাহার নিজেকে 'হিন্দু' বলিবার কোন অধিকার নাই। যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারে ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগী একটি মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ ঐ স্থানে

আসিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাঁহাদের নিজ নিজ মতসমূহ শিক্ষা দিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কেবল একটি বিষয়ে নিষেধ—অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মতবিরোধ থাকিলে বিবাদ করিতে পারিবে না। তোমার যাহা বক্তব্য আছে—বলিয়া যাও, জগৎ উহা শুনিতে চায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি-সম্বন্ধে তোমার কি মত, তাহা শুনিবার অবকাশ জগতের নাই, সেটি তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ এই মন্দিরের সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র থাকিবে। এখান হইতে যে-সকল শিক্ষক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। আমরা এখন যেমন দ্বারে দ্বারে ধর্ম প্রচার করিতেছি, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা দুই-ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। এই-সকল আচার্য ও প্রচারকগণের চেষ্টায় যেমন কার্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, অমনি এইরূপ আচার্য ও প্রচারকের সংখ্যাও বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে—যতদিন না আমরা সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারি। ইহাই আমার প্রণালী।

ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রয়োজন। তোমরা বলিতে পার, টাকা কোথায়? টাকার প্রয়োজন নাই; টাকায় কি হইবে? গত বারো বৎসর যাবৎ কাল কি খাইব, তাহার ঠিক ছিল না, কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক, সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তো ঐগুলির দাস নহি। আমি বলিতেছি,অর্থ ও অন্য সব নিশ্চয় আসিবে। জিজ্ঞাসা করি, মানুষ কোথায়? আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি;—মানুষ কোথায়?

হে মান্দ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, বাল্যকালে যেমন আমার ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই এখন আমি এই-সকল কঠিন কার্যসাধনে সমর্থ হইতেছি। তোমরা প্রত্যেকে

নিজের উপর এই বিশ্বাস রাখো যে, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। হাঁ, আমরা জগতের সকল দেশে যাইব, আর বিভিন্ন শক্তি-সহযোগে পৃথিবীতে যে-সব জাতি গঠিত হইতেছে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ভাব তাহাদের উপাদান-স্বরূপ হইবে। আমাদিগকে ভারতে বা ভারতের বাহিরে প্রত্যেকটি জাতির জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—আর এই অবস্থা আনিবার জন্য আমাদিগকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

ইহার জন্য আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'২৯—আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবকগণই ঈশ্বরলাভ করিবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারণ করিবার এই সময়—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে; কাজে লাগ—এই তো সময়। কারণ নবপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি তাহা গ্রহণ করেন। তবে ওঠ, ওকালতির চেষ্টা বা বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি অপেক্ষা বড় বড় কাজ রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প, সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। এই জীবনে আছে কি? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে মান্দ্রাজী যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা বলিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখনও নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, সে জড়বাদী হইয়াছে। কিন্তু তাহা দু-দিনের জন্য, এ ভাব তোমাদের মজ্জাগত নহে; তোমাদের ধাতে যাহা নাই; তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। উহা যে হইবার নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত; অতএব মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন এস, একটি মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক। সেই ভগবান্, যিনি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছেন, 'নিজ ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য আমি বার বার

ধরাধামে আবির্ভূত হই', সেই মহান্ কৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হউন।

# ১৬. দান-প্রসঙ্গে

[মান্দ্রাজে অবস্থানকালে স্বামীজী ‘চেন্নাপুরী অন্নদান-সমাজম্’ নামক এক দাতব্য ভাণ্ডারের সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন। বিশেষভাবে ব্রাহ্মণজাতিকে ভিক্ষাদান-প্রথা ঠিক নহে—পূর্ববর্তী বক্তা এই মর্মে বলিলে স্বামীজী বলেনঃ]

এই প্রথার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তা-সম্পত্তির রক্ষক। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দান-প্রথার তুলনা করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্যদেশের আইন দরিদ্রকে ‘গরীবখানায়’ (poorhouse) যাইতে বাধ্য করে; মানুষ কিন্তু খাদ্য অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে, সুতরাং সে গরীবখানায় না গিয়া সমাজের শত্রু—চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিস ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। ‘সভ্যতা’ নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই, সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্যদানেরও আবশ্যকতা থাকিবে। এখন হয় ভারতের মত নির্বিচারে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসিগণকে—তাঁহারা সকলে অকপট না হইলেও—আহার সংগ্রহ করিবার জন্য শাস্ত্রের দু-চারটি কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে; অথবা পাশ্চাত্যজাতির মত বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে-আইন ভিক্ষুককে চোর-ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।

মান্দ্রাজ হইতে স্বামীজী স্টীমারে কলিকাতা রওনা হন। খিদিরপুর হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনে অতি প্রত্যূষে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিলেন। প্রায় বিশ সহস্র লোক 'জয় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকী জয়' 'স্বামী বিবেকানন্দকী জয়' ধ্বনিতে স্বামীজীকে সংবর্ধনা করেন। যুবকগণ স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই লইয়া যায়। পথে রিপন কলেজে অল্পক্ষণ থাকিয়া স্বামীজী বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের ভবনে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হন এবং আলমবাজার মঠে অবস্থান করেন। এক সপ্তাহ পরে কলিকাতায় বিরাট অভিনন্দন-সভা আহূত হয়; শ্রোতৃ-সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

# ১৭. কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর

[১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিলে স্বামীজী বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। ২৬ ফেব্রুয়ারী শোভাবাজারে রাজবাটীতে কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ]

মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে—অতি দূরে পলাইয়া যায়; চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ—পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি সে নিজে যে সার্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।’ হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর৩০ অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মত সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মত সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে ‘ভাই’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহতি পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?’ আমি বলিলাম, ‘পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা

পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ।' ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার মনে আসিল না।

হে কলিকাতাবাসী আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতার কাজই করিয়াছ–অহো! হিন্দুভ্রাতারই কাজ। কারণ এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

এই চিকাগো ধর্মমহাসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্মমহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট শোন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল–নিজেদের প্রভুত্ব–প্রতিষ্ঠা করা। সেখানকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা। কার্যতঃ ফল তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইয়াছিল। বিধির বিধানে আর কিছু হইবার উপায়ই ছিল না। অনেকেই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা এই-আমার আমেরিকা-যাত্রা ধর্ম-মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, কাজেরও সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও উক্ত মহাসভার সভ্যগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ঠিক ঠিক বলিতে গেলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী সহৃদয় অতিথিবৎসল উন্নত মার্কিনজাতির প্রাপ্য–যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষরূপ বিকাশিত হইয়াছে। কোন মার্কিনের সহিত ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটিতে নিমন্ত্রন করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই মার্কিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-ইহাই তাঁহাদের পরিচয়। তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের

কর্ম নয়। আমার প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাঁহারা যে অপূর্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমার বহু বৎসর লাগিবে।

কিন্তু শুধু মার্কিনগণকে ধন্যবাদ দিলেই চলিবে না; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আটলাণ্টিকের অপরপারে সেই ইংরেজ জাতিকেও আমাদের সেরূপ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ইংরেজ জাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা পোষণ করিয়া কেহই কখনও ইংলণ্ডে পদার্পণ করে নাই; এই সভামঞ্চে যে-সকল ইংরেজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম—ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম—ঐ জাতির হৃৎস্পন্দন কোথায়, ততই তাহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজ জাতিকে এখন আমা অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। তাঁহাদের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধভাবও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানজনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের জানি না, তাঁহারাও আমাদের জানেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা—এমন কি চরিত্র-নীতি পর্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোন ইংরেজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান—এখানে দুঃখ-দারিদ্র্য অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতেছে, অমনি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, এ দেশে কোন ধর্ম থাকিতে পারে না; তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই সত্য। ইওরোপের শীতপ্রধান জলবায়ুর জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে সেখানে দারিদ্র্য ও পাপ একত্র অবস্থান করে—দেখা যায়, ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমার অভিজ্ঞতা এই—ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র, সে তত বেশী সৎপ্রকৃতি; কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের জাতীয়

জীবনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বিদেশী প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার লোক অল্পই আছেন। এখানে—কেবল এখানেই এমন এক জাতির বাস, যাহাদের নিকট 'দারিদ্র্য' বলিলে 'পাপ' বুঝায় না; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হয়। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগকেও পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি অতি ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার সবগুলিরই অর্থ আছে, সবগুলিরই ভাল দিক্ আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্বক ধৈর্যসহকারে ঐগুলি আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন; সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার বহু শতাব্দীর অতি মৃদুগতি ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলির গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও যেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারগুলি দেখিয়া উপহাস না করি, তাঁহারাও যেন আমাদের আচারগুলিকে বিদ্রূপ না করেন।

আমি এই সভায় আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয় দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরেজজাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়—তাঁহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের মস্তিষ্কে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়—উহা তাঁহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যায়, কখনও বাহির হয় না, আর ঐ জাতির অসীম কার্যকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে; অন্য কোন দেশে সেরূপ নহে। এই জাতির যেমন অপরিসীম কার্যকরী শক্তি, এই জাতির যেমন অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যকরী শক্তি বেশী। আর এই ইংরেজ-হৃদয়ের মূল উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীরে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস

লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? ইংরেজ বীরের জাতি, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা; ভাব কখনও না দেখানো—বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা এই শিক্ষা পাইয়াছেন। দেখিবেন, খুব কম ইংরেজ কখনও নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; পুরুষের কথা কেন, ইংরেজ নারীও কখনও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন না। আমি ইংরেজ নারীকে এমন কাজ করিতে দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে—এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হৃদয়ের ভাবধারার গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার সেখানে পৌঁছিতে পারেন, যদি ইংরেজের সহিত আপনার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি তাহার সহিত মেশেন, যদি একবার আপনার নিকট তাহাকে তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে ইংরেজ আপনার চিরবন্ধু—আপনার চিরদাস। এই জন্য আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম সুরের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত—সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্যই বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই মহামানবকে জানিতে পারে নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়া থাকি; এখন আমরা যে-আকারে সেই-সকল জীবনী পাই, সেগুলিতে বহু শতাব্দী যাবৎ শিষ্যপ্রশিষ্যগণের

পরিবর্তন-পরিবর্ধনরূপ লেখনীচালনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের জীবন তেমন নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার সেই প্রসিদ্ধ বাণী জানা আছেঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ‖
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ |
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ‖

যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি কথা তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয়টি এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপ একটি ধর্মের প্রবল বন্যা আসিবার পূর্বে সমাজের সর্বত্র ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-পরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি তরঙ্গ—প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়তো কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, যাহা কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গূঢ় শক্তিসম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, —সেটিই ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে এবং অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে বিপুল ও প্রবল হইয়া উহা মহাবন্যায় পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতিরোধ করিতে পারে না। এরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই দেখিবে; যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকে তবেই উহা গ্রহণ করিবে; যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হও, তবেই উহার সন্ধান পাইবে।

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না। দেখিতেছ না, সুদূর গ্রামে জাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্যসত্যই পূজিত হইতেছেন, যে-সকল দেশের লোকেরা বহু শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমাদের শক্তি, না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে; যে-শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি। কারণ তুমি আমি, সাধু মহাপুরুষ, এমন কি অবতারগণ সকলেই—সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশমাত্র; সেই শক্তি কোথাও বা কম, কোথাও বা বেশী ঘনীভূত, পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে; বোধ হয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি সমাজসংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই ধর্মের ভিতর দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, যে-মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, আমরা যেন তাহার পরিবর্তে অপর একটি মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম; যদি আমরা কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়, তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে যেভাবেই লও, তাহা আমি গ্রাহ্য করি

না। তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে যত মহাশক্তির বিকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য। অহো, জগতের কোন দেশে সার্বভৌম ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন এক ব্যক্তি বাস করিতেন, যাঁহার সমগ্র জীবনই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলকেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য-জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখনও ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শই পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি বা অপর যে-কেহ প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে স্থাপন করিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তাহা তোমাদের এখনই স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক—তোমরা

যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ, অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, তন্মধ্যে ইঁহার জীবন শুদ্ধতম। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতেছ যে, এরূপ অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা তো কখনও পাঠও কর নাই, দেখিবার আশা তো দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।

এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তাঁহার বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। তাঁহার চরিত্র এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারিব না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যিনি সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন, আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন; আমরা কিছু করি বা না করি—তথাপি যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তিনি তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, সে-জন্য প্রভুর কাজ আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কাজের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কাজ করা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

এইরূপে চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকে। তোমরা বলিয়াছ, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ, আমাদিগকে তাহা করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয়তো খুব বড় হইতে পারে, তোমাদের অনেকে এ-কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিতে পার, তথাপি ইহাই আমাদের আদর্শ হইবে। আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে

হইবে, নতুবা মরিতে হইবে; ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের বিস্তার করিতে হইবে; আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে; নতুবা আমরা অতি হীন অবস্থায় পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের মধ্যে একটা কর—হয় বাঁচো, না হয় মর।

সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশে কলহের কথা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু আমার কথা শোন, ইহা সব দেশেই আছে। রাজনীতি যে-সকল জাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই-সকল জাতি আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সূচনা করে, অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে, কিন্তু উহা থামাইবার কোন বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সব জাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে নিবদ্ধ সত্যসমূহের প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে একটি অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি অন্য কোন প্রমাণ চাও? তোমাদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি-ঘেঁষা, তাহাদিগকেই আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। অদ্যকার সভাই যে এ-বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ এই-সব স্বার্থের বিচার ছাড়িয়া দিলেও আমাদের পিছনে নিঃস্বার্থ মহান্ জীবন্ত দৃষ্টান্তসকল রহিয়াছে। ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মত খোলার ভিতর ঢুকিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে নাই। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহা আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। অতীত কালে যদি ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখা গিয়া থাকে, তবে জানিবেন—এখন মহা বন্যা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে, কারণ আদান-প্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া সব জিনিষ—এমন কি ধর্ম পর্যন্ত শিখিব? অবশ্য তাহাদের নিকট আমরা কলকব্জা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক বিষয় শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে; আমরা তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্য জগৎ অপেক্ষা করিতেছে। পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, তাহার দিকে জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি বহু শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যেও যে-আধ্যাত্মিকতা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকাররূপে লব্ধ সেই অপূর্ব রত্নরাজির জন্য ভারতের বাহিরে যে কতখানি আগ্রহ, তাহা তোমরা কিছুই জান না। আমরা এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি—এখন এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া একটা জাতীয় দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভারতে যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু পান করিবার জন্য ভারতের বাহিরে লক্ষ লক্ষ নরনারী কত আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতেই হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অধ্যাত্ম-জগতের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত বিষয়গুলি শিক্ষা করিব। চিরকাল শিষ্য হইয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমভাবাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না; আর যখন একদল লোক সর্বদাই আচার্যের আসন গ্রহণ করে এবং অপর দল সর্বদাই তাহাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে কখনও সমভাব

আসিতে পারে না। যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে উহাদের নিকট যেমন শিখিতে হইবে, তেমনি তাহাদিগকে শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন এই কাজ করিতেই হইবে।

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি—বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিষ, কিন্তু এগুলি বেশীদূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব বাঙালীর দ্বারা—ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই ঐ কার্য সাধিত হইবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—উঠ, জাগো, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাক, ক্ষান্ত হইও না।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ'—এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ—জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমি এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমা অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পার। উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি

বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছ—টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদগুলির মধ্যে অতি মনোরম কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের অবশ্যই স্মরণ আছেঃ এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিষ দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা কঠিন; এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধা জাগিবামাত্রই নচিকেতার মনে হইল—আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, অধম আমি কখনই নহি; আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে-সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন; যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যম-সদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে—ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্যজাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধারই ফলে; তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে।

তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ একবাক্যে যাহা প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার আত্মায় বিশ্বাসী হও—যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন—সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সব শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব আমি চাই—এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস; আর এই বিশ্বাস- অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।

আমি তো এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য লোপ পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং কার্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার হইবে যে, যাহা আমি কখনও কল্পনাও করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার

তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যত কিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে, জগতে যত বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে-মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার; নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে কেবল বলিতে পারি—আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের, সর্বোপরি আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় লাগিতে পারি।

# ১৮. সর্বাবয়ব বেদান্ত

[কলিকাতা স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত বক্তৃতা]

দূরে—অতি দূরে—লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি ঐতিহ্যের ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্যন্ত যেখানে প্রবেশ করিতে অসমর্থ—অনন্তকাল স্থিরভাবে এই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে কখনও কিছুটা ক্ষীণ, কখনও অতি উজ্জ্বল, কিন্তু চিরকাল অনির্বাণ ও স্থির থাকিয়া শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের ভাবরাজ্যে উহার পবিত্র রশ্মি, নীরব অননুভূত, শান্ত অথচ সর্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি বিকিরণ করিতেছে; ঊষাকালীন শিশিরসম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে—ইহাই উপনিষদের ভাবরাশি, ইহাই বেদান্তদর্শন। কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল। অনুমান-বলে এ তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পরবিরুদ্ধ যে, এগুলির উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানব যাহা কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই জ্যোতির সমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে বেদান্তজ্ঞানের তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া কখনও পূর্বে কখনও পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গের প্রবাহ পশ্চিমে এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও এণ্টিওকে (Antioch) যাইয়া গ্রীকদিগের চিন্তায় গতি শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল।

সাংখ্যদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। সাংখ্য ও ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম বা দার্শনিক মত উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতেও প্রাচীন বা আধুনিক কালে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও ইহাদের সবগুলিই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অথবা অন্য কোন

প্রকারের অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, অথবা তুমি যে-নামেই নিজেকে অভিহিত কর না কেন, তোমার শাস্ত্র উপনিষদ্ই প্রমাণস্বরূপ তোমার পিছনে রহিয়াছে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে 'সনাতন'-মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। জৈন—বিশেষতঃ বৌদ্ধ মত উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিদূরিত হইয়াছিল; অতএব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র উৎস। আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, সেই অনন্তশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থবৃক্ষরূপ হিন্দুধর্ম বেদান্তের প্রভাব-দ্বারা সম্পূর্ণ অনুস্যূত। আমরা জানি বা নাই জানি—বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ আমরা বেদান্তের উপাসক; আর প্রত্যেক হিন্দু বেদান্তেরই সাধনা করে।

অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্ত প্রচার করা আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু যদি কিছু প্রচার করিতে হয়, তবে তাহা এই বেদান্ত। বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়া চলা উচিত বটে, কিন্তু এই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই। উপনিষদ্- সমূহের মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে, অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্যন্ত তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিগণ পর্যন্ত পরস্পর মতভেদহেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক সময়ে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা একটি চলিত বাক্য হইয়া গিয়াছিল—যাঁহার মত অপরের মত হইতে ভিন্ন নহে, তিনি মুনিই নহেন—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং না ভিন্নম্।' কিন্তু এখন ও-রূপ বিরোধে আর চলিবে না। উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমন্বয়ভাব রহিয়াছে, এখন তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা জগতের কাছে স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে।

ঈশ্বর-কৃপায় আমার এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাস্বরূপ—যাঁহার জীবন তাঁহার উপদেশ অপেক্ষা সহস্রগুণে উপনিষদ্‌মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ; বস্তুতঃ তিনি ছিলেন উপনিষদের ভাবগুলির মূর্ত বিগ্রহ। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছুটা আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের কাছে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কিনা; কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পস্পরবিরোধী নহে, পরস্পরসাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান-স্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত, ইহা দেখানোই আমার জীবনব্রত।

এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতে কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্চনা এখনও ঐ বেদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে; তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুশাসন অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সেই সব স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রম-সন্নিবেশ অধিকাংশস্থলে বেদানুযায়ী নহে, তন্ত্র বা পুরাণ অনুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী, এই অর্থে আমাদিগকে 'বৈদিক' নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না; কিন্তু আমরা সকলেই যে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। 'হিন্দু' নামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে 'বৈদান্তিক' আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই বৈদান্তিক-নামে অভিহিত হইতে পারে।

বর্তমান কালে ভারতে যে-সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় যে সামান্য মতভেদের উপর অধিক ঝোঁক দেন এবং সেগুলির উপর নির্ভর

করিয়া 'বিশুদ্ধাদ্বৈত', 'বিশিষ্টাদ্বৈত' প্রভৃতি নূতন নূতন নাম গ্রহণ করিতে চান, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কতকগুলি নূতন, কতকগুলি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের নূতন সংস্করণ। মোটের উপর উহাদিগকে হয় দ্বৈতবাদী, না হয় অদ্বৈতবাদী—এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়। রামানুজের জীবন ও তাঁহার দর্শনকে দ্বৈতবাদের এবং শঙ্করাচার্যকে অদ্বৈতবাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামানুজ পরবর্তী কালে ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক; অন্যান্য দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়গুলি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার উপদেশাবলীর সারাংশ, এমন কি—সম্প্রদায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলী পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ ও তাঁহার প্রচারকার্যের সহিত ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া আশ্চর্য হইবে—উহাদের পরস্পরের উপদেশ, সাধনপ্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কতদূর সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার্যপ্রবর মধ্বমুনি এবং তাঁহার অনুবর্তী—আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্যাচার্যের মত-ই বাঙলা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে, যথা—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অদ্বৈতবাদী; সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই অদ্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ 'বিষ্ণু' নামের পরিবর্তে 'শিব' নাম বসাইয়াছেন মাত্র, আর জীবাত্মার পরিণামবিষয়ক মতবাদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ববিষয়েই রামানুজ-মতাবলম্বী। রামানুজের মতানুবর্তিগণ আত্মাকে 'অণু' অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুবর্তিগণ তাঁহাকে 'বিভু' অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীনকালে অদ্বৈত-মতানুবর্তী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যেগুলিকে শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করিয়াছে। কোন কোন বেদান্তভাষ্যে বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে শঙ্করের উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাপি শঙ্করের মায়াবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্পষ্টই

বোধ হয়, এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহারা এই মায়াবাদ স্বীকার করিত না; এমন কি তাহারা শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করানো হইয়াছে। যাহাই হউক, বর্তমান কালে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী, আর শঙ্করাচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য—উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের প্রভাব আমাদের বাঙলা দেশ, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বেশী বিস্তৃত হয় নাই; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে স্মার্তগণ সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী; আর বারাণসী অদ্বৈতবাদের একটি কেন্দ্র বলিয়া আর্যাবর্তের অনেক স্থলে তাঁহার প্রভাব খুবই বেশী।

এখন আর একটি কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামানুজ—কেহই নিজেকে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন নাই। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, তিনি বোধায়ন-ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে' ইত্যাদি কথা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাষ্য আমার কখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আমি সমগ্র ভারতে ইহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে উক্ত ভাষ্যের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোকগত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাসসূত্রের বোধায়ন-ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্য মানিতেন না; আর যদিও সুবিধা পাইলেই রামানুজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু তিনি নিজেই কখনও বোধায়ন-ভাষ্য সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। রামানুজ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাব, স্থানে স্থানে ভাষা পর্যন্ত লইয়া তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভাষ্যের কয়েক স্থলে প্রাচীনতর ভাষ্যসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন তাঁহার গুরু এবং গুরুর গুরু তাঁহার মতই অদ্বৈত-মতাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন, বরং সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষাও অদ্বৈততত্ত্ব-প্রকাশে অধিকতর অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কিছু নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। রামানুজ

যেমন বোধায়ন-ভাষ্য অবলম্বনে তাঁহার ভাষ্য লিখিয়াছেন, শঙ্করও ঐরূপ কাজই করিয়াছিলেন, তবে কোন্ ভাষ্য-অবলম্বনে তিনি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় এখন নাই।

তোমরা যে-সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা যেগুলি দেখিয়াছ, উপনিষদ্ই সে-গুলির ভিত্তি। যখনই তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য দর্শনও উপনিষদ্ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনের ন্যায় আর কোন দর্শনই ভারতে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্যদর্শনের চরম পরিণতিমাত্র। আর সমগ্র ভারতের, এমন কি সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক্ দিয়া ভারতের ইতিহাসে কপিলেরই নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জগতে সর্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেইখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। কোন মত সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে, তথাপি তাহাতে কপিলের—সেই তেজস্বী মহামহিমময় অপূর্ব প্রতিভাসম্পন্ন কপিলের প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের অধিকাংশ—অতি সামান্য পরিবর্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বাঙলার নৈয়ায়িকগণ ভারতীয় দর্শন-জগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি তুচ্ছবিষয় এবং গুরুভার পারিভাষিক শব্দনিচয়—যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়—লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদান্তিকদের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয়া নিজেরা 'ন্যায়' লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের বিচার-প্রণালী-সম্বন্ধীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার মত মালাবার দেশেরও কোন কোন নগরে সুপরিচিত। এই তো গেল অন্যান্য দর্শনের কথা; ব্যাসপ্রণীত বেদান্তদর্শন—'ব্যাসসূত্র' কিন্তু ভারতে সর্বত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, আর উহার যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকভাবে বিবৃত করা, তাহা সাধন করিয়া ভারতে উহা স্থায়িত্বলাভ

করিয়াছে। এই বেদান্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে; শঙ্করাচার্যও এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার সূত্র-প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য—বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূহকে এক সূত্রে গাঁথিয়া একটি মালা প্রস্তুত করা। তাঁহার সূত্রগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু সেগুলি উপনিষদের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহার অধিক নহে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এখন এই ব্যাসসূত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। আর এদেশে যে-কোন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাসসূত্রের একটি নূতন ভাষ্য লিখিয়া সম্প্রদায় পত্তন করে। সময় সময় এই ভাষ্যকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতভেদ দেখা যায়, সময় সময় মূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক সেই ব্যাসসূত্র এখন ভারতে প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থের আসন গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাসসূত্রের উপর একটি নূতন ভাষ্য না লিখিয়া ভারতে কেহই সম্প্রদায়-স্থাপনের আশা করিতে পারে না। ব্যাসসূত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য গীতার প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার মহৎ জীবনে যে-সকল বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে গীতাপ্রচার ও গীতার সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ ভাষ্য প্রণয়ন অন্যতম। ভারতের সনাতন-পন্থাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই পরবর্তী কালে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া গীতার এক-একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন।

উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টই আধুনিক, যথা—আল্লোপনিষদ্। উহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে 'রজসুল্লা' বলা হইযাছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন-সাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। সংহিতাভাগে আল্লা বা ইল্লা অথবা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষদ্সমূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপে এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ 'রজসুল্লা' হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক, এই-জাতীয় আরও অনেকগুলি

সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, এগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক, আর এইরূপ উপনিষদ্ রচনা বড় কঠিনও ছিল না। কারণ বেদের সংহিতাভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, ইহাতে ব্যাকরণের বড় বাঁধাবাঁধি ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত 'পাণিনি' এবং 'মহাভাষ্য' পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু পাঠে কিছুটা অগ্রসর হইবার পর দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবল ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমূহের ব্যতিক্রম-মাত্র। ব্যাকরণের একটি সাধারণ বিধি করা হইল, তারপরেই বলা হইল—বেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। সুতরাং দেখিতেছ, যে-কোন ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে। কেবল যাস্কের 'নিরুক্ত' থাকাতেই একটু রক্ষা। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি সমার্থক শব্দের সন্নিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, সেখানে তোমার যত ইচ্ছা উপনিষদ্ রচনা করিতে পার। একটু সংস্কৃতজ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গোটাকতক শব্দ রচনা করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের তো আর কোন ভয় নাই, তখন রজসুল্লাই হউক বা যে-কোন সুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে পার। এইরূপে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে; আর শুনিয়াছি—এখনও হইতেছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এইভাবে নূতন উপনিষদ্ রচিত হইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, যেগুলি স্পষ্টই খাঁটি জিনিষ বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেইগুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই উপনিষদের আর দু-একটি তত্ত্বসম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ উপনিষদ্‌সমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র, আর ঐ-সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইবে, একটি বক্তৃতায় কিছুই হইবে না। এই কারণে উপনিষদের আলোচনায় যে-সকল বিষয় আমার মনে উদিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে শুধু দু-একটি বিষয় তোমাদের নিকট বলিতে চাই। প্রথমতঃ জগতে ইহার ন্যায় অপূর্ব কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার ‘নাসদীয় সূক্ত’-এর বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়াবস্থা-বর্ণনার সেই শ্লোক আছেঃ তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি। ‘যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল’—এটি পড়িলে এই উপলব্ধি হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভারতের বাহিরে এবং ভারতের ভিতরেও গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতের বাহিরে এই চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাব-বর্ণনার আকার ধারণ করিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। যখনই মিল্টন বা দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইওরোপীয় কবি অনন্তের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার কবিত্বের পক্ষসহায়ে নিজের বাহিরে সুদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে। বেদসংহিতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেমন অপূর্বভাবে চিত্রিত হইয়া পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে, তেমনভাবে আর কোথাও হয় নাই। সংহিতার এই ‘তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্’ বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া তিন জন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন, ‘সূচীভেদ্য অন্ধকার’, মিল্টন বলিতেছেন, ‘আলোক নাই, দৃশ্যমান অন্ধকার।’ কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতা বলিতেছেন, ‘অন্ধকার—অন্ধকারের দ্বারা আবৃত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুক্কায়িত।’ গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। যখন হঠাৎ নূতন বর্ষাগম হয়, তখন সমগ্র দিগ্বলয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সঞ্চরণশীল শ্যাম মেঘপুঞ্জ ক্রমশঃ অন্য মেঘরাশি আচ্ছন্ন করিতে থাকে। যাহা হউক, সংহিতার এই কবিত্ব অতি অপূর্ব বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অন্যত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা মানবজীবনের মহান্ সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক বা আধুনিক ইওরোপীয়গণ যেমন বহির্জগৎ অনুসন্ধান করিয়া জীবনের এবং পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক সকল সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণও ঐরূপ করিয়াছিলেন, আর ইওরোপীয়গণের ন্যায় তাঁহারাও বিফল হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ এ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করিল না; যেখানে

ছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল। বহির্জগতে জীবন-মরণের বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না; আমাদের পূর্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়া জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জগতের নিকট নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেন।

উপনিষদ্ নির্ভীকভাবে বলিলেনঃ

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’ ৩১
‘ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি।’ ৩২

মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না। এইরূপ বহু বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য আত্মাভিমুখী হইলেন—অন্তর্মুখী হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাঁহারা কখনই সত্য লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা দেখিলেন, বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাদিগকে কোন আশার বাণী শোনায় না, সুতরাং তাঁহারা উহা হইতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে ছাড়িয়া সেই জ্যোতির্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন; সেখানে তাঁহারা উত্তর পাইলেনঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।৩৩ একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।

তাঁহারা আত্মাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন; তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে জানিলেন এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ—সকলই অবগত হইলেন। আর এই আত্মতত্ত্বের বর্ণনার মত গাম্ভীর্যপূর্ণ কবিতা জগতে আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না; এমন কি আত্মার

বর্ণনায় নির্দিষ্ট গুণবাচক শব্দ তাঁহারা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন আর অনন্তের ধারণা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা-লাভের চেষ্টা রহিল না। বাহ্য ইন্দিয়গ্রাহ্য অচেতন মৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনন্তের বর্ণনা লোপ পাইল; তৎপরিবর্তে আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে, উপনিষদের সেই শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রই যেন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অপূর্ব শ্লোকটির কথা স্মরণ করঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ||৩৪

সূর্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও দেয় না, এই বিদ্যুৎ তাঁহাকে আলোকিত করিতে পারে না, এই অগ্নির আর কথা কি? জগতে আর কোন্ কবিতা ইহা অপেক্ষা গম্ভীরভাবদ্যোতক?

এইরূপ কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপূর্ব কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটি কি অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর! ইহাতে কি বিস্ময়কর কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে! ইহার আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমপুরীতে যাইবার ইচ্ছা, আর সেই 'আশ্চর্য' তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে?—মৃত্যু-রহস্য।

উপনিষদ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, যে বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা এই—ঐগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। যদিও আমরা উহাতে অনেক আচার্য ও বক্তার নাম পাইয়া থাকি, তথাপি তাঁহাদের কাহারও বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণিকতা নির্ভর করে না। একটি মন্ত্রও তাঁহাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভর করে না। এই-সকল আচার্য ও বক্তা যেন ছায়ামূর্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সত্তা যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ব মহিমময়

জ্যোতির্ময় তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর—ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। বিশজন যাজ্ঞবল্ক্য থাকুন বা না থাকুন—কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি তো রহিয়াছে। তথাপি উপনিষদ্ কোন ব্যক্তিভাবের বিরোধী নহে। জগতে প্রাচীনকালে যে-কোন মহাপুরুষ বা আচার্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা ভবিষ্যতে যাঁহাদের হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাঁহাদের সকলেরই স্থান হইতে পারে। উপনিষদ্ ব্যক্তি-উপাসনার, অবতার বা মহাপুরুষ-পূজার বিরোধী নহে, বরং উহার পক্ষে। অপরদিকে উপনিষদ্ আবার সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। উপনিষদের ঈশ্বর যেমন ব্যক্তিভাবের ঊর্ধ্বে, তেমনি সমগ্র উপনিষদই ব্যক্তি- নিরপেক্ষ অপূর্ব ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যতটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাব আশা করেন, জ্ঞানী চিন্তাশীল দার্শনিক ও যুক্তিবাদিগণের নিকট এই উপনিষদ্ ততটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

আর ইহাই আমাদের শাস্ত্র। তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, খ্রীষ্টানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুসলমানদের পক্ষে যেমন কোরান, বৌদ্ধদের যেমন ত্রিপিটক, পারসীদের যেমন জেন্দাবেস্তা, আমাদের পক্ষে উপনিষদও সেইরূপ। এইগুলি—একমাত্র এইগুলিই আমাদের শাস্ত্র। পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ, এমনি কি ব্যাসসূত্র পর্যন্ত প্রামাণ্য বিষয়ে গৌণমাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ উপনিষদ্। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতির যতটুকু উপনিষদের সহিত মেলে, ততটুকুই গ্রহণীয়; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ নির্দয়ভাবে পরিত্যাজ্য। আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু ভারতের দূরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমানে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। তুচ্ছ গ্রাম্য আচার এখন উপনিষদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। বাঙলার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে হয়তো কোন বিশেষ আচার ও মত প্রচলিত, সেইটি যেন বেদবাক্য, এমন কি তদপেক্ষা অধিক। আর 'সনাতন-মতাবলম্বী'—এই কথাটির কি অদ্ভুত প্রভাব!কর্মকাণ্ডের নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যে পালন করে, একজন গ্রাম্যলোকের নিকট সে-ই খাঁটি সনাতনপন্থী, আর যে নিয়মগুলি পালন না করে, সে হিন্দুই নয়। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমার মাতৃভূমিতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন তন্ত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতে চলিতে উপদেশ দেন; যে না

চলে, সে তাঁহাদের মতে খাঁটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন এইটি স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ্য ও শ্রৌত-সূত্র পর্যন্ত বেদ-প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ্ আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণের বাক্য, আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যাহা খুশি তাহা বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। ঐগুলিকে ‘শাস্ত্র’ আখ্যা না দিয়া ‘পুরাণ’ বলাই উচিত, কারণ ঐগুলিতে জল-প্লাবনের কথা, রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি পুরাণের লক্ষণ, সুতরাং যতটা বেদের সহিত মিলে, ঐগুলির মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র যতটা বেদের সহিত মিলে. ততটাই গ্রাহ্য; যেখানে না মিলে, সেই অংশ মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরান সম্বন্ধেও এই কথা। এই-সকল গ্রন্থে অনেক নীতি-উপদেশ আছে; সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা ঐক্য হয়, ততটা পুরাণবৎ প্রামাণিক, অবশিষ্টাংশ পরিত্যাজ্য।

বেদ-সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক খ্রীষ্টান মিশনারী আমাকে এক সময় বলিয়াছিল, তাহাদের বাইবেল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলামঃ আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বলিয়াই উহা সত্য। তোমাদের শাস্ত্র যখন ঐতিহাসিক, তখন নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্বে উহা কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যপ্রণীত, আমাদের শাস্ত্র ঐরূপ নহে। আমাদের শাস্ত্রের অনৈতিহাসিকতাই উহার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদের সহিত আজকালকার অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের এই সম্বন্ধ।

উপনিষদে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এখন আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাতে নানাবিধ ভাবের শ্লোক দেখা যায়; কোন কোনটি পুরাপুরি দ্বৈতবাদাত্মক। দ্বৈতবাদাত্মক বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিতেছি? কতকগুলি বিষয়ে ভারতের সকল

সম্প্রদায় একমত। প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই 'সংসারবাদ' বা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়েরই একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূলশরীর, ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর বা মন; জীবাত্মা সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্মার মধ্যে কিছু প্রভেদ করা হয় নাই, কিন্তু এখানে তাহা নহে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের মতে মন বা অন্তঃকরণ যেন জীবাত্মার যন্ত্রস্বরূপ। ঐ যন্ত্রসহায়ে উহা শরীর ও বাহ্য জগতের উপর কাজ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেই একমত। বিভিন্ন সম্প্রদায় ইঁহাকে জীব, আত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে, জীবাত্মা অনাদি অনন্ত; যতদিন না শেষ মুক্তিলাভ হয়, ততদিন তিনি পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

আর একটি মুখ্য বিষয়ে ভারতের সকল সম্প্রদায়ই একমত এবং তাঁহারা স্বীকার করেন, জীবাত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি নিহিত আছে; আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মৌলিক প্রভেদ। 'ইন্‌স্পিরেশন' (inspiration)-শব্দ দ্বারা ইংরেজীতে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে বুঝায় যেন বাহির হইতে কিছু আসিতেছে; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে সকল শক্তি, সর্ববিধ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই রহিয়াছে। যোগীরা বলিবেন, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি, যাহা তিনি লাভ করিতে চান, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, ঐগুলি পূর্ব হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান, ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র। পতঞ্জলির মতে তোমার পদতলচারী অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ আধার অনুপযুক্ত বলিয়া ঐগুলি প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। উন্নততর শরীর পাইলেই সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে, কিন্তু সেগুলি পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। তিনি তাঁহার সূত্রের একস্থলে বলিয়াছেন, 'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।'৩৫—যেমন ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে কৃষককে কেবল তাহার ক্ষেত্রের আল ভাঙিয়া দিয়া নিকটস্থ জলাশয়ের সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জল যেমন নিজ বেগে আসিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তেমনি জীবাত্মাতে সকল শক্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতা পূর্ব হইতে বিদ্যমান, কেবল মায়াবরণের জন্য উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে

না। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করেন এবং তাঁহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্যগণ এই ভয়ানক মত শিখাইয়া থাকে যে, আমরা সকলেই জন্মপাপী। আর যাহারা এইরূপ ভয়াবহ মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি তাহারা অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা কখনও ভাবিয়া দেখে না—যদি আমরা স্বভাবতঃ মন্দই হই, তবে আর আমাদের ভাল হইবার আশা নাই, কারণ স্বভাব বা প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে? 'প্রকৃতির পরিবর্তন হয়'—এই বাক্যটি স্ববিরোধী। যে বস্তুর পরিবর্তন হয়, তাহাকে আর 'প্রকৃতি' বলা যায় না। এই বিষয়টি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত।

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর একটি বিষয়ে একমত—ঈশ্বরের অস্তিত্ব। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন। দ্বৈতবাদী সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমি এই 'সগুণ' কথাটি তোমাদিগকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। এই 'সগুণ' বলিতে দেহধারী সিংহাসনে উপবিষ্ট জগৎশাসনকারী পুরুষবিশেষকে বুঝায় না। 'সগুণ' অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তারূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সগুণ ঈশ্বরের উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উহাকে 'সগুণ-নির্গুণ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। অদ্বৈতবাদী তাঁহার প্রতি 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন; কিন্তু উপনিষদসমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে একমত।

এখন দ্বৈতবেদীদের মত একটু আলোচনা করিব। পূর্বেও বলিয়াছি, এ-যুগে রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মহান্ প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের জনসাধারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় ধর্মাচার্যগণ সম্বন্ধে অতি অল্পই সংবাদ রাখে। সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এক আমাদের শ্রীচৈতন্য ব্যতীত মহান্ ধর্মাচার্যগণ সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যবাসীর মস্তিষ্কই এখন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে। এমন কি চৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্যেরই মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

রামানুজের মতে নিত্য 'পদার্থ' তিনটি—ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। জীবাত্মাসকল নিত্য, আর চিরকালই পরমাত্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে, তাহাদের স্বতন্ত্রত্ব কখনও লোপ পাইবে না। রামানুজ বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্মা হইতে চিরকাল পৃথক্ থাকিবে। আর এই জগৎপ্রপঞ্চ—এই প্রকৃতিও চিরকালই পৃথক্‌রূপে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জগৎপ্রপঞ্চও সেইরূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, আর এই অর্থে রামানুজ কখনও কখনও পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন—জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কুচিত হয়, তখন জীবাত্মাসকলও সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন ঐভাবে অবস্থান করে। পরবর্তিকল্পের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। রামানুজের মতে যে-কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পূর্ণত্ব সঙ্কুচিত হয়, তাহাই অসৎকর্ম; আর যাহা দ্বারা আত্মা বিকশিত হয়, তাহাই সৎকার্য। যাহা আত্মার বিকাশের সহায়তা করে, তাহাই ভাল; আর যাহা উহার সঙ্কোচসাধন করে, তাহাই মন্দ। এইরূপে কর্মবশে আত্মার কখনও সঙ্কোচ, কখনও বিকাশ হইতেছে; অবশেষে ঈশ্বর-কৃপায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রামানুজ বলেন, যাহারা শুদ্ধস্বভাব এবং ঐ ঈশ্বরের কৃপালাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা সকলেই কৃপা লাভ করে।

শ্রুতিতে একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।' যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, এবং সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর-স্মরণ অথবা

অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটি লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই—'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি, সাংখ্যদর্শন-মতে এবং ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই এ-কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে গঠিত হইয়াছে—ত্রিবিধ গুণে নহে। সাধারণ লোকের ধারণা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণ, কিন্তু তাহা ঠিক নহে; ঐগুলি জগতের উপাদান-কারণ। আর আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব-পদার্থ নির্মল হইবে। কিভাবে সত্ত্ব শুদ্ধ হইবে, তাহাই বেদান্তের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, আর বেদান্তমতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব-পদার্থ অতিশয় প্রকাশস্বভাব এবং যেমন আলোক সহজেই কাচের ভিতর দিয়া যায়, আত্মচৈতন্যও তেমনি সহজেই সত্ত্ব-পদার্থের ভিতর দিয়া যায়। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হইয়া কেবল সত্ত্বটুকু অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধতা প্রকাশিত হইবে এবং তিনি তখন অধিক পরিমাণে ব্যক্ত হইবেন। অতএব এই সত্ত্ব লাভ করা অতি আবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্ব-লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। রামানুজ এই 'আহার' শব্দ খাদ্য-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাকে তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বন ও স্তম্ভ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার-শব্দের অর্থ কি, এইটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ 'জাতিদোষ'—খাদ্যের জাতি অর্থাৎ প্রকৃতিগত দোষ, যথা—পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি স্বভাবতই অশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ 'আশ্রয়দোষ'—যে-ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে-ব্যক্তিকে 'আশ্রয়' বলে; মন্দ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি, যাঁহারা সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের এই ক্ষমতা ছিল—তাঁহারা যে-ব্যক্তি খাদ্য আনিয়াছে, এমন কি যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন, এবং আমি

নিজ জীবনে একবার নয়, শতবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ নিমিত্তদোষ– খাদ্যদ্রব্যে কেশ কীট আবর্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে খাদ্যের 'নিমিত্তদোষ' বলে। আমাদিগকে এখন এই শেষ দোষটি নিবারণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহার-ব্যাপারে এই দোষটি বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদোষমুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে।

তবে তো ধর্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম হয়, তবে সকলেই তো ইহা করিতে পারে। জগতে এমন কে দুর্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে নিজেকে এই দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য এই আহার-শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাক। তিনি বলেন, 'আহার' শব্দের অর্থ– ইন্দ্রিয়দ্বারা মনে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়। চিন্তাগুলি নির্মল হইলে সত্ত্ব নির্মল হইবে, তাহার পূর্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার। যদি শুধু পবিত্র ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কিনা! এরূপ হইলে তো গাভী হরিণ প্রভৃতিই সকলের আগে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত।

'নিত নহ্‌নেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই,
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই,
তিরন ভখনসে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।'৩৬ ইত্যাদি

যাহা হউক এই সমস্যার সমাধান কি?–উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য শঙ্করাচার্য আহার-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজন বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। দুই-ই চাই। তবে গোল এইটুকু দাঁড়াইয়াছে যে, বর্তমানকালে আমরা শঙ্করাচার্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া শুধু 'খাদ্য' অর্থটি লইয়াছি। এই জন্যই যখন আমি বলি–ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি মান্দ্রাজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। এ-বিষয়ে তোমরা বাঙালীরা তাহাদের চেয়ে অনেক ভাল। মান্দ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা সেই খাদ্য ফেলিয়া দিবে। তথাপি সেখানকার

লোকেরা এইরূপ খাদ্যাখাদ্য-বিচারের দরুন যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এরূপ বা ওরূপ খাদ্য খাইলেই, এর-তার দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচিলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে মান্দ্রাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাহা নহে। অবশ্য আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মান্দ্রাজী বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উভয় মত একত্র করিলেই একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও 'উল্টা বুঝিলি রাম' করিও না। আজকাল এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব রব উঠিয়াছে। আর এ বিষয়টি লইয়া বাঙালীরাই সর্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেছে। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কি জান, বল দেখি। এ দেশে এখন সেই চাতুর্বর্ণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি চাতুর্বর্ণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, 'মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা', এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রচারের চেষ্টাও সেইরূপ। এখানে তো চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায়?—হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদপাঠ করিতে আদেশ করেন না? আর যদি এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রানুসারে যে-দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়। অতএব তল্পিতল্পা বাঁধিয়া এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। যাহারা ম্লেচ্ছখাদ্য আহার করে এবং ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জান? তোমরা তো বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ম্লেচ্ছখাদ্য আহার ও ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জান? ইহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। তোমরা আচার্যের আসন গ্রহণ করিতে চাও, কিন্তু কার্যে কেন কপটাচারী হও? তোমরা যদি তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাও সেই ব্রাহ্মণবরিষ্ঠের মত হও—যিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ম্লেচ্ছখাদ্য-ভোজনের জন্য নিজেকে তুষানলে দগ্ধ করেন। এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্রজাতি তোমাদের পদতলে আসিয়া পড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের

শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না—আবার অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাও! যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে ও-রূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তোমরা সমর্থ নও, তবে তোমাদের দুর্বলতা স্বীকার কর এবং অপরের দুর্বলতা ক্ষমা কর, অন্যান্য জাতির উন্নতির জন্য যতদূর পার সহায়তা কর, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দাও এবংতাহারাও আর্যদের মত হউক। আর হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি আপনাদিগকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি আপনারা প্রকৃত আর্য হউন।

যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান বিশেষভাবে দেখ নাই। তোমরা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি স্বদেশে প্রবেশ করি—যখন আমি দেখি, আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তখন এ দেশ আমার কাছে অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার-সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙলা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করে এবং অতি ভয়ানক গ্রন্থসকল তাহাদের কার্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশেই তাহারা এমন সব বীভৎস কাজ করিয়া থাকে। বাঙলা দেশের অধিবাসীগণ, তোমরা সকলেই ইহা জান। বামাচার-তন্ত্রগুলিই বাঙালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্র রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে এবং শ্রুতি-শিক্ষার পরিবর্তে এগুলি আলোচনা করিয়া তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে।

কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচারতন্ত্ররূপ ভয়ানক জিনিষ আপনাদের পুত্রকন্যাগণের হাতে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই বলিয়া তাহাদিগকে শেখানো হইতেছে—ঐ-গুলি হিন্দুর শাস্ত্র! যদি আপনারা সত্যই লজ্জিত হন, তবে তাহাদের নিকট হইতে ঐগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্, গীতা পড়িতে দিন।

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মা চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ; তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত উপাদানকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—কারণ দুই-ই। তিনি শুধু জগতের সৃষ্টিকর্তা নন, তবে তিনি উপাদানভূত নিজ সত্তা হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদীর মত। কতকগুলি কিম্ভূতকিমাকার দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিশ্বাস—ঈশ্বর নিজ সত্তা হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চিরপৃথক্; আবার সকলেই সেই জগৎপতির চির-অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মত—ঈশ্বর নিজেকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশিয়া নির্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু এই-সকল সম্প্রদায় এখন লোপ পাইয়াছে। বর্তমান ভারতে যে-সব অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়াবশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে; বস্তুতঃ জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা কঠিন। এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই দুরূহ বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কাণ্টের (Kant) দর্শনে কতকটা এই ধরনের মত দেখিতে পাইবে। তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কাণ্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহার লেখায় একটা মস্ত ভুল আছে। অধ্যাপকের মতে দেশ-কাল-নিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কাণ্টই প্রথম আবিষ্কার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার আবিষ্কর্তা। তিনি দেশ-কাল-নিমিত্তকে মায়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে শঙ্করভাষ্যে এই ভাবের কথা দু-এক জায়গায় দেখিতে পাইয়া আমি বন্ধুবর অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, কাণ্টের পূর্বেও এই তত্ত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈতবেদান্তীদের এই মায়াবাদ-মতটি একটু অপূর্ব ধরনের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, নানাত্ব মায়াপ্রসূত।

এই একত্ব, এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই আমাদের চরম লক্ষ্য। আবার এইখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া আহ্বান করিতেছে—যাহার ক্ষমতা আছে ইহা খণ্ডন কর। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে—সবকিছুই ভ্রান্তি, সবকিছুই মায়ামাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রে ভোজন কর, মহারাজ-চক্রবর্তী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহারা উন্নতিশীল হইয়া নিজেদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে। যতদূর সাধ্য তাহারা সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছে, যতদূর সাধ্য ভোগ করিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্তে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমরা চিরকাল অক্ষত রহিয়াছি, আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।

এখানে আবার আর একটি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও জার্মান দার্শনিক হেগেল ও শোপেনহাওয়ার- এর মতের ন্যায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল; অঙ্কুরকে উদ্গত হইতে, উহাকে বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে, উহার সর্বনাশা শাখাপ্রশাখাকে আমাদের এ মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এইঃ সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা বিশৃঙ্খলামাত্র (Chaos); সাকার ব্যষ্টি উহা হইতে মহত্তর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা; সুতরাং তাঁহার মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের বিভিন্ন কর্মজালে জড়িত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে।

পাশ্চাত্যেরা বলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমরা কেমন ইমারত বানাইতেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতেছি! ইহার পশ্চাতে—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ভোগের পশ্চাতে ঘোর দুঃখ-যন্ত্রণা, পৈশাচিকতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ লুকাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই!

অপরদিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতে ঘোষণা করিয়াছেন, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই—যাহাকে তোমরা ক্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার বৃথা চেষ্টামাত্র। এই জগতের সর্বশক্তিমান্ কারণ-স্বরূপ তুমি নিজেকে কর্দমাক্ত খানাডোবায় প্রতিবিম্বিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কিছুদিন ঐ চেষ্টা করিয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তখন যেখান হইতে আসিয়াছিলে, পশ্চাদপসরণ করিয়া সেইখানেই ফিরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য; এই বৈরাগ্য আসিলেই ধর্ম আরম্ভ হইল—বুঝিতে হইবে। ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম বা নীতির আরম্ভ হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। ত্যাগ কর। বেদ বলিতেছেনঃ ত্যাগ কর—ত্যাগ ব্যতীত অন্য পথ নাই।– 'ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ॥'৩৭—সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ইহাই সকল ভারতীয় শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য অনেকে রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহাত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছুদিনের জন্য সংসারের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার অপেক্ষা বড় ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল সকলেই 'জনক' বলিয়া পরিচিত হইতে চায়। তাহারা জনক বটে, কিন্তু কতকগুলি হতভাগা সন্তানের জনক-মাত্র—তাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও তাহারা অসমর্থ। শুধু ঐ অর্থেই তাহারা 'জনক', পূর্বকালীন জনকের মত তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এই ভাব! এখন জনক হইবার চেষ্টা একটু কম করিয়া লক্ষ্যের দিকে সোজা অগ্রসর হও দেখি। যদি ত্যাগ করিতে পার, তবেই তোমার ধর্ম হইবে। যদি না পার, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত পুস্তকালয় আছে, সেগুলির যাবতীয় গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্গজ পণ্ডিত

হইতে পার, কিন্তু যদি শুধু কর্মকাণ্ড লইয়াই থাক, তবে বুঝিতে হইবে তোমার কিছুই হয় নাই, তোমার ভিতর ধর্মের বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। ত্যাগেই মহাশক্তি; যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকেও গ্রাহ্য করে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়—'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে'। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা, যাহা সে সমগ্র জগতে উড়াইতেছে। যে-সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত ঐ মৃত্যুহীন ভাবসহায়ে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছেঃ সাবধান! ত্যাগের পথ, শন্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে।

হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকা যেন তোমাদের হাতছাড়া না হয়—সকলের সমক্ষে উহা তুলিয়া ধর। তুমি যদি দুর্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, তবু আদর্শকে খাটো করিও না। বল, আমি দুর্বল—আমি সংসারশক্তি ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটতার আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া, আপাতমধুর যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না; অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বল—আমি দুর্বল। কারণ এই ত্যাগ বড়ই মহান্ আদর্শ। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু-জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে।

যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তাহারা ধন্য; কারণ তাহাদের শোণিতমূল্যেই জয় লাভ হয়। একটি ব্যতীত ভারতের সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে প্রধান আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য সম্প্রদায় করেন নাই। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে কি দাঁড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা ঊর্ধ্ববাহু জটাজূটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও

ভাল। কারণ যদিও ঐগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে পৌরুষহীন বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতায় পূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য একটু কৃচ্ছসাধন প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগের আদর্শ অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ রামানুজ, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত—যেখানে অতি প্রাচীনকাল হইতে কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছে, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্বত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতেছেন, সেই দেশ কি এখন তাহার আদর্শ জলাঞ্জলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে—পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, হইতে পারে—সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহাদের নিকট ধর্ম কেবল কথার কথা থাকিবে না, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটি বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, সেটি আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়টিও বিরাট্। ধর্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে—এই ভাবটি ভারতেরই বৈশিষ্ট্য।

‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।’

অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। শুধু তাই নয়, জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঘোষণা করেন, শাস্ত্রপাঠের দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বৃথা বাক্যব্যয় ও বক্তৃতা দ্বারাও আত্মজ্ঞান-লাভ হয় না; আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে এই

অনুভব-শক্তি সংক্রামিত হয়; শিষ্যের যখন এইভাবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তখন তাহার নিকটও সব পরিষ্কার হইয়া যায়, সে-ও তখন আত্মোপলব্ধি করে।

আর একটি কথা। বাঙলা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিতা তোমার গুরু ছিলেন—সুতরাং আমিও তোমার সমগ্র পরিবারের গুরু হইব। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমি তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা করঃ গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হইবার যোগ্য নহেন; যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য জানেন, তিনিই গুরু। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'—যেমন চন্দনভারবাহী গর্দভ চন্দনের ভারই জানে, চন্দনের গুণাবলী অবগত নহে, এই পণ্ডিতেরাও সেইরূপ। ইঁহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। তাঁহারা যদি প্রত্যক্ষ অনুভব না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কি শিখাইবেন? বালক-বয়সে এই কলিকাতা শহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?' ঈশ্বর-দর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত; একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।' শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন-লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব।' প্রকৃত গুরু এইরূপই; শাস্ত্রের বিভিন্ন বিকৃত অর্থ করিতে পারিলেই গুরুপদবাচ্য হওয়া যায় না।

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥৩৮

নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।

'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন'—নিষ্পাপ, 'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থসংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনি সাধু। বসন্তকাল আসিলে

যেমন বৃক্ষে পত্রমুকুলোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই পরের হিতসাধন, তেমনি পরের হিত করিবে, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এই ভাব।৩৯

তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ || ৪০

তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকে ত্রাণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই গুরু, এবং ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥৪১

নিজেরা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চেষ্ট নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। তাহারা নানারূপ কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন পন্থার পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন আদর্শেরই আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন পন্থার অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই অধিকতর বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে; আর যতই তোমরা আধুনিক গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মত কাজ করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর; কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্যবান্ স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেকটি সুরই অমোঘ। তার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল। উহার কারণপরম্পরা বিচার করিবার সময় আমাদের নাই, কিন্তু

তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই আমাদের এই জাতীয় ব্যাধির, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়; জাতীয় বীর্যের পরিবর্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।

আমি অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; বিষয়টি বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে এত কথা বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়া যাইতেছি। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদীর মতে—আমাদের যে ব্যক্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহা ভ্রমমাত্র। সমগ্র জগতের পক্ষেই এই কথাটি ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই কাহাকেও বল তুমি 'ব্যক্তি' নহ, সে ঐ কথায় এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, তাহার 'আমিত্ব'—তাহা যাহাই হউক না কেন—বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার 'আমিত্ব' বলিয়া কিছুই নাই। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তোমার পরিবর্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে, তখন একভাবে চিন্তা করিয়াছ; এখন তুমি যুবক, এখন একভাবে চিন্তা করিতেছ; আবার যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন আর একভাবে চিন্তা করিবে। সকলেরই পরিণাম হইতেছে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে আর তোমার 'আমিত্ব' কোথায়? এই 'আমিত্ব' বা 'ব্যক্তিত্ব' তোমার দেহগত নহে, মনোগতও নহে। এই দেহমনের পারে তোমার আত্মা; আর অদ্বৈতবাদী বলেন, এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। দুইটি অনন্ত কখনও থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তিই আছেন—তিনিই অনন্তস্বরূপ।

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচারশীল প্রাণী, আমরা সব কিছুই বিচার করিয়া বুঝিতে চাই। এখন বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে? যুক্তি-বিচারের অর্থ—অল্প-বিস্তর শ্রেণীভুক্তকরণ, পদার্থনিচয়কে ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পৌঁছানো, যাহার উপর আর যাওয়া চলে না। সসীম বস্তুকে যদি অনন্তের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, তবে উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি চরমে অর্থাৎ অনন্তে

পৌঁছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না। আর অদ্বৈতবাদী বলেনঃ এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে; আর সবই মায়া, আর কিছুরই সত্তা নাই। যে-কোন জড়বস্তু হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা এই ব্রহ্ম। আমরা এই ব্রহ্ম; নামরূপাদি আর যাহা কিছু, সবই মায়া; ঐ নামরূপ বাদ দাও, তাহা হইলে তোমার ও আমার মধ্যে আর কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই 'আমি' শব্দটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই হই, তবে আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি না কেন? কিন্তু এখানে এই 'আমি' শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। যখন তুমি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, তখন আর তুমি আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নও—ব্রহ্মের কোন অভাব নাই, তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ, তিনি অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত; তাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপে আমরা সকলেই এক।

সুতরাং দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই প্রশ্নে বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্যের মত বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত নিজেদের মত সমর্থন করিবার জন্য স্থানে স্থানে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও শাস্ত্রের এমন অর্থ করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আধুনিক পণ্ডিতদের ভিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি মতই সত্য হইতে পারে, আর বাকীগুলি মিথ্যা, যদিও তাঁহাদের শ্রুতিতে এই তভাব রহিয়াছে—যে অপূর্ব ভাব ভারত এখনও জগৎকে শিক্ষা দিবে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত সত্ত্বা এক, মুনিগণ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর এই মূলতত্ত্বটিকে কার্যে পরিণত করাই আমাদের জাতির সমগ্র জীবনসমস্যার সমাধান। ভারতে কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ব্যতীত আমরা সকলেই সর্বদা এই তত্ত্ব ভুলিয়া যাই—আমি 'পণ্ডিত' অর্থে প্রকৃত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছি। আমরা এই মহান্ তত্ত্বটি সর্বদাই ভুলিয়া যাই, আর তোমরা দেখিবে অধিকাংশ পণ্ডিতের—আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের মত এই যে, হয় অদ্বৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, নতুবা দ্বৈতবাদ সত্য। যদি বারাণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ঘাটে গিয়া উপবেশন কর, তবে তুমি আমার

কথার প্রমাণ পাইবে; দেখিবে, এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের তো এই অবস্থা!

এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহ-দ্বন্দ্বের ভিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেই সামঞ্জস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উভয় মতই আবশ্যক; উহারা গণিতজ্যোতিষের ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্যকেন্দ্রিক ( Heliocentric) মতের ন্যায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে ঐ ভূকেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সে জ্যোতিষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ সূর্যকেন্দ্রিক মত শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তখন জ্যোতিষের তত্ত্বসমূহ পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে ভাল বুঝিতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীব স্বভাবতই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সগুণ ঈশ্বরই দর্শন করিব—সগুণ ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কোন ভাব উপলব্ধি করিতে পারি না, আমরা জগৎকে ঠিক এইরূপেই দেখিতে পাইব। রামানুজ বলেন, যতদিন তুমি নিজেকে দেহ মন বা জীব বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ততদিন তোমার প্রত্যেকটি অনুভূতি-ব্যাপারে জীব জগৎ এবং এই উভয়ের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষের জ্ঞান থাকিবে। কিন্তু মনুষ্যজীবনে কখনও কখনও এমন সময় আসে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যখন মন পর্যন্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রায় অন্তর্হিত হয়, যখন যে-সকল বস্তু আমাদের ভীতি উৎপাদন করে, আমাদিগকে দুর্বল করে এবং এই দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেগুলি চলিয়া যায়; তখন—কেবল তখনই সে সেই প্রাচীন মহান্ উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারে। সেই উপদেশ কি?

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥৪২

যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এইখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্বত্র সম, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥৪৩

ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি প্রাপ্ত হন।

# ১৯. গীতাতত্ত্ব – ১

[স্বামীজী কলিকাতায় থাকাকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলমবাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবসী কয়েকজন যুবক, যাঁহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামীজী ইঁহাদিগকে ধ্যান-ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ কর্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতাব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়; তাহাই এখানে 'গীতাতত্ত্ব' নামে সঙ্কলিত হইল।]

গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। প্রথম—গীতাটি মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ, অর্থাৎ উহা বেদব্যাস-প্রণীত কিনা? দ্বিতীয়—কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কিনা? তৃতীয়—যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কিনা? চতুর্থ—অর্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা? প্রথমতঃ সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি, দেখা যাক।

প্রথম প্রশ্ন

বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস—কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটি উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই 'ব্যাস' নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য—এই নামটিও একটি সাধারণ নাম। শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে গীতা-গ্রন্থখানি সর্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। এ-কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়ন-ভাষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, যদবলম্বনে রামানুজ 'শ্রীভাষ্য' প্রস্তুত করিয়াছেন—বলিয়াছেন, শঙ্করের ভাষ্যের

মধ্যে উদ্ধৃত যে ভাষ্যের অংশবিশেষ উক্ত বোধায়ন-কৃত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায় নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়াও এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটি কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়ন-ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, তখন গীতাসম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য-প্রণীত। তাঁহাদের মতে—তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

কৃষ্ণসম্বন্ধে সন্দেহ এইঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন ঋষির নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতের কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ‘মদনোৎসব’ নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটিকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। রাসলীলাদিও যে ঐরূপে চাপানো হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর পূর্বকালে লোকের নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র দধিসমুদ্রাদি রচনা করিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবনধারণ করিতেছেন; কিন্তু আবার বেদে পাই, ‘শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ’। আমরা এখানে কাহাকে অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দিকে তাহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। ইহা খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক—গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতনভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীন কালে এক-একটি সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক-একখানি শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে খুব উচ্চ ভাবসকল নিবিষ্ট ছিল।

## তৃতীয় প্রশ্ন

কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিকলিপি-কুশল ব্যক্তি (Short-hand Writer) উপস্থিত ছিলেন, যিনি সে-সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপকমাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—সদসৎপ্রবৃত্তির সংগ্রাম। এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে।

## চতুর্থ প্রশ্ন

অর্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ এই যে—‘শতপথব্রাহ্মণ’ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, উহাতে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে স্থলে অর্জুনাদির

নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিৎ জন্মেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এ দিকে মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্মসাধনা-শিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ঐগুলি যদি আজই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে; আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ-সম্বন্ধে সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটি ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে একটি মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ The end justifies the means; এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত সত্যকে ধারণা করা, সত্য বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

# ২০. গীতাতত্ত্ব – ২

এক্ষণে কথা হইতেছে—গীতা জিনিষটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দরভাবে সাজান—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক্ষণে গীতা যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি-আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম—এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তো হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেয়ালগুলিও নিষ্কামকর্মী; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কাম কর্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক তো পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত

আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

গীতার একটি শ্লোক

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে! তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—এই স্থানে অর্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময়ও সেরূপ ধীর। অর্জুনের (মনে) ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন, 'আমরা সত্ত্বগুণী'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, 'আমরা পরমহংস'। কারণ, শাস্ত্রে আছে—পরমহংসেরা 'জড়োন্মত্তপিশাচবৎ' হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু তথায় বুঝিতে হইবে—ঐ তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটেই হয় নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটিতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটিতে তাহার অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণা করিয়া আসিতে বড় ভালবাসে; এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে

তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট কর, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'–তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ–এ তো তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ।' জগতে পাপতাই নাই, রোগশোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে-কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', তুমি বীর, তোমার এ (ক্লীবতা) সাজে না।

তোমরা যদি জগৎকে এ-কথা শুনাইতে পার–'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ-সকল রোগ-শোক, পাপ-তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উল্টাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান্–যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহার বাহির দিক্‌টিই দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর; সমগ্র জগৎকে বল–তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

# ২১. আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর

[স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিঙ-এ দুই মাস অবস্থানের পর স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া হিমালয়ের আলমোড়া শহরে যান। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে হিন্দীতে একটি অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ]

আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে-ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু ব্যক্তি জীবন-সন্ধ্যায় আসিয়া 'শেষ অধ্যায়' সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, গভীর গহ্বরে, দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল—যে-তত্ত্বগুলির কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতেও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং যেগুলিকে যোগ্যতম বিচারকগণ অতুলনীয় বলিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি এবং তোমরা সকলেই জান, আমি এখানে বাস করিবার জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি; আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—ঋষিগণের প্রাচীন বাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইব। বন্ধুগণ, সম্ভবতঃ পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও বিফল-মনোরথ হইব, নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয়তো আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাসও করি যে, জগতের অন্য কোথাও নয়, এইখানেই আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিবে।

এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে আমার সামান্য কার্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমার যে প্রশংসা করিয়াছ, সেই জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এখন আমার মন—কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য-সম্বন্ধে কিছু

বলিতে চাহিতেছে না। যতই এই শৈলরাজের শিখরগুলি পর পর নয়নগোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল, এবং আমি কি কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি কাজ করিবার সঙ্কল্প আছে, ঐ-সকল বিষয়ের আলোচনায় না গিয়া এখন আমার মন—হিমালয় অনন্তকাল ধরিয়া যে এক সনাতন সত্য শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগশীল আবর্তে আমি যে এক তত্ত্বের অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছি—সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ‘সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্’—এই জগতে সকল জিনিষই ভয়-যুক্ত, কেবল বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

হ্যাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন আমার মনের ভাবসমূহ বিস্তারিতবাবে বলিবার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি, এই হিমালয়পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান, আর মানবজাতিকে আমরা চিরদিন এই ত্যাগের মহৎ শিক্ষা দিতে থাকিব। যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্মে ও আমার ধর্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে, একটি সনাতন ধর্মই বিদ্যমান—সেটি অন্তরে ব্রহ্মানুভুতি, আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ ‘সংসার মায়ামাত্র এবং ঈশ্বর—শুধু ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই বৃথা’, ইহা জানিয়া এখানে আসিবেন।

বন্ধুগণ, তোমরা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটি সঙ্কল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়াছ। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটি এই সার্বভৌম ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ তোমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই

হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে যদি হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাই-ই চাই, এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারিব। আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া এ-সকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এখন তোমরা আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি, আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতিই ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না; আমি মনে করি, আমাদের ধর্মের প্রতিনিধি বলিয়াই তোমরা আমার প্রতি এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ। প্রার্থনা করি, এই ধর্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এখন আমরা যেরূপ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, সর্বদা যেন সেই ভাবে থাকিতে পারি।

[স্বামীজী আলমোড়ায় আরও দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি স্থানীয় জেলা স্কুলে, অন্যটি ইংলিশ ক্লাবে। জেলা স্কুলে ওজস্বিনী হিন্দী ভাষায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হন। ইংলিশ ক্লাবে বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক। এই প্রসঙ্গে তিনি উপজাতীয় দেবতা-উপাসনা, বেদ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।]

# ২২. শিয়ালকোটে বক্তৃতা—ভক্তি

[নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী পঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ইংরেজী ও হিন্দীতে অনেক স্থানে বক্তৃতা দেন ও আলোচনাদি করেন; শিয়ালকোটে দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি ইংরেজীতে এবং অপরটি হিন্দীতে। এটি হিন্দী বক্তৃতার অনুবাদ।]

জগতে বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এক। কোথাও লোকে মন্দির নির্মাণ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, কোথাও বা অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত, কোথাও বা লোকে প্রতিমাপূজা করিয়া থাকে, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না। সত্য বটে—এই-সকল বিভিন্ন ভাব বিদ্যমান, কিন্তু যদি প্রত্যেক ধর্মে ব্যবহৃত যথার্থ কথাগুলি, উহাদের মূল তথ্য, উহাদের সার সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে—তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন। এমন ধর্মও আছে, যাহা ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত নয়, যে ধর্মের 'দর্শন' ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানে না, তথাপি দেখিবে ঐ ধর্মাবলম্বীরা সাধু-মহাত্মাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। বৌদ্ধধর্মই এই বিষয়ের প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

ভক্তি সকল ধর্মেই আছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে অর্পিত। সর্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি লাভ করা সহজ। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে দৃঢ় অভ্যাস, অনুকূল অবস্থা প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য এবং মন সম্পূর্ণ বিষয়াসক্তিশূন্য না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকল অবস্থার লোক অতি সহজেই ভক্তির সাধন করিতে পারে। ভক্তিমার্গের আচার্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি একদিন খাইতে না পায়, তবে তাহার মহাকষ্ট হয়। সন্তানের মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কী যন্ত্রণা হয়! যে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাহার প্রাণও ভগবানের বিরহে ঐরূপ ছটফট করিয়া থাকে।

ভক্তির মহৎ গুণ এই যে, উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, আর পরমেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি হইলে কেবল উহা দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে।

‘নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ’৪৪ ইত্যাদিঃ

‘হে ভগবান্, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। প্রত্যেক নামেরই গভীর তাৎপর্য আছে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার জন্য স্থান-কাল কিছু বিচার করিতে হয় না।’ মৃত্যু যখন স্থান-কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন ঈশ্বরের নাম করিবার কি স্থান-কাল বিচার করিতে হইবে?

ঈশ্বর বিভিন্ন সাধক কর্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাতদৃষ্টিমাত্র, বাস্তব নহে। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদের সাধনপ্রণালীই অধিক কার্যকর, অপরে আবার তাঁহাদের সাধনপ্রণালীকেই আশু মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতির মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে—উভয় পদ্ধতিই এক প্রকার। শৈবগণ শিবকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করেন; বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণুতেই অনুরক্ত, আর দেবীর উপাসকগণ দেবীকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্না বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তিপথের মহান্ প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। দ্বেষভাব অবশ্য পরিত্যাজ্য, তাহা হইলেও ইষ্টনিষ্ঠা প্রয়োজন। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিয়াছেনঃ

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

আমি জানি যিনি লক্ষ্মীপতি, তিনিই সীতাপতি; পরমাত্মদৃষ্টিতে উভয়ে এক, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই-সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে। সে কখনও ঐ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। জগৎ যে কখনও একধর্মাবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বর করুন, জগৎ যেন কখনও একধর্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসরণ করে; আর যদি সে এমন গুরু পায়, যিনি তাঁহার ভাব অনুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। তাহাকে সেই ভাবের বিকাশ-সাধন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যেটুকু আছে, তাহাও সে হারাইবে; সে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।

একজনের মুখ আর একজনের মুখের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর একজনের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। আর তাহাকে তাহার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দিতে বাধা কি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে—সেই দিকেই যদি উহাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা যায়, তবে উহার স্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বর্ধিত হয়; কিন্তু উহা স্বভাবতঃ যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিক হইতে সরাইয়া অন্যদিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে কি ফল হয়। উহার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া যাইবে, স্রোতের বেগও হ্রাস পাইবে। এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার—নিজ ভাব অনুযায়ী ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। ধর্মব্যাপারে যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনও এরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কখনও বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্মই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কার্যসাধন করিয়া গিয়াছে—সেইজন্যই এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনও জাগ্রত। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, বিভিন্ন ধর্মে বিরোধ দেখা দেয়, তাহার কারণ একজন মনে করিতেছে—সত্যের চাবি আমার কাছে, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে—ও-ব্যক্তি কপট, কারণ তাহা না হইলে সে আমার কথা শুনিত।

সকল ব্যক্তিই এক ধর্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? তোমরা কি সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পার? সকলকে এক ধর্মাবলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি, তরবারি-বলে সকলকে একধর্মাবলম্বী করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলে—সেখানেও একবাড়িতে দশটি ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে একটি ধর্ম কখনও থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানব-মনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে বলিয়াই মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না, এমন কি মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। 'মন্' ধাতু হইতে মনুষ্য-শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—মনুষ্য-শব্দের অর্থ মননশীল। মনের পরিচালনা না থাকিলে চিন্তাশক্তিও লোপ পায়, তখন সেই ব্যক্তিতে ও একটা সাধারণ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় ভারতের যেন কখনও এমন অবস্থা না হয়!

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সেজন্য এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। সকল বিষয়েই এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন; কারণ যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। অবশ্য বহুত্ব বা বৈচিত্র্য বলিলে ইহা বুঝায় না যে, উহার মধ্যে ছোট-বড় আছে। যদি সকলেই সমানও হয়, তথাপি এই বৈচিত্র্য থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল ধর্মেই ভাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই সেই-সব ধর্ম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়।

এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-ধর্ম অন্যায় কার্যের পোষকতা করিয়া থাকে, সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর 'না' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্ম যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল; কারণ উহা দ্বারা লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ব্যক্তিগত পবিত্রতা বা শুদ্ধ ভাবকে ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর মনে করা উচিত। এখানে ইহাও বলা কর্তব্য যে, 'আচার' অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল

এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বস্তুসংযোগে শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধির জন্য মিথ্যাভাষণ সুরাপান ও অন্যান্য গর্হিত কার্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। মদ্যপান চৌর্য দ্যূতক্রীড়া মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্য হইতে যদি বিরত থাক, তবে তো ভালই—উহা তো তোমার কর্তব্য। ইহার জন্য তুমি কোনরূপ প্রশংসা পাইতে পার না। অপরেরও যাহাতে কল্যাণ হয়, সেজন্য কিছু করিতে হইবে।

এখানে আমি ভোজনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সবই এখন লোপ পাইয়াছে; কেবল এই ব্যক্তির সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বৎসর পূর্বে আহার সম্বন্ধে যে-সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এখন ঐগুলির ভগ্নাবশেষরূপে এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ কথিত আছেঃ জাতিদোষ—যে-সকল আহার্য-বস্তু স্বভাবতই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি, সেগুলি খাইলে জাতিদুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। যে-ব্যক্তি ঐ-সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খায়, তাহার কাম প্রবল হয় এবং সে-ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানুষের চক্ষে ঘৃণিত অসৎ কর্মসকল করিতে থাকে। আবর্জনা-কীটাদি-পূর্ণ স্থানে আহারকে নিমিত্তদোষ বলে। এই দোষবর্জনের জন্য আহারের এমন স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে, যে-স্থান খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশ্রয়দোষ—অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্র ভাব উদিত হয়। এমন কি ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতেও খাওয়া উচিত নয়।

এখন এ-সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের প্রভাব চলিয়া গিয়াছে—এখন শুধু এইটুকু অবশিষ্ট আছে যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—ঐ ব্যক্তি যতই জ্ঞানী ও সাধু হউক না কেন। অথচ প্রকৃত নিয়ম যে কিভাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ময়রার দোকানে গেলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে মাছিগুলি চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিসে বসিতেছে—রাস্তার ধূলি উড়িয়া মিঠাই-

এর উপর পড়িতেছে, আর ময়রার কাপড়খানা এমনি যে, চিমটি কাটিলে ময়লা উঠে। কেন, ক্রেতারা সকলে মিলিয়া বলুক না—দোকানে গ্লাসকেস না বসাইলে আমরা কেহ মিঠাই কিনিব না। এইরূপ করিলে আর মাছি আসিয়া খাবারের উপর বসিতে পারিবে না এবং কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বীজ ছড়াইবে না। পূর্বকালে লোকসংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে-সব নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে; সুতরাং এই-সকল বিষয়ে আমাদের উৎকৃষ্টতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন, 'জলে থুথু ফেলিও না'; আর আমরা কি করিতেছি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। এই-সকল বিবেচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বাহ্য শৌচ বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরাও তাহা জানিতেন, কিন্তু এখন এই-সকল শুচি-অশুচি-বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—এখন শুধু উহার খোসাটা পড়িয়া আছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতিতে লইব, কিন্তু একজন সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি নিম্নবর্ণের অথচ তাহার মত সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে বসিয়া খায়, তবে তৎক্ষণাৎ সে জাতিচ্যুত হইবে—চিরদিনের জন্য পতিত হইয়া যাইবে। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটি স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে, পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে, এবং অসৎ-সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্য শৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন। অন্তঃশৌচসম্পন্ন হইতে গেলে সত্যভাষণ, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা আবশ্যক।

কিন্তু আমরা সচরাচর কি করিয়া থাকি? লোকে নিজের কাজের জন্য কোন ধনী লোকের বাড়ি গেল এবং তাঁহাকে 'গরীবের বন্ধু' প্রভৃতি উচ্চ বিশেষণে ভূষিত করিল; কিন্তু কোন গরীব ঐ ধনীর বাটীতে আসিলে তিনি হয়তো তাহার গলা কাটিতে প্রস্তুত। অতএব ঐরূপ ধনী ব্যক্তিকে 'দরিদ্রের বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করা তো স্পষ্টই মিথ্যা কথা। আর ইহাই আমাদের চিত্ত অশুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্য শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বারো বৎসর ধরিয়া সত্যভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশবর্ষকাল

যদি তাঁহার মনে কখনও কুচিন্তার উদয় না হয়, তবে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে—তাঁহার মুখ দিয়া যে-কথা বাহির হইবে, তাহাই ফলিবে। সত্যভাষণের এমনই অমোঘ শক্তি, এবং যিনি নিজের অন্তর বাহির দুই-ই শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী।

তবে ভক্তিরও এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে শুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি যে-ধর্ম সম্বন্ধেই বিচার করিয়া দেখ না, দেখিবে সকল ধর্মেই ভক্তির প্রাধান্য এবং সকল ধর্মই বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও য়াহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ বাহ্য শৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারাও কোন না কোনরূপে কিছু না কিছু বাহ্য শৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে; তাহারা মনে করে, সর্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে বাহ্য শৌচ প্রয়োজন।

য়াহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি তাহাদের এক মন্দিরে 'আর্ক' নামক এক সিন্দুক এবং ঐ সিন্দুকের ভিতর 'মুশার দশটি আদেশ' (Tables of the Law) রক্ষিত থাকিত। ঐ সিন্দুকের উপর বিস্তারিত-পক্ষযুক্ত দুইটি স্বর্গীয় দূতের মূর্তি থাকিত, এবং উহাদের ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহারা ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিতেন। অনেক দিন হইল য়াহুদীদের সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরনেই নির্মিত হইয়া থাকে, আর এখন খ্রীষ্টানদের মধ্যে ঐ সিন্দুকে ধর্মপুস্তক রাখা হয়। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর এবং তাঁহার মাতার প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। উহাও প্রতিমাপূজার রূপান্তর মাত্র। পারসী ও ইরানীদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানেরা বড় বড় সাধু-মহাপুরুষদের পূজা করিয়া থাকেন, আর প্রর্থনার সময় 'কাবা'র দিকে মুখ ফিরান। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় যে, ধর্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।

স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥৪৫

ব্রহ্মভাবে অবস্থিতিই সর্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম।

কিন্তু এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও ইহাতে কোন পাপ নাই। যে যেমন পারে, তাহার তেমন করা উচিত। যদি তাহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্য—নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য কোনরূপে উহা করিবে। এই জন্য যে প্রতিমাপূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়। সে উন্নতির ঐ সোপান পর্যন্ত আরোহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার বাহ্যপূজা চাই-ই চাই। যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ঐ-সকল ব্যক্তির চিত্তের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করুন—তাহাদের দ্বারা ভাল ভাল কাজ করাইয়া লউন। কিন্তু তাহাদের উপাসনা-প্রণালী লইয়া বিবাদের প্রয়োজন কি?

কেহ ধন, কেহ বা পুত্রলাভের জন্য ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে। আর উপাসনা করে বলিয়া তাহারা নিজেদের ‘ভাগবত’ বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে। যদি তাহারা শুনিতে পায়, অমুক স্থানে এক সাধু আসিয়াছে—সে তামাকে সোনা করিতে পারে, অমনি তাহার নিকট তাহারা দলে দলে ছুটিতে থাকে। তথাপি তাহারা নিজেদের ‘ভাগবত’ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, ধনী হইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি বলা যায় না, স্বর্গলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি বলা যায় না, এমন কি নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। ভয় বা কামনা হইতে ভক্তির উদ্ভব হয় না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলিতে পারেনঃ

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥৪৬

হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সর্বভূতকে দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে, তখনই সে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই; তখন—কেবল তখনই সে নিজেকে দীনের দীন জানিয়া প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানকে উপাসনা করে; তখন তাহার আর বাহ্য অনুষ্ঠান এবং তীর্থভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না, সে প্রত্যেক মানুষকেই যথার্থ দেবমন্দির বলিয়া মনে করে।

আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না আমাদের প্রাণে ভক্তিলাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জাগিতেছে, ততদিন আমরা উহার কোনটিরই প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের ‘পিতা’ বলিয়া থাকি। কেন তাঁহাকে পিতা বলিব? পিতা-শব্দে সচরাচর যাহা বুঝায়, উহা কখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মাতা বলাতেও ঐ আপত্তি। কিন্তু যদি আমরা ঐ দুইটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য আলোচনা করি, তবে দেখিব—ঐ দুইটি শব্দের যথার্থই সার্থকতা আছে। ঐ দুইটি শব্দ গভীর প্রেমসূচক—প্রকৃত ভাগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে পিতা বা মাতা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা কর। ঐ উপাখ্যানে শুদ্ধ ভক্তেরই প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—কারণ সংসারের আর কোন প্রেমই নরনারীর পরস্পরের প্রতি প্রেম অপেক্ষা অধিকতর নহে। যেখানে এইরূপ প্রবল অনুরাগ, সেখানে কোন ভয় থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, এবং কোন আসক্তি থাকে না—শুধু এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন উভয়কে তন্ময় করিয়া রাখে। পিতামাতার প্রতি সন্তানদের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা শ্রদ্ধাজনিত—ভয়-মিশ্রিত। ঈশ্বর কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকুন বা না-ই করিয়া থাকুন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা হউন বা না-ই হউন, এ-সকল জানিয়া আমাদের কি লাভ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা, সুতরাং ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার

উপাসনা করা উচিত। যখন মানুষের সকল বাসনা চলিয়া যায়, তখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না; যখন সে ঈশ্বরের জন্য উন্মত্ত হয়, তখনই মানুষ ভগবানকে যথার্থভাবে ভালবাসিয়া থাকে। সংসারে প্রেমিক যেমন তাঁহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসিয়া থাকে, তেমনি আমাদের ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—রাধা তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত। যে-সকল গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান আছে, সে-সকল গ্রন্থ পাঠ কর, তখন বুঝিবে কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয়। কিন্তু এ অপূর্ব প্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে? অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত পাপে পূর্ণ, তাহারা জানে না—পবিত্রতা বা নীতি কাহাকে বলে; তাহারা কি এই-সব তত্ত্ব বুঝিবে? তাহারা কোনমতেই এ-সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। যখন লোকে মন হইতে সমুদয় অসৎ চিন্তা দূরীভূত করিয়া পবিত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাস করে, তখন তাহারা—মূর্খ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষার রহস্যও ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এরূপ লোক সংসারে কয়জন? কয়জনের এরূপ হওয়া সম্ভব?

এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা অসৎ লোক কলুষিত করিতে না পারে। জ্ঞানমার্গের দোহাই দিয়া মানুষ অনায়াসেই বলিতে পারে—আত্মা যখন দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন দেহ যাহাই করুক না কেন, আত্মা তাহাতে কখনই লিপ্ত হন না। যদি মানুষ যথার্থভাবে ধর্ম অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান—যে-কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না, সকলেই পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হইত। কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হইলে লোকে মন্দ হইয়া থাকে; আর মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিচালিত হয়—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অসাধু লোকের সংখ্যা বেশী হইলেও সকল ধর্মেই এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের নাম শুনিলেই মাতিয়া উঠেন, ঈশ্বরের গুণগান কীর্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। এরূপ লোকই যথার্থ ভক্ত।

ধর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে তাঁহার দাস মনে করে। সে কৃতজ্ঞচিত্তে বলে, 'হে প্রভু, আজ আমাকে দু-পয়সা দিয়াছ—সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।' এইভাবে কেহ বলে, 'হে ঈশ্বর, ভরণপোষণের জন্য আমাদিগকে আহার দাও।'

কেহ বলে, 'হে প্রভো, এই এই কারণে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ' ইত্যাদি। এই ভাবগুলি একেবারে পরিত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একটিমাত্র আকর্ষণী শক্তি আছে—সেই আকর্ষণী শক্তির বশে সূর্য চন্দ্র এবং অন্যান্য সকলেই বিচরণ করিতেছে। সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। এই জগতে সকল বস্তু—ভালমন্দ যাহা কিছু সবই ঈশ্বরাভিমুখে চলিতেছে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতেছে—ভালই হউক, মন্দই হউক—সবই আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছে। নিজের স্বার্থের জন্য একজন আর একজনকে খুন করিল। অতএব নিজের জন্যই হউক আর অপরের জন্যই হউক, ভালবাসাই ঐ কার্যের মূলে। ভালই হউক বা মন্দই হউক, ভালবাসাই সকলকে প্রেরণা দেয়। সিংহ যখন ছাগশিশুকে হত্যা করে, তখন সে নিজে বা তাহার শাবকেরা ক্ষুধার্ত বলিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'ঈশ্বর কি?', তাহা হইলে বলিতে হইবে—ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। সর্বদা সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত—এরূপ অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে লাভ করা যাইবে না—ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকেই চলিয়াছে। পতির পরম অনুরাগিণী পত্নী জানে না যে, তাহার পতির মধ্যে যে দিব্যভাব ও শক্তি রহিয়াছে—তাহাই তাহাকে স্বামীর দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের উপাস্য কেবল এই প্রেমের ঈশ্বর। যতদিন আমরা তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা ইত্যাদি মনে করি, ততদিন বাহ্য পূজার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু যখন ঐ-সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের মূর্ত প্রতীক বলিয়া চিন্তা করি এবং সকল বস্তুতে তাঁহাকে এবং তাঁহার মধ্যে সকল বস্তু অবলোকন করি, তখনই আমরা পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকি।

# ২৩. হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি

[লাহোরে ধ্যান সিং-এর হাবেলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত—যাহার বিষয় আমাদের মনু মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখানে হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত হইয়াছে, ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে বোঝা যায়—ভবিষ্যতে এই ভাব সমগ্র জগৎকে প্রবল বন্যায় প্লাবিত করিবে। এই সেই ভূমি—যেখানে ইহার বেগশালিনী স্রোতস্বিনীকুলের ন্যায় চতুর্দিকে বিভিন্ন আধারে প্রবল ধর্মানুরাগ বিভিন্নভাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়া, শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বজ্রনির্ঘোষে উহার মহীয়ষী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছে। এই সেই বীরভূমি—যাহা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। এই সেই ভূমি—এত দুঃখ-নির্যাতনেও যাহার গৌরব ও তেজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজ-প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন, এবং যাহাদের জন্য এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাই যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন মর্মাহত সিংহের ন্যায় দক্ষিণ দেশে গিয়া নির্জনবাস আশ্রয় করিলেন এবং নিজ দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া মর্ত্যধাম হইতে অপসৃত হইলেন।

হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখনে—এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান আমার অতি

অল্পই আছে। দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি– আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি– তোমাদিগের নিকট কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।

সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু গড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। জগতে সময় সময় সমালোচনা—এমন কি কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। অনন্ত কালের জন্য আছে কার্য—উন্নতির চেষ্টা ও গঠন, সমালোচনা বা ভাঙাচোরা নয়। প্রায় গত এক শত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র সমালোচনার বন্যা বহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকারময় দেশগুলির উপর পড়িয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আমাদের আনাচে-কানাচে, গলিঘুঁজিতেই যেন সাধারণের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। স্বভাবতই আমাদের দেশে সর্বত্র বড় বড় মনীষিগণের—শ্রেষ্ঠ মহিমময় সত্যনিষ্ঠ ন্যায়ানুরাগী মহাত্মাগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে অপার স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। আর এই মহাপুরুষগণ স্বদেশকে এত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রাণ স্বদেশের জন্য কাঁদিত বলিয়া, তাঁহারা যাহা কিছু মন্দ বলিয়া মনে করিতেন তাহাই তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন। অতীতকালের এই মহাপুরুষগণ ধন্য—তাঁহারা দেশের অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান যুগের মনোভাব ধ্বনিত হইতেছেঃ যথেষ্ট! সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে; এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, এগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয়

অগ্রগতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে আগাইয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ি পরিষ্কার হইয়াছে; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। পথ পরিষ্কার হইয়াছে; আর্যসন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের কাছে আসিয়াছি, আর প্রথমেই আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আমার চক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহান্ ও মহিমময়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি, এবং সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব আজ রাত্রে আমার প্রস্তাব এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ত্ব বলিব, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত; যদি পারি—আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব, এবং যদি ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হয়, তবে ঐ তত্ত্ব কার্যে পরিণত করিতে হইবে। আমরা হিন্দু। আমি এই 'হিন্দু' শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহাদ্বারা কেবল সিন্ধুনদের পূর্বতীরবর্তী লোকদিগকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসে যায় না। আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময়, সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, না চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত থাকিবে, না উহা দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমানকালে 'হিন্দু' শব্দে কোন মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝাক; এস, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যে-সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি কখনও আমার পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত গর্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম; কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তির জন্য আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীতের আলোচনা

করি, যতই আমি পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, ততই গৌরব বোধ করি, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, ইহা আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে তুলিয়া আমাদের মহান্ পূর্বপুরুষগণের মহতী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্যদের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও হৃদয়ে সেই গর্ব আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলের মিলনভূমি ঠিক কোথায়, আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি, তাহা বাহির করিবার চেষ্টার পূর্বে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতেই হইবে। প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেক জাতিরও সেইরূপ একটি ব্যক্তিত্ব আছে। যেমন এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ অতীত কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকেই এক-একটি বিধিনির্দিষ্ট পথে চলিতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষ উদ্‌যাপন করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে জানিতে হইবে—জাতীয় ব্রত কি, জানিতে হইবে—বিধাতা এই জাতিকে কি কার্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির প্রগতিতে ইহার স্থান কোথায়, জানিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির সঙ্গীতের ঐক্যতানে তাহাকে কোন্ সুর বাজাইতে হইবে। আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে—তুমি সাপটিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ উহার মাথায় ঐ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোনমতে মারিতে পারিবে না। আমরা রাক্ষস-রাক্ষসীর অনেক গল্প শুনিয়াছি। রাক্ষসীর প্রাণ একটি ছোট পাখির ভিতর থাকিত। যতদিন ঐ পাখিটিকে মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেল, তাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা

খাটে। জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দিষ্ট ভাবের মধ্যে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব, যতদিন না তাহাতে আঘাত লাগে, ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপারটি বুঝিতে পারিব। বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতিমুহূর্তে নিজের বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপই আছি, এখনও আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত; শুধু তাহাই নহে, আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত তাহা নহে, সম্প্রতি আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব দিতে প্রস্তুত—তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন। আজ আমরা দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, ঐগুলি বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থানলাভ করিতেছে, শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থলে ভারতীয় ভাবধারা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কারণ এই—মানবজাতির মন যে-সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বিষয়—দর্শন ও ধর্মই জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারে ভারতের মহৎ দান।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন—অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আমরা সকলেই এ-কথা জানি, আর ঐ বিরাট্ মস্তিষ্কসম্পন্ন অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগতের স্বপ্নের অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তুলাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন—সেই উচ্চতর বিষয়ের প্রতিধ্বনি বেদের মধ্যেই শুনা যাইতেছেঃ 'অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'৪৭ তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়। এই পরিবর্তনশীল, অনিত্য, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু-দুঃখ-শোকপূর্ণ

এই জগতের বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে, কিন্তু যিনি অপরিণামী আনন্দময়, একমাত্র যাঁহাতে শান্তি বিরাজিত, একমাত্র যাঁহাতে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁহার নিকট পৌঁছিলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের মতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে-সকল বিদ্যা বা বিজ্ঞান আমাদিগকে শুধু অন্ন-বস্ত্র দিতে পারে, স্বজনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ক্ষমতা দিতে পারে, যে-সকল বিদ্যা শুধু মানুষকে জয় ও শাসন করিবার এবং দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য করিবার শিক্ষা দিতে পারে; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অনায়াসেই সেই-সকল বিজ্ঞান, সেই-সকল বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে অন্য পথ ধরিলেন, যাহা পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা অনন্তগুণে মহৎ, পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা যাহাতে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ। ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা এমন একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এখন উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া উহা আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে, আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। এখন ধর্ম ও হিন্দু—এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই। অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করিয়াছে, কিন্তু একজনও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখিকে মারিতে পারে নাই। অতএব এই ধর্মই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি, আর যতদিন আধ্যাত্মিকতা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতের কোন শক্তিই এই জাতিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। যতদিন আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন আমরা জগতের সর্বপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতেও প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে তাহাকে আমি ‘হিন্দু’ বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতি-চর্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু-আধটু ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু এখানে—এই ভারতে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য ধর্মানুষ্ঠান, তারপর যদি সময় থাকে, তবে

অন্যান্য জিনিষ তাহার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই তেমনি আমাদিগকে প্রথমে আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক-শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক-শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্ব-সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নাই। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতেও অনেক হইবে। কারণ আমাদের ধর্মের ইহাই বিশেষত্ব, ইহার মূলতত্ত্বগুলি অতি উদার, যদিও ঐগুলি হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি ঐগুলি সেই মূল তত্ত্বসমূহের কার্যে পরিণত রূপ—যে-তত্ত্বগুলি আমাদের মাথার উপরের আকাশের মত উদার এবং প্রকৃতির মত নিত্য ও সনাতন। অতএব সম্প্রদায়গুলি যে স্বভাবতই চিরদিন থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা জগতের কোন উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। একদল লোক তো সব কাজ করিতে পারে না। অসীমপ্রায় শক্তিরাশি অল্প কয়েকটি লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয়টি বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায়-ভেদরূপ এই শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক-শক্তিসমূহের সুপরিচালনার জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পরের বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন, যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্রসকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান, এই-সকল আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতাসত্ত্বেও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলনের স্বর্ণসূত্র বিদ্যমান, ঐগুলির মধ্যে সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—জগতে এক বস্তুই বিদ্যমান, ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন—সেই ভারতে এখনও এই-সব সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষহিংসা থাকে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দেয়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস—কতকগুলি প্রধান প্রধান তত্ত্বে আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে। আমরা বৈষ্ণব বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বা আধুনিক বৈদান্তিক—যাঁহাদেরই পদানুসরণ করি না কেন, প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়েরই হই বা আধুনিক সংস্কারপন্থী সম্প্রদায়েরই হই, যে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, আমার ধারণায় সে-ই এ-সকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যাপ্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত; কারণ আমরা সকলকেই আমাদের ভাবে আনিতে পারি না; আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিব, সকলকেই সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে বা সকলকেই আমাদের প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে—জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্মরহস্যসমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত; প্রকৃতির যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, বেদেরও তেমনি; এবং যখনই আমরা এই পবিত্র গ্রন্থের সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান হই, তখনই আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংসাকারী—শেষ বিচারক এই বেদ। বেদ কি—এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কোন সম্প্রদায় বেদের অংশবিশেষকে অন্য অংশ অপেক্ষা পবিত্রতর জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না, যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি—বেদবিশ্বাসে আমরা সকলেই ভাই ভাই। আজ আমরা যে-সব পবিত্র মহৎ উত্তম বস্তুর অধিকারী, তাহার সে-সবই আসিয়াছে এই সনাতন পবিত্র অপূর্ব গ্রন্থ হইতে। বেশ, তাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তত্ত্বটিই ভারতভূমির সর্বত্র প্রচারিত হউক। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বেদ

চিরদিনই যে প্রাধান্যের অধিকারী এবং বেদের যে প্রাধান্যে আমরাও বিশ্বাসী, তাহা বেদকে দেওয়া হউক। অতএব আমাদের মিলনের প্রথম ভূমি—বেদ।

দ্বিতীয়তঃ আমরা সকলেই ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকি। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী শক্তি—তাঁহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, আবার তাঁহা হইতেই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চ বহির্গত হয়। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে—কেহ হয়তো সম্পূর্ণ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা সগুণ অথচ ব্যক্তিভাবশূন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ নির্গুণ ঈশ্বর মানিতে পারেন, আর সকলেই কিন্তু বেদ হইতে নিজ নিজ মতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এই-সব ভেদ-সত্ত্বেও আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সবকিছু উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অন্তে সবকিছুই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে 'হিন্দু' বলা যাইতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে এই তত্ত্বটিও ভারতভূমির সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে-ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই—আমরা তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিবাদ করিব না—কিন্তু যেরূপেই হউক, তোমাকে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন একটি ধারণা অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও ইহার কোনটিই মন্দ নহে। একটি উৎকৃষ্ট, অন্যটি উৎকৃষ্টতর, অপরটি উৎকৃষ্টতম হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ-নিচয়ের মধ্যে 'মন্দ' শব্দটির স্থান নাই। অতএব যিনি যেভাবে ইচ্ছা ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন, তিনিই ঈশ্বরের আশীর্বাদভাজন। তাঁহার নাম যতই প্রচারিত হইবে, ততই এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা করুক; এই ঈশ্বরের নাম সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও নীচ ব্যক্তির গৃহ হইতে সর্বাপেক্ষা ধনী ও মানী—সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ত্ব যাহা আমি আপনাদের নিকট বলিতে চাই, তাহা এইঃ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত আমরা বিশ্বাস করি না যে, জগৎ মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর

পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে, আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে; আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মা এই জগতের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিষয়েও সকল হিন্দুই একমত। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতি অনাদি অনন্ত, তবে কল্পনাতে এই স্থূল বাহ্য জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার অভিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃতি-নামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে এবং তরঙ্গাকার এই গতি অনন্তকাল ধরিয়া—যখন কালেরও আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে।

সকল হিন্দুই আরও বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি তাহার অভ্যন্তরে মন নামক সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত 'মানুষ' নহে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ এইগুলি অপেক্ষা মহত্তর। কারণ স্থূলদেহ পরিণামী, মনও তদ্রূপ, কিন্তু এতদুভয়ের অতীত আত্মা-নামধেয়—এই 'আত্মা' শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ করিতে আমি অক্ষম; যে শব্দের দ্বারাই ইহার অনুবাদ করা যাক না কেন, তাহা ভুল হইবে—সেই অনির্বচনীয় বস্তুর আদি-অন্ত কিছুই নাই, মৃত্যু নামক অবস্থাটির সহিত উহা পরিচিত নহে।

তারপর আর একটি বিশেষ বিষয়ে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ—তাহা এই যে, আত্মা এক দেহের পর আর এক দেহ ধারণ করে; এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমন এক অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে না, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, তাহার আর জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত সংসারবাদ বা পুনর্জন্মবাদ এবং 'নিত্য আত্মা' সম্বন্ধীয় মতবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, এই আর একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধবিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন হইতে পারে, কাহারও মতে আবার উহা সেই অনন্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র হইতে পারে, অন্যের মতে হয়তো উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করি না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব

বিশ্বাস করি যে, আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার বিনাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে হইবে, অবশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া পূর্ণত্বলাভ করিতে হইবে—ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত।

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্যসূচক, ধর্মরাজ্যের মহত্তম ও অপূর্বতম আবিষ্কার-রূপ তত্ত্বটির কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য তত্ত্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাহারা ইতঃপূর্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা মৌলিক প্রভেদ যেন প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যকে এক কুঠারাঘাতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে; সেটি এইঃ আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস করি—আমরা শাক্তই হই, শৈবই হই, বৈষ্ণবই হই, এমন কি বৌদ্ধ বা জৈনই হই—আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ ও পূর্ণস্বভাব, অনন্তশক্তিসম্পন্ন ও আনন্দময়। কেবল দ্বৈতবাদীর মতে আত্মার এই স্বাভাবিক আনন্দ অতীত-অসৎকর্ম দ্বারা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার সঙ্কোচমুক্ত হইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণস্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। আত্মা কিছুদিনের জন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, অদ্বৈতবাদীর মতে এ ধারণাটিও আংশিকভাবে ভ্রমাত্মক—মায়াবৃত হওয়ার ফলেই আমরা ভাবি যে, আত্মা যেন তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ অবস্থাতেও তাঁহার সমুদয় শক্তি পূর্ণভাবেই থাকে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্ত্বে অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী, আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে অবস্থিত ব্যবধান দুরপনেয়। প্রাচ্য জাতি—যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু ভাল, তাহা অন্তরে অন্বেষণ করে; উপাসনার সময় আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করি, পাশ্চাত্য জাতি ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্মপুস্তকসমূহ Inspired—সুতরাং শ্বাস-গ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রসমূহ কিন্তু Expired—শ্বাসপরিত্যাগের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে—ঐগুলি ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত, ঈশ্বরই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের অন্তর্যামী, শাস্ত্র তাঁহারাই প্রকাশ করিয়াছেন।৪৮

এইটিই একটি প্রধান বুঝিবার জিনিষ; হে আমার বন্ধুগণ, আমার ভাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বার বার লোককে বুঝাইতে হইবে। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিবারাত্র নিজেকে দীন দুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। যদি তুমি বল—'আমার মধ্যেও শক্তি আছে', তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে; আর যদি তুমি বল—'আমি কিছুই নই', ভাব যে তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে তুমি 'কিছুই নও', তবে তুমি 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি তোমাদের মনে রাখা কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। আমরা কিরূপে 'কিছু না' হইতে পারি? আমরা সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব কাজ করিতেই হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাসরূপ প্রেরণাশক্তিই তাঁহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—যেদিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেইদিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। নিজের উপর বিশ্বাস হারানোর অর্থ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমরা কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া কাজ করিতেছেন? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্বব্যাপী অন্তর্যামী প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমাদের দেহে মনে আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি তোমরা নিরুৎসাহ হইতে পার? আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ্, তুমি হয়তো একটি পর্বতপ্রায় তরঙ্গ। তাহাতে কি আসে যায়! সেই অনন্ত সমুদ্র যেমন তোমার আশ্রয়, আমারও সেইরূপ। সেই প্রাণ শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন অধিকার, আমারও তেমনি। আমার জন্ম হইতেই—আমারও যে জীবন আছে, তাহা হইতেই—স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পর্বতপ্রায় উচ্চ তরঙ্গস্বরূপ তোমার ন্যায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সন্তানগণকে—তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ,

মহত্ত্ববিধায়ক, উচ্চ মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে-কোন বাদ ইচ্ছা শিক্ষা দাও; আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আত্মার পূর্ণত্বরূপ এই অপূর্ব মতটি ভারতে সর্বসাধারণ—সকল সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে আত্মা কখনই পরে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ যাহা স্বভাবতই পূর্ণ নহে, তাহা কোনরূপে পূর্ণতা লাভ করিলেও ঐ পূর্ণতা আবার চলিয়া যাইবে। যদি অপবিত্রতাই মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্য সে পবিত্রতা লাভ করে, তথাপি চিরকালের জন্য তাহাকে অপবিত্রই থাকিতে হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই পবিত্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়া যাইবে এবং আবার সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। এজন্য আমাদের সকল দার্শনিক বলেন, পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নহে; পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নহে—এইটি স্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে যে মহর্ষি তাঁহার নিজ মনকে তাঁহার কৃত উৎকৃষ্ট কার্যাবলী ও উৎকৃষ্ট চিন্তারাশি স্মরণ করিতে বলিতেছেন, তাঁহার কথা স্মরণ রাখিও।৪৯ কই, তিনি তো তাঁহার মনকে সমুদয় দোষ-দুর্বলতা স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অবশ্য মানুষের জীবনে দোষ-দুর্বলতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু সর্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ কর—ঐ দোষ-দুর্বলতার প্রতিকার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্বকথিত কয়েকটি মত ভারতের সকল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোঁড়া বা উদার, প্রাচীন বা নব্যপন্থী, সকলেই সম্মিলিত হইবেন। কিন্তু সর্বোপরি, আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময় সময় ভুলিয়া যাই—ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি, তাহা না হইলে উহা ধর্ম নামেরই যোগ্য নহে। 'এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত'—এ-কথা আমাদিগকে কেহ কখনও শিখাইতে পারিবে না; কারণ আমরা ও-কথায় বিশ্বাসই করি

না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠন করিবে, তুমি তাহাই হইবে। তুমি যাহা—তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে এবং নিজের চেষ্টায় হইয়াছ। সুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী বাণী আবির্ভূত হইয়াছে—'অনুভূতি'; আর একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।' খুব সাহসের কথা বটে, কিন্তু উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়—আগাগোড়া সত্য। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল তোতাপাখির মত কতকগুলি কথা মুখস্থ করিলেই চলিবে না, কেবল বুদ্ধির সায়—বুদ্ধিগত সম্মতি দিলেই চলিবে না; ইহাতে কিছুই হয় না, ধর্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করা চাই। প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন—ইহাই আমাদের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছে—এ-জন্যই যে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহা নহে। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তি আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা নহে; আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, বর্তমান কালেও খুঁজিলে অনন্তঃ দশজন আত্মজ্ঞ পুরুষের সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, যাঁহারা আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না মানুষ ঈশ্বর-দর্শন করিতেছে, যতদিন না সে আত্মা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসম্ভব। অতএব সর্বাগ্রে এই-বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে এবং আমরা উহা যতই ভাল করিয়া বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পাইবে। কারণ সে-ই প্রকৃত ধার্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে—তাঁহাকে লাভ করিয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥৫০

তাঁহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তাঁহারই সকল সংশয় চলিয়া যায়, তিনিই কর্মফল হইতে মুক্ত হন, যিনি কার্য ও কারণ-রূপী পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটাকে গভীর ধর্মানুভূতি মনে করি; তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই

বিরোধ! যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি—প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—আমরা ধর্মের সত্যসমূহ উপলব্ধি করিবার পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেরাই অন্ধকারে ঘুরিতেছি এবং অপরকেও সেই অন্ধকারে ঘুরাইতেছি। আর ইহা বুঝিলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে। কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করঃ তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে তাঁহাকে প্রচার করিবার তোমার কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ, আবার আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ? অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায়৫১ আমরা উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব! অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া-চিন্তিয়া অগ্রসর হও। সকলকেই নিজ নিজ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে দাও, সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শন করিতে চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে—ভারতের প্রত্যেক ঋষি, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী উৎসারিত হইবে; কারণ যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ—তিনি যে সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তখন—কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে এবং তখনই আমরা 'হিন্দু' শব্দটিকে এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিকে যথার্থরূপে বুঝিতে, হৃদয়ে গ্রহণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে এবং আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব।

আমার কথা বিশ্বাস কর, তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষী ব্যক্তি হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে-কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন

হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের সেই মহান্ গুরুগোবিন্দসিংহের বিষয়ে আমি এই বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি।

এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের এবং আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমন কি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল; অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে দক্ষিণদেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।

আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক এক জন গোবিন্দসিংহ হইতে হইবে। তোমরা স্বদেশবাসীদের ভিতর সহস্র দোষ দর্শন করিতে পার, তথাপি যাহাদের মধ্যে হিন্দুরক্ত আছে, যাহারা ভারতবাসী তাহাদের সকলকেই দেবতারূপে পূজা করিতে হইবে—যদিও তাহারা সর্বপ্রকারে তোমাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তথাপি তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ করিবে। যদি তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দসিংহের মত সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দুনামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

'ভারত-উদ্ধার' সম্বন্ধে, যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারা জীবন কার্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। তোমাদের আধ্যাত্মিকতার উপর শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ

আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের শিথিল বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্টালিকা পর্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ-বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। জাতির পর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল—মানুষ জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাশ্চাত্য ভাষা মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে, 'মানুষ আত্মা ত্যাগ করে।'৫২আমাদের ভাষা কিন্তু বলে, 'সে দেহত্যাগ করিল।' পাশ্চাত্যদেশীয় লোক নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমে দেহকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তারপর তাহার একটি আত্মা আছে বলিয়া উল্লেখ করে; কিন্তু আমরা প্রথমেই নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তরপর আমার একটা দেহ আছে—এই কথা বলি। এই দুইটি বাক্য আলোচনা করিলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। এই কারণে যে-সকল সভ্যতা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যরূপ বালির ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেগুলি অল্পদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্যান্য যে-সকল জাতি ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে—যথা চীন ও জাপান—এখনও জীবিত; এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন ফিনিক্স-পক্ষীর ন্যায়; সহস্রবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া নূতন মহিমায় প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর কখনও মাথা তুলিতে পারে না; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ধৈর্যধারণপূর্বক অপেক্ষা কর; ভবিষ্যৎ গৌরব আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ কখনও সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি নিজেকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি, তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের মত অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে

ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে—তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে– তাহার বিনাশ আসন্ন। এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির—আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর; আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাইবে। আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের অধীন হইয়া কার্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিব।

তোমাদের ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না; অথচ অপরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইলে কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, তাহা করে না। বীজ মৃত্তিকাদি হইতে প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি-অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এইরূপ কর। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেনঃ৫৩

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে, ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না; এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি কঠিন ব্যাপার, তাহা তোমরা বেশ জান। আর ঈশ্বরই জানেন, কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় জীবনস্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; ঈশ্বর জানেন—তোমাদের শোণিতে কত সহস্র বৎসরের সংস্কার রহিয়াছে, আর তোমরা কি সাগরে মিলিতপ্রায় এই শক্তিশালিনী স্রোতস্বতীকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকটে লইয়া যাইতে চাও? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই বিনষ্ট হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনস্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে-সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগবতী নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাত সরল করিয়া দাও, তাহা হইলে উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্য আমি পূর্বকথিত উপায়গুলি নির্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে, সেগুলি সময়াভাবে আজ রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম না—দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতিভেদ-সম্বন্ধীয় অদ্ভুত সমস্যা রহিয়াছে। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমস্যার সব দিক্ বিচার করিতেছি। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি, এদেশের প্রায় সর্বস্থানে গিয়া সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি; কিন্তু যতই আমি এই সমস্যার আলোচনা করিতেছি, ততই উহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ধারণা করিতে গিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে আমার সম্মুখে যেন ক্ষীণ রশ্মিধারা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি সম্প্রতি ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

তারপর আবার ভোজনপানাদি-সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ যতটা মনে করি, ব্যাপারটি ততটা অনাবশ্যক নহে। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমরা এখন এই আহারাদি সম্বন্ধে যে-বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার, উহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ আমরা ভোজনপান-বিষয়ে যথার্থ শুদ্ধতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি—আমরা শাস্ত্রানুমোদিত পানভোজন-প্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।

আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে, সেগুলি আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই। আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বা কি, কিরূপেই বা সেগুলি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও আপনাদিগকে বলিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুশৃঙ্খলভাবে সভায় কার্য আরম্ভ করিতেই বিলম্ব হইয়াছে, আর এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অধিক বিলম্ব ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে সভায় যোগদান করিতে চেষ্টা করিব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আর একটি কথা বলিলেই আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইবে। ভারতে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম নিশ্চল অবস্থায় আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই 'ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। অতীতকালে বরাবর যেরূপ হইয়া আসিয়াছে, তেমনি এখনও রাজপ্রাসাদে এবং দরিদ্রের পর্ণকুটিরে ধর্ম যেন সমভাবে প্রবেশ করে। এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার এবং জন্মগত সর্বজনীন স্বত্বরূপে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহ-দ্বারে মুক্তহস্তে লইয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াস-লভ্য, ভারতের ধর্মকেও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে। ভারতে আমাদিগকে এইভাবেই কাজ করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং মতানৈক্য লইয়া বিবাদ করিয়া নহে।

আমি তোমাদিগকে কার্যপ্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে-সকল বিষয়ে আমারা সকলেই একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক; যে-সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে। আমি যেমন বার বার বলিয়াছি, কোন ঘরে যদি বহু শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, এবং যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতে থাকি, 'উঃ কি অন্ধকার! কি অন্ধকার!' তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। মানুষের সংস্কার-সাধন করিবার ইহাই রহস্য। তাহাদিগকে উচ্চতর বিষয়সমূহের আভাস দাও—প্রথমেই মানুষের উপর অবিশ্বাস লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি মানুষের উপর—খুব খারাপ মানুষের উপরও বিশ্বাস করিয়া কখনও বিফল হই নাই। সর্বস্থলেই পরিণামে জয়লাভ হইয়াছে। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা সে পণ্ডিতই হউক বা অজ্ঞ মূর্খ বলিয়াই প্রতীয়মান হউক। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা তাহাকে দেবতা অথবা সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়াই বোধ হউক। প্রথমে মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তারপর এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়া ইহাও বুঝিতে চেষ্টা কর—যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে কিছু ভুল করে, যদি সে অতিশয় ঘৃণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে জানিও—তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে ঐগুলি প্রসূত হয় নাই, উচ্চতর আদর্শের অভাব হইতেই ঐরূপ হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যে অসত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই—সে সত্যকে ধরিতে পারিতেছে না। অতএব যাহা মিথ্যা, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায়—যাহা সত্য, তাহা মানুষকে দিতে হইবে। সত্য কি, তাহাকে জানাইয়া দাও। সত্যের সহিত সে নিজ ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে, ঐখানেই তোমার কাজ শেষ হইয়া গেল। সে এখন মনে মনে তাহার পূর্ব-ধারণার সহিত উহার তুলনা করুক। আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে; আলোক অবশ্যই অন্ধকার দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের সদ্ভাবকে প্রকাশিত করিবে। যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে চাও, তবে ইহাই পথ—ইহাই একমাত্র পথ; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ফল হইবে না; বা তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা মন্দ—এ কথা বলিলেও কিছু হইবে না। তাহাদের সম্মুখে ভালটি ধর, দেখিবে কি আগ্রহের সহিত তাহারা

উহা গ্রহণ করে! মানুষের অন্তর্যামী সেই অবিনাশী ঐশীশক্তি জাগ্রত হইয়া যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহিমময়, তাহারই জন্য হস্ত প্রসারণ করে।

যিনি আমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা, যিনি আমাদের পূর্বপুরুষগণের ঈশ্বর—যাঁহাকে বিষ্ণু শিব শক্তি বা গণপতি, যে নামেই ডাকা হউক না কেন—যাঁহাকে সগুণ বা নির্গুণ যেরূপেই উপাসনা করা হউক না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাঁহাকে জানিয়া 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহান্ প্রেম লইয়া আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাঁহার শুভাশীর্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার কৃপায় আমরা যেন পরস্পরকে বুঝিতে সমর্থ হই, তাঁহার কৃপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও তীব্র সত্যানুরাগের সহিত পরস্পরের জন্য কাজ করিতে পারি, এবং ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন-রূপ মহৎ কার্যের মধ্যে যেন আমাদের ব্যক্তিগত যশ ও স্বার্থ—ব্যক্তিগত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ না করে!

# ২৪. ভক্তি

[৯ নভেম্বর, ১৮৯৭, সন্ধ্যা ৬|| ঘটিকায় গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের তাঁবুতে ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতা হয়। ইহাই লাহোরে স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা। লালা বালমুকুন্দ সভাপতি ছিলেন। লাহোর হইতে প্রকাশিত ‘ট্রিবিউন’-পত্রে বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হয়।]

উপনিষদসমূহের গম্ভীরনাদী প্রবাহের মধ্যে একটি শব্দ দূরাগত প্রতিধ্বনির ন্যায় আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদিও উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি সমগ্র বেদান্ত-সাহিত্যে উহা স্পষ্ট হইলেও তত প্রবল নহে। উপনিষদগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয়—যেন আমাদের সম্মুখে ভূমার ভাব ও চিত্র উপস্থিত করা। তথাপি এই অদ্ভুত ভাবগাম্ভীর্যের পশ্চাতে মধ্যে মধ্যে আমরা কবিত্বেরও আভাস পাই; যথা— ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।৫৪ সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে, এই-সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, অগ্নির তো কথাই নাই।

এই অপূর্ব পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনিতে শুনিতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে, এমন কি মনোরাজ্য হইতে দূরে অতি দূরে নীত হই—এমন এক জগতে নীত হই, যাহা কোন কালে বুঝিবার উপায় নাই; অথচ তাহা সর্বদা আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। এই মহান্ ভাবের পিছনেও ছায়ার ন্যায় অনুগামী আর একটি মহান্ ভাব আছে, যাহা মানবজাতির অধিকতর গ্রহণযোগ্য, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণের অধিকতর উপযোগী, যাহা মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রবেশ করান যাইতে পারে। এই ভক্তিবীজ ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে পূর্ণভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে—আমরা পুরাণকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি।

পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্বাবধি বর্তমান; সংহিতাতেও উহার পরিচয়, উপনিষদে কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ, কিন্তু পুরাণে বিস্তারিত

আলোচনা পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তি কী বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক। পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া ইদানীং বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে ওখান হইতে অনেক অংশ লইয়া সমালোচনা হইয়াছে, যেগুলির ঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে, ঐ অংশগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে টিকিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিয়া, পৌরাণিক উক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ভৌগোলিক ও জ্যোতিষিক সত্যাসত্য প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া একটি জিনিষ আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই; প্রায় সকল পুরাণেই আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে সর্বত্র এই ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু-মহাত্মা ও রাজর্ষিগণের চরিত্র-বর্ণনমুখে উহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্যের মহান্ আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃতি করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কাজ বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই আদর্শ সাধারণ মানবের ধারণার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা বেদান্তালোকের পূর্ণচ্ছটার মহিমা বুঝিতে ও উহার আদর করিতে পারেন—উহার তত্ত্বগুলি জীবনে পরিণত করা তো দূরের কথা। কারণ প্রকৃত বেদান্তীর প্রথম কার্য 'অভীঃ' বা নির্ভীক হওয়া। যদি কেহ বেদান্তী হইবার স্পর্ধা রাখে, তাহাকে হৃদয় হইতে ভয় একেবারে নির্বাসিত করিতে হইবে। আর আমরা জানি, ইহা কত কঠিন। যাঁহারা সংসারের সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের এমন বন্ধন খুব কমই আছে, যাহা তাঁহাদিগকে দুর্বল কাপুরুষ করিয়া ফেলিতে পারে, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা কত দুর্বল, কত কোমল, কত নিস্তেজ। যাহাদের চারিদিকে বন্ধন, যাহারা অন্তরে বাহিরে শত সহস্র বিষয়ের দাস হইয়া রহিয়াছে, জীবনের প্রতি মুহূর্তেই দাসত্ব যাহাদিগকে ক্রমশঃ নীচের দিকে টানিতেছে, তাহারা আরও বেশী দুর্বল। এরূপ ব্যক্তিদের নিকট পুরাণসমূহ ভক্তির অতি মনোহারিণী বার্তা বহন করিয়া আনে।

তাহাদেরই জন্য ভক্তির এই কোমল ও কবিত্বময় ভাব প্রচারিত, তাহাদেরই জন্য ধ্রুব প্রহ্লাদ ও শত সহস্র সাধুগণের এই-সকল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনী বিবৃত; এবং এই দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য—লোকে যাহাতে এই ভক্তিকে নিজ নিজ জীবনে বিকাশ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা। আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যাঁহার জীবনে প্রহ্লাদ ধ্রুব বা ঐ-সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যানের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।

আধুনিক কালে পুরাণগুলির প্রভাব শুধু স্বীকার করিলেই চলিবে না, পুরাণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ পরবর্তী যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদিগকে যে-ধর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, পুরাণগুলি আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর ও উন্নততর এবং সর্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। ভক্তির সহজ ও সুখসাধ্য ভাব লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই হইবে না, এই ভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ আমরা পরে দেখিব—এই ভক্তির ভাবটি ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমে পরিণত হয়। যতদিন ব্যক্তিগত ও বিষয়গত প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। যতদিন সাহায্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করারূপ মানবীয় দুর্বলতা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরাণ কোন না কোন আকারে থাকিবেই থাকিবে। আপনারা ঐগুলির নাম পরিবর্তন করিতে পারেন, আপনারা এতকাল যাবৎ প্রচলিত পুরাণগুলির নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া আর একখানি নূতন পুরাণ প্রণয়ন করিতে হইবে। ধরুন, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল—তিনি এই-সকল প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার করিলেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশ বৎসর যাইতে না যাইতে দেখিবেন, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহারই জীবন অবলম্বন করিয়া একখানি পুরাণ রচনা করিয়া ফেলিবে। পুরাণ ছাড়িবার জো নাই, প্রাচীন পুরাণ ও আধুনিক পুরাণ—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। মানুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিয়া থাকে। যাঁহারা সমুদয় মানবীয় দুর্বলতার অতীত হইয়া প্রকৃত পরমহংসোচিত নির্ভীকতা লাভ

করিয়াছেন, যাঁহারা মায়ার বন্ধন, এমন কি স্বাভাবিক অভাবগুলি পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, শুধু সেই বিজয়মহিমায় মণ্ডিত দেবমানবদেরই পুরাণের প্রয়োজন নাই।

ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে সাধারণ মানুষের চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত ঈশ্বরের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী-পুত্র, পিতা-বন্ধু, আচার্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিক আবশ্যক। আলোকের স্পন্দন সর্বত্রই থাকিতে পারে, অন্ধকার স্থানেও থাকিতে পারে; বিড়াল ও অন্যান্য জন্তু যে অন্ধকারেও দেখিতে পায়, এই ঘটনা হইতেই ইহা অনুমিত হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে হইলে আমরা যে স্তরে রহিয়াছি, আলোককে তদুপযোগী স্তরের স্পন্দনবিশিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং আমরা এক নির্গুণ নিরাকার সত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি বটে, কিন্তু যতদিন আমরা সাধারণ মর্ত্যজীব, ততদিন আমাদিগকে কেবল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতই মানুষ-ভাবাপন্ন। সত্য-সত্যই এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্যই দেখিতে পাই, যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে, আর যদিও ঐ সঙ্গে স্বভাবতঃ যে-সকল বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, ঐসব বাড়াবাড়ির কতকগুলি আমরা নিন্দা বা সমালোচনা করিতে পারি, তথাপি আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই, তত্ত্বটির মর্মদেশ অটুট রহিয়াছে; এই-সব বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও, এই-সকল চরমে উঠা সত্ত্বেও এই প্রচারিত মতবাদে সারবস্তু আছে, উহার অন্তরতম অংশ খাঁটি ও সুদৃঢ়—উহার একটা মেরুদণ্ড আছে।

না বুঝিয়া কোন পুরাতন উপকথা বা অবিজ্ঞাতিক দুর্বোধ্য শব্দরাশি আপনাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে বলিতেছি না, কতকগুলি পুরাণের ভিতর দুর্ভাগ্যবশতঃ যে-সকল বামাচারী ব্যাখ্যা প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না; কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এগুলির ভিতর একটি সারবস্তু আছে, এগুলির লোপ না পাইবার একটি কারণ আছে। ভক্তির উপদেশ দেওয়া, ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত

করা, দার্শনিক উচ্চস্তরে বিচরণশীল ধর্মকে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনে কাজে পরিণত করাই পুরাণগুলির স্থায়িত্বের কারণ।

মানুষ এখন যেরূপ অবস্থায় আছে, ঈশ্বরেচ্ছায় সেরূপ না হইলে বড় ভাল হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনার প্রতিবাদ করা বৃথা। চৈতন্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, এখনও সে জড়ভাবাপন্ন। সেই জড়ভাবাপন্ন মানবকে হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিতে হইবে, যতদিন না সে চৈতন্যময়, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়। আজকালকার দিনে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিকতা বুঝা কঠিন, এ বিষয়ে কিছু বলা আরও কঠিন। যে প্রেরণা-শক্তি আমাদিগকে কার্যক্ষেত্রে আগাইয়া দিতেছে এবং যে-সব ফল আমরা লাভ করিতে চাহিতেছি, সে-সবই জড়।

হার্বাট স্পেন্সারের ভাষায় বলি—আমরা কেবল স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিতে পারি। পুরাণকারগণের এই সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহারা লোককে এই স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিবার প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। এইভাবে উপদেশ দেওয়াতে পুরাণগুলি লোকের কল্যাণসাধনে যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব; ভক্তির আদর্শ অবশ্য আধ্যাত্মিক—উহার লক্ষ্য চৈতন্য, কিন্তু পথ জড়ের ভিতর দিয়া, এবং জড়ের সাহায্য অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব জড়জগতের যাহা-কিছু এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে সাহায্য করে, সে-সবই লইতে হইবে এবং সেগুলিকে এমনভাবে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে, যাহাতে জড়ভাবাপন্ন মানুষ ক্রমে উন্নত হইয়া আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে পারে। গোড়া হইতেই শাস্ত্র জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছে। যদি জড়বস্তু দ্বারা মন্দির নির্মাণ করিয়া মানুষ ভগবানকে বেশী ভালবাসিতে পারে, সে তো খুব ভাল কথা; যদি ভগবানের প্রতিমা গঠন করিয়া সে এই প্রেমের আদর্শে উপনীত হইবার সাহায্য লাভ করে, ভগবান্ তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন!—সে যদি চায়, তাহাকে বিশটি প্রতিমা পূজা করিতে দাও। যে-কোন বিষয় হউক, যদি ঐগুলি তাহাকে ধর্মের সেই চরম লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে সাহায়তা করে, এবং যদি তাহা নীতিবিরুদ্ধ না হয়, তবে অবাধে সে ঐগুলি অবলম্বন করুক।

'নীতিবিরুদ্ধ না হয়'—এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিবিরুদ্ধ বিষয় আমাদের ধর্মপথে সহায় না হইয়া বরং বহুল বিঘ্নই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ভারতে ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিমা-ব্যবহারের যাঁহারা বিরোধিতা করেন, কবীর তাঁহাদের অন্যতম; ভারতে এমন অনেক বড় বড় দার্শনিক ও ধর্মসংস্থাপকের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না—ভগবান্ সগুণ বা ব্যক্তিভাবাপন্ন, এবং অকুতোভয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে সেই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাও প্রতিমাপূজায় দোষারোপ করেন নাই। বড়জোর বলা যায়, তাঁহারা উহাকে খুব উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কোন পুরাণেই প্রতিমাপূজাকে উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলা হয় নাই। যে-সব য়াহুদী বিশ্বাস করিতেন, জিহোবা একটি পেটিকায় অবস্থান করেন, তাঁহারাও মূর্তিপূজক ছিলেন। শুধু অপরে মন্দ বলে বলিয়া মূর্তিপূজায় দোষারোপ করা উচিত নহে। বরং প্রতিমা বা অপর কোন জড়বস্তু যদি মানুষকে ধর্মলাভে সাহায্য করে, তবে স্বচ্ছন্দে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আর আমাদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহাতে এ-কথা অতি পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই যে, জড়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত মূর্তিপূজা অতি নিম্নস্তরের উপাসনা।

সমগ্র ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জোর করিয়া প্রতিমাপূজা চাপাইবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার দোষ দেখাইবার উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। কাহার কি উপাসনা করা উচিত এবং কোন্ বস্তু অবলম্বন করিয়া উপাসনা করা উচিত, এ বিষয়ে হুকুম করিবার জন্য অন্যের কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল? সে কি করিয়া জানিবে, কিসের সাহায্যে আর একজনের উন্নতি হইবে—প্রতিমাপূজা দ্বারা, না অগ্নিপূজা দ্বারা, না এমন কি একটা স্তম্ভের উপাসনা দ্বারা? আমাদের নিজ নিজ গুরু এবং গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ দ্বারাই এ-সকল বিষয় নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হইবে। ভক্তিগ্রন্থে ইষ্টসম্বন্ধে যে-নিয়ম আছে, তাহা হইতেই ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক লোককেই তাহার বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার বিশেষ পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আর সেই নির্বাচিত পথই তাহার 'ইষ্ট'। অন্য উপাসনাগুলিকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ উপাসনাপদ্ধতি-অনুসারে সাধন করিতে হইবে—যতদিন না সাধক গন্তব্য স্থলে উপনীত হন, যতদিন না তিনি সেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হন, যেখানে আর জড়ের সাহায্য প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত কুলগুরুপ্রথা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য দু-চারিটি কথা বলা আবশ্যক—ঐ প্রথা এক প্রকার বংশপরম্পরাগত গুরুগিরিমাত্র। শাস্ত্রে আমরা পড়িয়া থাকি, যিনি বেদের সারমর্ম বুঝেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অর্থলোভে বা অপর কোন উদ্দেশ্যে লোককে শিক্ষা দেন না, যাঁহার কৃপা অহৈতুকী, বসন্ত ঋতু যেমন বৃক্ষলতাদির নিকট কিছু প্রার্থনা করে না, কিন্তু যেমন বসন্তাগমে বৃক্ষলতাদি সতেজ হইয়া উঠে, উহাদের নূতন ফলপত্র-মুকুলাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ যাঁহার স্বভাবই লোকের কল্যাণসাধন করা, যিনি উহার পরিবর্তে কিছুই চাহেন না, যাঁহার সারাজীবনই অপরের কল্যাণের জন্য, এইরূপ লোকই গুরুপদবাচ্য, অন্যে নহে।৫৫ অসদ্‌গুরুর নিকট তো জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাই নাই, বরং তাঁহার শিক্ষায় একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। কারণ গুরু কেবল শিক্ষক বা উপদেষ্টামাত্র নহেন, শিক্ষকতা তাঁহার কর্তব্যের অতি সামান্য অংশমাত্র। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, গুরু শিষ্যে শক্তিসঞ্চার করেন। সাধারণ জড়জগতের একটি দৃষ্টান্ত ধরুন—যদি কোন ব্যক্তি ভাল বীজের টিকা না লয়, তাহার শরীরে দূষিত অনিষ্টকর বীজ প্রবেশের ভয় আছে। সেইরূপ অসদ্‌গুরুর শিক্ষায় কিছু মন্দ শিখিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে এই কুলগুরুর ভাবটি উঠিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। গুরুর কার্য যেন ব্যবসায়ে পরিণত না হয়। ইহা নিবারণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিজেকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিবার সময় কুলগুরুপ্রথা যে-অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সমর্থন করা কাহারও উচিত নহে।

আহার সম্বন্ধে আজকাল যে কঠোর নিয়মের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, সেটির অধিকাংশ বাহ্য ব্যাপার এবং যে উদ্দেশ্যে ঐ-সকল নিয়ম প্রথম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য এখন লোপ পাইয়াছে। কে খাদ্য স্পর্শ করিতে পাইবে, এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার এক অতি গভীর দার্শনিক অর্থ আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক

জীবনে এই সাবধানতা রক্ষা করা কঠিন বা অসম্ভব। যে-ভাবটি পালন করা কেবল ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাধকের পক্ষেই সম্ভব, তাহা সাধারণের জন্য নির্দেশ করা ভুল হইয়াছে। কেন না, জনসাধারণের অধিকাংশই জড়সুখের আস্বাদে অতৃপ্ত; এবং তৃপ্তির পূর্বেই জোর করিয়া তাহাদের উপর ধর্ম চাপাইয়া দিবার সঙ্কল্প করা বৃথা।

ভক্তের জন্য বিহিত উপাসনাপদ্ধতিগুলির মধ্যে মানুষের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক যদি কোনরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী একটি, ছয়টি বা দ্বাদশটি দরিদ্রকে প্রত্যহ নিজ গৃহে আনিয়া নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিলে ভাল হয়। অনেক দেশে দানের প্রথা দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু উহাতে তেমন সুফল না হওয়ার কারণ এই যে, উহা যথাযথ ভাবের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। ‘এই নিয়ে যা’ –এ-ভাবে দান বা দয়াধর্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, পরন্তু উহা হৃদয়ের অহঙ্কারের পরিচায়ক; দানের উদ্দেশ্য—জগৎ যেন জানিতে না পারে যে, দাতা দয়াধর্ম করিতেছে। হিন্দুদের অবশ্য জানা উচিত যে, স্মৃতির মতে—দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট; গ্রহীতা সেই সময় স্বয়ং নারায়ণ, সুতরাং আমার মতে এইরূপ নূতন ধরনের পূজাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিলে ভাল হয়—কতিপয় দরিদ্র অন্ধ বা ক্ষুধার্ত নারায়ণকে প্রত্যহ প্রতিগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিমার যেরূপ পূজা হয়, অশন-বসন দ্বারা তাহাদের সেইরূপ পূজা করা। পরদিবস আবার কতকগুলি লোককে লইয়া আসিয়া ঐরূপে পূজা করা। আমি কোন উপাসনাপ্রণালীর দোষ দিতেছি না, কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এইভাবে নারায়ণপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা এবং ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

উপসংহারে আমি ভক্তিকে একটি ত্রিকোণের সহিত তুলনা করিতেছি। ইহার প্রথম কোণ—প্রকৃত ভক্তি বা প্রেম কিছুই চাহে না। প্রেমে ভয় নাই—ইহাই উহার দ্বিতীয় কোণ। পুরস্কার বা প্রতিদানের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ভিক্ষুকের ধর্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম, প্রকৃত ধর্মের সহিত উহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। কেহ যেন ভিক্ষুক না হন, কারণ ভিক্ষুকতা নাস্তিকতার চিহ্ন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করে, সে মূর্খ নয়তো কি? তেমনি জড়বস্তুর জন্য ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করে, সেও মূর্খ। ভক্তকে সর্বদাই এই

কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবেঃ প্রভো, আমি তোমার নিকট কিছুই চাহি না, কিন্তু যদি তোমার কিছু প্রয়োজন থাকে, আমি দিতে প্রস্তুত। প্রেমে ভয় থাকে না। আপনারা কি দেখেন নাই যে, ক্ষীণকায় অবলা নারী পথ দিয়া যাইতে যাইতে কুকুরের চীৎকারে নিকটতম গৃহে পলাইয়া আশ্রয় লয়? পরদিন সে পথ চলিতেছে—সঙ্গে তাহার শিশুপুত্র। হঠাৎ একটা সিংহ শিশুটিকে আক্রমণ করিল—তখন কি তাহাকে পূর্বদিনের মত পলাইতে দেখিবেন? কখনই না। সে তাহার সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইতেও প্রস্তুত।

তৃতীয় বা সর্বশেষ কোণ এই যে, প্রেমই প্রেমের লক্ষ্য। ভক্ত অবশেষে এইভাবে উপনীত হন যে, শুধু প্রেমই ঈশ্বর, অন্য কিছু নয়। ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে মানুষ আর কোথায় যাইবে? সকল দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। তিনিই সেই শক্তি, যাহা চন্দ্র-সূর্য-তারকারাশি পরিচালিত করিতেছে এবং নরনারী ও ইতর প্রাণিগণের মধ্যে, সকল বস্তুতে সর্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে; জড়রাজ্যে মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি শক্তিরূপে তিনিই প্রকাশিত। তিনি সকল স্থানেই রহিয়াছেন, প্রতি পরমাণুতে রহিয়াছেন, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ। তিনিই সেই অনন্ত প্রেম, যাহা জগতের একমাত্র প্রেরণা-শক্তি এবং সর্বত্র প্রত্যক্ষ স্বয়ং ভগবান্।

# ২৫. বেদান্ত – (লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতা)

[লাহোরে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা, ১২ নভেম্বর, ১৮৯৭]

আমরা দুইটি জগতে বাস করিয়া থাকি—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং মানুষ প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সকল গভীর সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার মহান্ ও সুন্দরের জন্য পিপাসা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া সে যে-সকল উত্তর পাইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে-সকল অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব। বহির্জগৎ হইতে মানুষ যথার্থই মহান্ ভাবসমূহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরে তাহার নিকট অন্য এক জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্মকাণ্ডভাগে আমরা ধর্মের অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ বিবৃত দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই; আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেই অপূর্ব মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে। বোধ হয় প্রলয়াবস্থার এরূপ মহদ্ভাবদ্যোতক বর্ণনা দিতে এ পর্যন্ত কেহ চেষ্টা করেন নাই। তথাপি উহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবের বর্ণনা—উহা স্থূলেরই বর্ণনা, উহাতে যেন এখনও কিছু জড়ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সীমার ভাষায় অসীমের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে; উহা 'দেশে'রই অনন্তত্বের বর্ণনা, মনের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ

জ্ঞানকাণ্ডে দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম প্রণালী ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড়জগৎ হইতেই জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা প্রথমে হইয়াছিল। 'যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা'৫৬—এই হিমালয় পর্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবাসীর গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে গেল, অন্তর্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ 'চৈতন্যে' আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিলঃ মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?—'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।'৫৭—কেহ বলে, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে; কেহ বলে, থাকে না। হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি? এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বহির্জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই, আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; শেষে উত্তর আসিল।

বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত—আরণ্যক বা রহস্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি জড়ের ভাষায় নহে, চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে-সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই-সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতালি দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত—এখন আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে কোনরূপ জোড়াতালি না দিয়া মানবজাতির নিকট মহত্তর সত্যসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; এইরূপ উচ্চতম সত্য জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই।

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ড বিশাল সাগরের মত। উহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলেও অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই বলিয়াছেন, বেদান্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃস্বরূপ,—আর সত্যই ইহা বর্তমান ভারতের বাইবেল-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া 'শ্রুতি' অর্থে উপনিষদ্—কেবল উপনিষদ্ই বুঝাইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের বড় বড় দার্শনিকগণ—ব্যাস, পতঞ্জলি, গৌতম, এমন কি দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্যন্ত—যখন তাঁহাদের মতের সমর্থক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাঁহারা উপনিষদেই উহা পাইয়াছেন, অন্য কোথাও নহে; কারণ উপনিষদসমূহের মধ্যেই সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে।৫৮

কতকগুলি সত্য আছে, যেগুলি কেবল বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, সেগুলিও ততদিন থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক; আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদ উপাসনাপ্রণালী এ-সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রৌত সর্বজনীন সত্যসমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিরকাল স্বমহিমায় অচল, অজেয় ও অবিনাশী।

উপনিষদের যে-সকল তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্মকাণ্ডেই পূর্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ-তত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে; এমন কি মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব—যাহা সকল ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্মাকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাগের বিষয় বলিবার পূর্বে আপনাদের সমক্ষে কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, আর বেদান্ত-শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহা প্রথমেই আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমরা প্রায়ই একটি বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি—আমরা 'বেদান্ত'-শব্দে

কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমান ভারতবর্ষে সকল ধর্মমত অধ্যয়ন করিতে 'প্রস্থানত্রয়' সমভাবে উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসসূত্র। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ববর্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টি ও চরম পরিণতিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে পরস্পর-বিরোধী তাহা নহে, উহাদের মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ, যেন সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসসূত্রে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ্ এবং বেদান্তের অপূর্ব সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসরূপ ব্যাসসূত্রের মাঝখানে বেদান্তের টীকাস্বরূপ ভগবানের মুখনিঃসৃত 'গীতা' বর্তমান।

এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব—ভারতের যে-কোন সম্প্রদায়ই হউন না কেন, যাঁহারাই নিজদিগকে সনাতন-মতাবলম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্, গীতা ও ব্যাসসূত্রকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, কি শঙ্করাচার্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য, কি বল্লভাচার্য, কি শ্রীচৈতন্য—যিনিই নূতন সম্প্রদায়-গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিনটি 'প্রস্থান' গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং এগুলির উপর একটি করিয়া নূতন ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছে। অতএব উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি মতে 'বেদান্ত'-শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। বেদান্ত-শব্দে প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—সবগুলি মতকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন 'বেদান্তী' বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও সেইরূপ। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'-শব্দের দ্বারা বৈদান্তিকই বুঝিয়া থাকি।

আর এই বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—এই তিনটি মত স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের

আবির্ভাবের অনেকদিন পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল—শঙ্কর উহার একজন শেষ প্রতিনিধিমাত্র। রামানুজী মতও তাই—রামানুজের জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিদ্যমান ছিল, এ-কথা তাঁহার লিখিত ভাষ্য হইতেই আমরা জানি। অন্যান্য যে-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় পাশাপাশি ভারতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-সকল মত পরস্পর-বিরোধী নহে। আমাদের ষড়্‌দর্শন যেমন মহান্ তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশমাত্র, ইহা যেমন অতি মৃদুধ্বনিতে আরম্ভ করিয়া শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিণত হইয়াছে, তেমনি পূর্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই, মানব-মন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সবগুলিই অদ্বৈতবাদের সেই বিস্ময়কর একত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী নহে।

অপর দিকে আমি বলিতে বাধ্য, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, এগুলি পরস্পর-বিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী সেইগুলিকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ আছে, টানিয়া সেইগুলির অদ্বৈতবোধক অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলি টানিয়া দ্বৈতবোধক অর্থ করিতেছেন। অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ—আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'—গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোনরূপ অসাধুতার আশ্রয় লইয়া ধর্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ করিবার দরকার নাই, যে-সকল শ্লোকের দ্বারা যে-সব ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই-সকল শ্লোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্লোকের সাদাসিধা অর্থ বুঝা অতি সহজ, আর যখনই তোমরা 'অধিকারভেদে'র অপূর্ব রহস্য বুঝিবে, তখনই উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ইহা সত্য যে, উপনিষদসমূহের লক্ষ্য একটিঃ কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়–‘কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।’৫৯ আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় হইল–চরম একত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা। বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ছাড়া জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত–সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় জ্ঞানের কার্য হয়, তবে এই অপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে–যাহা নামরূপে সহস্র প্রকারে বিভিন্ন, যেখানে জড় ও চৈতন্যে ভেদ, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটি হইতে ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেকটি রূপ অপরটি হইতে পৃথক্, যেখানে একটি বস্তুর সহিত অপর বস্তুর পার্থক্য বিদ্যমান–সেই জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা কি গুরুতর ব্যাপার, ভাবিয়া দেখ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত ‘লোকে’র মধ্যে–এই-সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অন্য দিকে আবার ‘অরুন্ধতী-ন্যায়ে’র প্রয়োগ করিতে হইবে। অরুন্ধতী-নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোন বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পর ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এভাবেই সূক্ষ্মতর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্বে অন্যান্য অনেক স্থূলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতরভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না–তোমাদিগকে কেবল উপনিষদ্ দেখাইয়া দিলেই হইবে, তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই দ্বৈতবাদ–উপাসনার উপদেশ। প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তারূপে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্য, শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা, তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, যে-আচার্য উক্ত প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে উভয় ভাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে,–যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি–কোন ভেদ নাই, ‘তত্ত্বমসি শ্বতকেতো’। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে

রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান, ইহাই শেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপস নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য—নিরাবরণ সত্য—এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, এবং বর্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্য প্রচার করিতে গিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই; ঈশ্বরকৃপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এখন পূর্ব-প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলির আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় যে-বিষয়ে একমত, সেই জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আমি প্রথমে জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, যাহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমাদিগকে এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ বহুযুগ পূর্বে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্ক্রিয়ামাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই সে-দিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। বিজ্ঞান সবেমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ তড়িৎ, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই একটি শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে; সুতরাং লোকে যে-কোন নামেই অভিহিত করুক না কেন, বিজ্ঞান ঐগুলিকে একটিমাত্র নামের দ্বারাই অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু অতি প্রাচীন হইলেও সংহতিতেও সেই শক্তির এরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই বল, তড়িৎই বল, চৌম্বক-শক্তিই বল অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বল—সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র এবং সেই এক শক্তির নাম 'প্রাণ'। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয়, মনে কর? কখনই নহে। যদি বল, শক্তিরাশির একেবারে ধ্বংস হয়, তবে কোন্ বীজ হইতে আবার আগামী জগৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে? কারণ, এই গতি তো চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আর একবার পড়িতেছে; আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এমনি ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে 'সৃষ্টি' বলে। 'সৃষ্টি' আর ইংরেজী ' creation'

শব্দ একার্থক নহে। ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, সংস্কৃত শব্দগুলির যথাসাধ্য অনুবাদ করিয়া বলিতে হয়। ‘সৃষ্টি’ শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া—যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—সেই প্রাথমিক অবস্থায় বিলীন হয়—কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে,—আবার ক্রমশঃ প্রকাশোন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর এই শক্তিগুলির—প্রাণশক্তির কি হয়? তাহারা আদি-প্রাণে পরিণত হয়; এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়—সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না, আর বৈদিক সূক্তের ‘আনীদবাতং’৬০—গতিহীনভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল—এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। উদাহরণস্বরূপ এই ‘বাত’ শব্দটি ধর। কখনও কখনও ইহার দ্বারা ‘বায়ু’ বুঝায়, কখনও গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থ লইয়া গোল করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর তখন ‘ভূতের’ বা জড়পদার্থের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্বভূতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ হইতে প্রকাশিত হয়। এই আকাশই আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে, আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনি এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।

অন্যত্র৬১ আছে—‘যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।’—এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই বাহির হয়। এখানে ‘এজতি’ শব্দটি লক্ষ্য করিও—‘এজ্’ ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া। ‘নিঃসৃতম্’ অর্থ বাহিরে প্রক্ষিপ্ত; ‘যদিদং কিঞ্চ’—জগতে যাহা কিছু।

প্রপঞ্চ-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিভাবে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কম্পন হইতে বায়ুর উৎপত্তি কিভাবে হয় ইত্যাদি—অনেক কথা বলিতে হয়। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট যে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্থূল ভূত সর্বশেষে উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা বাহিরের বস্তু আর এই স্থূল ভূতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম ভূত রহিয়াছে। এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎ দুই তত্ত্বে পর্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও চরম একত্বে পৌঁছান যায় নাই। শক্তিবর্গ 'প্রাণ'রূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ 'আকাশ'রূপ এক বস্তুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই দুইটির মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্যবসিত করা যাইতে পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব—কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই, আর যদি ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে বিজ্ঞান যেমন প্রাচীনদের ন্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী সত্তা, যাঁহার পৌরাণিক নাম ব্রহ্মা—চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞানে যাঁহাকে 'মহৎ' বলা যায়। এখানেই উভয়ের মিলন। দার্শনিক ভাষায় যাহা 'মন' বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই 'মহৎ'-এর কিয়দংশ। মস্তিষ্কের জালে আবদ্ধ ব্যষ্টি-মনের যোগফলকে 'সমষ্টি মন' বলা যায়।

কিন্তু বিশ্লেষণ এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর সমগ্র জগৎ একটি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর ব্যষ্টিতে যাহা হইতেছে, সমষ্টিতেও তাহা ঘটিয়াছে—ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে সমষ্টি-মনে কি হইতেছে, তাহাও অনেকটা নিশ্চিতভাবে অনুমান করিতে পারিতাম। এখন প্রশ্নঃ এই মন কি? বর্তমানকালে পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্মের একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্যবাসীরা আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; কারণ আধুনিক শারীরবিজ্ঞান প্রতি পদে মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইতেছে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা এ- সব তত্ত্ব বরাবর জানি। হিন্দু-বালককে প্রথমেই শিখিতে হয়, মন

জড়পদার্থ—তবে সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে; উহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; উহা আত্মা নহে।

এই 'আত্মা' শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে পারিতেছি না, কারণ ইওরোপে আত্মা-শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই নাই; অতএব এই শব্দের অনুবাদ করা যায় না। জার্মান দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা-শব্দটি Self-শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু যতদিন না এই শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন উহা ব্যবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে Self-ই বল বা আর যাহাই বল, আমাদের 'আত্মা' ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে নিজের যন্ত্র, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় অন্তঃকরণ-রূপে ব্যবহার করেন, আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কাজ করে। এই মন কি? এই সেদিন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষু প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নহে, তাহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্তমান; আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

তোমাদের দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়াই অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্তরিন্দ্রিয়ের—অভ্যন্তরবর্তী মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহের; তুমি সেগুলির যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পার, কিন্তু ইন্দ্রিয়-অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরেজীতে Mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া বলেন যে, মস্তিষ্কই মন এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা কারণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে তোমাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তাহাদিগকে অনায়াসেই বলিতে পার, 'আমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহা জানিতেন।' ইহা তোমাদের ধর্মের মূলসূত্র।

বেশ কথা, এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে

অন্তঃকরণের মূল উপাদান, ইহা 'মহৎ'-এরই অংশ—মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত একটি হ্রদকে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি কি ঘটিবে? প্রথমতঃ জলে যে আঘাত করা হইল, সেইটিই যেন একটি ক্রিয়া, তারপরই জল উত্থিত হইয়া ঐ আঘাতের প্রতিক্রিয়া করিল, আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটি যেন হ্রদ, আর বাহ্য বিষয় ও বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তর। যখনই 'চিত্ত' এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কোন বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে—বাহ্য বস্তুগুলির অনুভূতি ভিতরে বহন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন—তখনই একটি কম্পন উৎপন্ন হয়. উহাই সংশয়াত্মক 'মন'। তারপর একটি প্রতিক্রিয়া হয়—উহা নিশ্চয়াত্মিকা 'বুদ্ধি', আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'অহং' জ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদিত হয়। মনে কর, আমার হাতের উপর একটি মশা আসিয়া দংশন করিল। এই বাহ্য বস্তুজনিত বেদনা আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল—মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই 'মন'। তারপরই একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমার ভিতর এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটি মশা বসিয়াছে, সেটিকে তাড়াইতে হইবে। তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হ্রদে যে-সকল আঘাত আসে, সেগুলি সবই বহির্জগৎ হইতে; কিন্তু চিত্তহ্রদে আঘাত বহির্জগৎ হইতেও আসিতে পারে, আবার অন্তর্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। চিত্ত এবং উহার বিভিন্ন অবস্থার নাম 'অন্তঃকরণ' ।

পূর্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাদিগকে আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে ইহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হইবে। তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই মুক্তা দেখিয়াছ, এবং অনেকেই জান—মুক্তা কিভাবে নির্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, ঠিক সেইভাবে আমরা আমাদের সমগ্র জগৎকে গঠন করিতেছি। বাহ্যজগৎ

হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমন কি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনেরই কিছুটা সেই উত্তেজনার দিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তখন আমাদের নিজ মন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকারিত হয়, আমরা সেইভাবে আকারিত মনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহাদিগকে এ-কথা মানিতে হইবে, আজকাল শারীরবিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে এ-কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জগৎকে আমরা 'ক' বলিয়া নির্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃতপক্ষে ক+মনকে জানিতে পারি, এবং এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটি এত অধিক যে, উহা ঐ 'ক'-এর সর্বাংশব্যাপী, আর ঐ 'ক'-এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অতএব যদি বহির্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা যেরূপ আকারে রূপান্তরিত হয়, উহাকে আমরা সেই ভাবেই জানিতে পারি। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা 'আত্মা+মন' ব্যতীত আর কিছু নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তবে এখানে যাহা হইয়াছে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

তারপর আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিরবচ্ছিন্ন জড়প্রবাহের নামমাত্র। প্রতিমুহূর্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতিমুহূর্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে; যেন একটি সদা-প্রবাহিত নদী—উহার রাশি রাশি জল সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে সমস্তটিকে একবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে সেই একই নদী বলিয়া থাকি। কিন্তু নদীটি প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতিমুহূর্তে নদীর তটভূমি পরিবর্তিত হইতেছে, প্রতিমুহূর্তে তীরবর্তী বৃক্ষলতা এবং পত্রপুষ্পফলাদির পরিবর্তন

ঘটিতেছে। তবে নদীটি কি? নদী এই পরিবর্তন-সমষ্টির নামমাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা এই ক্রমাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই মহান্ 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ' মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এই মত সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ভারতে বেদান্তের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে এই মত উত্থিত হইয়াছিল। এই মতকে নিরস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল, আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে খণ্ডন করিতে সমর্থ, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদের নামে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক ইহাতেই জগতের পরিত্রাণ; কারণ এই অদ্বৈতবাদেই সব কিছুর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপাসনাপ্রণালী হিসাবে দ্বৈতবাদ প্রভৃতি খুব ভাল বটে, ঐগুলি মনের খুব তৃপ্তিকর বটে, হইতে পারে—ঐগুলি মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত একটি নদীস্বরূপ—নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে, অপরদিকে পূর্ণ হইতেছে; তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করি? আমরা দেখি, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্তনীয়—যাহার জন্য আমাদের ধারণাগুলি অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয়। যদি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আলোকরাশি আসিয়া একটি যবনিকা বা দেওয়াল বা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়ে, তখন—কেবল তখনই ঐগুলি এক অখণ্ড সমষ্টির আকার ধারণ করিতে পারে। মানুষের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া অখণ্ডত্বের ভাব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখনও সেই বস্তু হইতে পারে না, কারণ মনও পরিবর্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখনও পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক অখণ্ডভাবে পরিণত হয়,—ইহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মা। আর যখন দেখিতে, সমুদয় জড়পদার্থ—তাহাকে

‘সূক্ষ্ম জড়’ অথবা মন যে-নামেই অভিহিত কর না—এবং সমুদয় স্থূল, জড় বা বাহ্য জগৎ উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না; অতএব উহা চৈতন্যস্বভাব অর্থাৎ উহা জড় নয়, উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

তারপর আর একটি প্রশ্ন আসে। অবশ্য বাহ্য জগৎ দেখিয়া ‘কে উহা সৃষ্টি করিল, কে জড় পদার্থ সৃষ্টি করিল?’—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ উদ্দেশ্যবাদ আনিবার যে পূর্বপ্রচলিত যুক্তি রহিয়াছে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই সত্যকে জানা হইবে—আত্মা সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেইভাবেই উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক-একটি অপরিবর্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই-সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান। নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কাজ করিবে? কী সেই মধ্যবর্তী বস্তু, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কাজ করিবে? তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে আমি যে কিছু অনুভব করিতে পারি, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? এমন কী বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটি আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে—যে-আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কাজ করিবে, যে-আত্মা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিবে, যে-আত্মার সহায়তায় অপর আত্মাসমূহ প্রাণবন্ত হইবে, পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে, পরস্পরের জন্য কাজ করিবে। এই সর্বব্যাপী আত্মাই ‘পরমাত্মা’ নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু, ঈশ্বর। আবার আত্মা যখন জড়পদার্থনির্মিত নয়—চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মানুসারে উহার বিচারও চলিতে পারে না; অতএব আত্মা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥৬২

অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কোন অস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না–এই মানবাত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, নিশ্চল ও চিরন্তন।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু, কপিলের মতেও ইহা সর্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু, কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, ব্যক্ত অবস্থায় উহা অণু।

তারপর আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটিও বিশেষভাবে ভারতীয়–আর এটিই আমাদের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণভাব। এই জন্য আমি তোমাদিগকে এই তত্ত্বটির প্রতি অবহিত হইতে এবং উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ ভারতীয় বলিতে যাহা কিছু–এই তত্ত্বটি সে-সকলেরই ভিত্তিস্বরূপ। জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত শারীর-পরিণামবাদের (doctrine of physical evolution) বিষয় তোমরা শুনিয়াছ। ঐ মতে সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন; আমরা যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক; একটি অপরটিতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে।

যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।' ৬৩

অর্থাৎ এক জাতি অপর জাতিতে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। তবে ইওরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোথায়?–'প্রকৃত্যাপূরাৎ'–প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। ইওরোপীয়গণ বলেনঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন-নির্বাচন প্রভৃতিই এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই

জাত্যন্তরপরিণামের যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতীয়েরা ইওরোপীয়গণ অপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপূরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত ইহয়া বুদ্ধ-রূপে পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রে কোন না কোন আকারে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ না করা যায়, তবে তাহা হইতে তদনুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; হইতে পারে—উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাই-ই চাই। অতএব যদি পরিণামের এক প্রান্ত বুদ্ধ হন, তবে অপর প্রান্তের জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। বুদ্ধ যদি ক্রমবিকশিত জীবাণু হন, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চয়ই ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তি সঙ্কুচিতভাবে থাকিবে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্য কোন ভাব সম্ভব নয়। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলসঞ্চারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশ্যের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তাহা অপেক্ষা অধিক, আবার অতঃপর একজন দেবতুল্য মানবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন, ‘ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ’ । ৬৪

কৃষক যেরূপ তাহার ক্ষেত্রে জলসেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটি প্রণালী কাটিয়াছি, ঐ প্রণালীর মুখে একটি কপাট আছে; পাছে সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এই জন্য ঐ কপাট বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ কপাট খুলিয়া দিলেই জল নিজশক্তিবলেই

উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলের শক্তি বাড়াইতে হইবে না, জলাশয়ের জলে পূর্ব হইতেই ঐ শক্তি রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই কপাট, দেহরূপ এই কপাট—আমাদের যথার্থ এবং পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে; এই জন্যই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি—যেমন আমাদের বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধে; যদিও এ বিষয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি দৃষ্টান্তরূপে আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই-সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্যবিবাহ-প্রথা যে-সকল ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই-সকল ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি পুরুষ বা নারীকে অপর যে কোন নারী বা পুরুষকে পত্নী বা পতিরূপে গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ ও পাশবপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্টপ্রকৃতি অসুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই-সকল পশু-প্রকৃতি সন্তান উৎপন্ন করিতেছে, অপরদিকে তাহাদিগকে বশে রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এভাবে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিভাবে সমাজ হইতে এই-সকল দোষ, এই-সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি নিবারিত হইতে পারে, তাহাই সমস্যা। আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এ-বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিবার অধিকার সমাজের আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ-প্রথার পশ্চাতে এই-সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ 'জাতি' 'গণ' প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভূত সন্তান 'আর্য'

নহে। যে-সন্তানের জন্মমৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আর্য। আজকাল সকল দেশেই এইরূপ আর্যসন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ-নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান্ আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে, আমরা এখন এই-সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারি না; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই-সকল মহান্ ভাবের কতকগুলিকে লইয়া একটা বিকৃত হাস্যকর ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। অতি দুঃখের বিষয়, আজকাল আর প্রাচীন কালের মত পিতামাতা নাই, সমাজও এখন পূর্বের মত শিক্ষিত নয়, আর পূর্বে যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্যকালে যে-রূপই গ্রহণ করুক না কেন, মূল তত্ত্বটি নির্দোষ, আর যদি ঐ তত্ত্ব ঠিকমত কাজে পরিণত না হইয়া থাকে, যদি প্রণালীবিশেষ বিফল হইয়া থাকে, তবে মূল তত্ত্বটি লইয়া যাহাতে উহা ভালভাবে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। মূল তত্ত্বটি নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর কেন?

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কাজে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্ত তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই থাকিবে। তত্ত্বটি যাহাতে ভাল করিয়া কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কে আত্মা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়। শুধু দ্বৈতবাদীরা বলেন—পরে আমরা ইহা বিশেষভাবে দেখিব—অসৎকর্মের দ্বারা আত্মা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার সৎকর্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনও সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি বিদ্যমান, বাহির হইতে কোন কিছু যে আত্মাতে আসিবে তাহা নহে, কোন জিনিষ যে উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের বেদসমূহ inspired—বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে এরূপ নহে,

expired—ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে, বেদসমূহ প্রত্যেক আত্মায় নিহিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে শুধু বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি বিদ্যমান, মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। হয় বল, শক্তি—সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, না হয় বল, মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব হইতেই উহা ভিতরে রহিয়াছে। তোমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; প্রত্যেকের ভিতরে অনন্ত শক্তি যে গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে-শক্তি রহিয়াছে, অতি নিম্নতম মানুষের মধ্যেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব।

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহা বিরোধ আরম্ভ। বৌদ্ধেরা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটি জড়-স্রোত মাত্র; সেইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এইরূপ একটি জড়প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেনঃ উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। উহার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটি দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্যসংলগ্ন গুণরাশির কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা শুধু গুণই স্বীকার করিয়া থাকি। যেখানে একটি কারণ স্বীকার করিলেই সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটি কারণ স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল, আর যে-সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সেইসব মতই খণ্ডন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে—তোমার একটি আত্মা, আমার একটি আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্ একটি একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। অবশ্য দ্বৈতবাদের মত এ পর্যন্ত ঠিক; ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছে, আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এখানে মুশকিল এইটুকু যে, এই আত্মা ও পরামাত্মা

উভয়ই বস্তু, আর উহাদের উপর দেহ মন প্রভৃতি গুণরূপে লাগিয়া রহিয়াছে—স্বীকার করা হয়। এখন কথা এই—কেহই কখনও ‘বস্তু’ দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তাও করিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধেরা বলেন, এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বল না কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? মানসিক তরঙ্গগুলি কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে, উহারা মিলিয়া একটি বস্তু হয় নাই, সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটির পশ্চাতে আর একটি চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটি অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গপরম্পরামাত্র—একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়, যাইবার সময় আর একটির জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে; আর এই-সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই ‘নির্বাণ’ বলে।

তোমরা দেখিতেছ, দ্বৈতবাদ এই মতের নিকট নীরব; দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা অসম্ভব; দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারেন না। সর্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন—বৌদ্ধ বলেন, ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তবে আমি সেই ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহি। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ; ইহা যদি ঈশ্বরের কার্য হয়, বৌদ্ধ বলেন—তবে আমি এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিব। আর দ্বিতীয়তঃ এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তোমরা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। যাঁহারা জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের যুক্তিসমূহের দোষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিলেন না।

তোমরা বলিয়া থাক যে, সত্য—শুধু সত্যই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ‘সত্যমেব জয়তে নানৃত্যং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।’৬৫ সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখনও জয়লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া

থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরিব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ—তোমার ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার; আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক; অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাক; দুর্বল মানুষ তো চিরকালই চীৎকার করিয়া থাকে; যে আমাকে পরাস্ত করিবে, সেই নাস্তিক!

যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে বরাবর যুক্তিবাদী হও। যদি না পার, তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও, অপরকে সেটুকু দাও না কেন? এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব তুমি কিভাবে প্রমাণ করিবে? অপর দিকে, প্রমাণ করা যাইতে পারে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং অনস্তিত্ব-বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে। তোমার ঈশ্বর, তাঁহার গুণ, অসংখ্য জীবাত্মা, আবার প্রত্যেক জীবাত্মাই ব্যক্তি—এই-সকল লইয়া তুমি কেমন করিয়া তাঁহার অস্বিত্ব প্রমাণ করিতে পার? তুমি ব্যক্তি কিসে? দেহরূপে তুমি ব্যক্তি নও, কারণ তোমরা আজ প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও ভালরূপে জান যে, এক সময় হয়তো যে পদার্থ সূর্যে ছিল, আজ তাহা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে, আর হয়তো এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে থাকিতে পারে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? মনের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? আজ তোমার এক রকম ভাব, আবার কাল আর এক ভাব! যখন শিশু ছিলে তখন যেরূপ চিন্তা করিতে, এখন আর সেরূপ চিন্তা কর না; যুবা-অবস্থায় মানুষ যেরূপ চিন্তা করিয়াছে, বৃদ্ধ হইয়া সেরূপ চিন্তা করে না। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই তোমার ব্যক্তিত্ব—এ-কথা বলিও না, জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা তোমার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য-অংশব্যাপী। আমি যখন তোমার সহিত কথা বলি, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে, কিন্তু আমি সে-সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়সমূহ নাই, কারণ আমি তো উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি না।

তবে আর তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদগুলি কোথায় দাঁড়ায়? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিভাবে প্রমাণ করিতে পার?

আবার বৌদ্ধেরা উঠিয়া বলিলেনঃ ইহা যে শুধু অযৌক্তিক তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নীতিবিরুদ্ধও বটে, কারণ উহা মানুষকে কাপুরষ হইতে এবং বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়—কেহই কিন্ত তাহাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষই ইহা এরূপ করিয়াছে। তবে কেন বাহিরের একজন কাল্পনিক ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস কর, যাঁহাকে কেহ কখনও দেখে নাই বা অনুভব করে নাই, অথবা যাঁহার নিকট হইতে কেহ কখনও সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছ, আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিকেই বা কেন শিখাইতেছ যে, মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা কুকুরের মত হওয়া, এবং এক কাল্পনিক পুরুষের সম্মুখে নিজেকে দুর্বল, অপবিত্র ও জগতে অতি হেয় অপদার্থ মনে করিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা?

অপর দিকে বৌদ্ধগণ তোমাকে বলিবেনঃ তুমি নিজেকে এইরূপ বলিয়া শুধু যে মিথ্যাবাদী হইতেছ তাহা নহে, পরন্তু তোমার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছি। কারণ এইটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিও যে, মানুষ যেমন চিন্তা করে, তেমনই হইয়া যায়। নিজেদের সম্বন্ধে তোমরা যেমন বলিবে, ক্রমশঃ তোমাদের বিশ্বাসও তেমনি দাঁড়াইবে। ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম কথাই এইঃ তুমি যাহা ভাবিয়াছ, তাহাই হইয়াছ; আবার যাহা ভাবিবে, তাহাই হইবে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কখনও ভাবিও না যে, তুমি কিছুই নও; আর যতক্ষণ না তুমি এমন কাহারও সাহায্য পাইতেছ—যিনি এখানে থাকেন না, মেঘরাশির উপর বাস করেন—ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহাও ভাবিও না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল হইবে এই যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র, হে প্রভো, আমাদিগকে পবিত্র কর—এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহার ফলে সকল প্রকার পাপের দ্বারা সম্মোহিত হইবে।

বৌদ্ধেরা বলেনঃ প্রত্যেক সমাজে যে-সকল পাপ দেখিতে পাও, সেগুলির শতকরা নব্বই ভাগ আসিয়াছে এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতে, তাঁহার সম্মুখে কুকুরের মত হইয়া থাকার ধারণা হইতে; এই অপূর্ব মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুকুরের মত হইয়া থাকা—ইহা অতি ভয়ানক কথা! বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেনঃ যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠনামক স্থানে গিয়া অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটি এড়াইবার জন্যই নির্বাণ বা বিলুপ্তির চেষ্টা করিতেছেন।

আমি তোমাদের নিকট ঠিক একজন বৌদ্ধের মত হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি, কারণ আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয়। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটিই তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগকে দুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা প্রমাণ করা যায় না। আজকাল কি বালকও এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারে—যেহেতু কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে কুম্ভকারও তো একজন ঈশ্বর! আর যদি কেহ তোমাকে বলে, মাথা ও হাত না থাকিলেও ঈশ্বর কাজ করেন, তবে তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে পার। তোমার জগৎ-সৃষ্টিকর্তা এই ব্যক্তিবিশেষ—যাঁহার নিকট তুমি সারাজীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ—তিনি কি কখনও তোমায় সাহায্য করিয়াছেন? যদি করিয়াই থাকেন, তবে তুমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে এই আর একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিবার জন্য আহ্বান করে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়া দিবে যে, এরূপ যাহা কিছু সাহায্য তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি নিজের চেষ্টাতেই পাইতে পার। পক্ষান্তরে, তোমার এরূপ বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও তুমি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিতে। অধিকন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচার আসিয়া থাকে।

যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেইখানেই অত্যাচার ও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে, আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবটি সমূলে বিনাশ করা হয়, বৌদ্ধগণ বলেন—ততদিন এই অত্যাচারের কখনও নিবৃত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন অলৌকিক পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে। পুরোহিতেরা কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা দাবী করিবে, যাহাতে মানুষ তাহাদের নিকট মাথা নোয়ায় তাহার চেষ্টা করিবে, আর বেচারা মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। তোমরা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, যাহারা তাহাদিগকে নির্মূল করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে, এবং তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ ব্রাহ্মণদের বরং কতকটা সহৃদয়তা ও উদারতা আছে; কিন্তু এই ভূঁইফোড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিখারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরোহিতও থাকিবে, আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চনীতির অভ্যুদয়ের আশা করা যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে।

লোকে কেন এই ঈশ্বর কল্পনা করিল? কারণ প্রাচীনকালে কয়েকজন বলবান্ ব্যক্তি সাধারণ লোককে বশীভূত করিয়া বলিয়াছিল, তোমাদিগকে আমাদের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাদের সমূলে বিনাশ করিব। এইরূপ লোকেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল—ইহার অন্য কোন কারণ নাইঃ 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'—একজন বজ্রহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করেন।

বৌদ্ধ বলিতেছেনঃ তোমরা যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্মফলে হইয়াছে; তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাত্মায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই-সকল জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। এ পর্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ

থাকিলেই কার্য থাকিবে; বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল; এই বর্তমান আবার ভবিষ্যতে অন্য ফল প্রসব করিবে। হিন্দু বলিতেছেনঃ কর্ম জড়, চৈতন্য নহে; সুতরাং কর্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন।

বৌদ্ধ তাহাতে বলেনঃ বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুঁতিয়া গাছে জল দেওয়া হয়, তাহার ফল পাইতে তো কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয় না। বলিতে পার, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবাত্মাগণই তো চৈতন্য, অন্য চৈতন্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদের চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন; কিন্তু জৈনেরা জীবাত্মায় বিশ্বাসী, অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।

তবে হে দ্বৈতবাদিন্, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোমার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? যখন তোমরা অদ্বৈতবাদের উপর দোষারোপ করিয়া বল যে, অদ্বৈতবাদ হইতে দুর্নীতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ; আদালতে দ্বৈতবাদীদের নীতিপরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখ। যদি অদ্বৈতবাদী কুড়ি হাজার দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও কুড়ি হাজার দেখিতে পাইবে। সাধারণভাবে দেখা যায়, দ্বৈতবাদী দুর্বৃত্তের সংখ্যাই অধিক; কারণ অদ্বৈতবাদ বুঝিতে উৎকৃষ্টতর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি যাও কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবার পথ নাই। তুমি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিতে পার, কিন্তু বৌদ্ধ তো বেদ মানে না। সে বলিবেঃ আমার 'ত্রিপিটক' এ-কথা বলে না। ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত—উহা বুদ্ধের লেখাও নহে; কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি শুধু সনাতন সত্যেরই আবৃত্তি করিতেছেন। বৌদ্ধ আরও বলেন, 'তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদের ত্রিপিটকই যথার্থ বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কল্পিত—সেগুলি দূর করিয়া দাও।' এ যুক্তি এড়াইবে কিরূপে?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। দ্রব্য ও গুণ পরস্পর পৃথক্—ইহাই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি, এবং ইহা একটি দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ না, উহারা পৃথক্ নয়; দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তোমরা 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'-এর সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত অবগত আছ। যখন তুমি সর্প দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে অন্তর্হিত। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ বলিয়া বিভক্ত করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাপার মাত্র, উহার কোন যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক্ দুইটি পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি হও, শুধু গুণরাশিই দেখিবে; আর যদি তুমি একজন শক্তিশালী যোগী হও, কেবল দ্রব্যই দেখিবে; কিন্তু একই সময়ে কখনও দ্রব্য ও গুণ দুই-ই দেখিতে পাইবে না। অতএব হে বৌদ্ধ, তুমি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহার বাস্তবিকভিত্তিই নাই; দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটি মাত্র দ্রব্যের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পার যে, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে—উহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মায় আরোপিত, তাহা হইলে তো দুইটি আত্মারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা তুমি কিভাবে জানিতে পার?—কতকগুলি প্রভেদকারী চিহ্ন দ্বারা, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, সেখানে পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দুই আত্মা নাই, এক আত্মাই বিদ্যমান; পৃথক্ পরমাত্মা স্বীকার করাও অনাবশ্যক, তোমার এই আত্মাই সেই পরমাত্মা। সেই এক আত্মাকেই 'পরমাত্মা' বলে, তাঁহাকেই 'জীবাত্মা' এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর হে সাংখ্যবাদী ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া থাক, আত্মা সর্বব্যাপী বিভু, অথচ তোমরা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর? অনন্ত কি কখনও দুইটি হইতে পারে? অনন্ত সত্তা একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সব তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নন। দুর্বল মতবাদসমূহের ন্যায় কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নন।

অদ্বৈতবাদী তখনই অন্যান্য মতাবলম্বীদের সমালোচনা করেন, যখন খুব কাছে আসিয়া তাহারা অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, এই পর্যন্তই তাঁহার অন্যান্য মতাবলম্বীদের বাদখণ্ডন। তারপর তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই শুধু পরমত খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকেন না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ—তিনি বলেনঃ তুমি বলিতেছ—জগৎ একটি অবিরাম গতিপ্রবাহমাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই টেবিলটি—ইহারও প্রতিনিয়ত গতি বা পরিবর্তন হইতেছে। গতি সর্বত্রই, তাই ইহার নাম ‘সংসার’; ‘সৃ’ ধাতুর অর্থ গমন, তাই ইহার নাম ‘জগৎ’—অবিরাম গতি। তাই যদি হইল, তাহা হইলে তো এই জগতে ‘ব্যক্তিত্ব’ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। ‘পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব’ হইতে পারে না, এই বাক্যটি স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। চিন্তা ভাব, মন শরীর, জীব জন্তু—সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটি সমষ্টিরূপে ধর। সমষ্টিরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াই গতির ধারণা সম্ভব। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। সুতরাং তখনই—কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব, যখন তুমি নিজেকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পার। এই কারণেই বেদান্তী—অদ্বৈতবাদী বলেনঃ যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই; মানুষ যখন অপর বলিয়া কিছু দেখে না, অপর বলিয়া কিছু অনুভব করে না, যখন একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই তাহার ভয় দূর হয়; তখনই মানুষ মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি নিজেকে সমগ্র জগৎ-রূপে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে। যখন নিজেকে সমগ্র জগৎ-রূপে জানিবে, তখনই তুমি ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবে, আর তখনই তোমার সহিত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্রসূর্যতারকাদি-সমন্বিত

ব্রহ্মাণ্ড-রূপে দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভাল কাজ করে এবং সেই সৎকর্মবলে অন্যপ্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদিদেবসমন্বিত স্বর্গাদিলোক-রূপে দর্শন করে। যাঁহারা আরও উন্নত, তাঁহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোক-রূপে দেখেন, এবং যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে তাহার ঠিক বিপরীত—এখানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত বর্ণনা। সংহিতায় অস্তিভাবদ্যোতক ভাষায় অনন্তকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে-ভাষায় কুলাইল না, নাস্তিভাবের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইল। এই ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না, না। তোমাদিগকে আবার এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবেঃ যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে উহাকে জানিতে পারি? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?'৬৬ বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে, চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পায়?—পায় না, জানা-ক্রিয়াটিই একটি নিম্নতর অবস্থা।

হে আর্যসন্তানগণ, তোমাদিগকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, কারণ এই তত্ত্বটির ভিতর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তোমাদের নিকট যে-সকল পাশ্চাত্যদেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, সেগুলির একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি এই যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্য ভাব। আমাদের বেদ বলিতেছেনঃ বস্তুজ্ঞান বস্তু হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ জ্ঞান-অর্থে সর্বদাই একটা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তুকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বকথিত দৃষ্টান্তে শুক্তি হইতে যেভাবে মুক্তা হয়, সেই কথা স্মরণ কর, তাহা হইলে

বুঝিবে জ্ঞান-অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটি বস্তুকে আহরণ করিয়া তোমার চেতনায় আনিলে তাহার সমগ্র ভাবটি জানিতে পারিবে না। সকল জ্ঞান-সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তাই যদি হয়, জ্ঞান-অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্তের জ্ঞান-সম্বন্ধে কি উহা কম প্রযোজ্য? যিনি সকল জ্ঞানের স্বরূপ, যাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি কোন জ্ঞান লাভ করিতে পার না, যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র জগতের এবং আমাদের অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ, তুমি কি তাঁহাকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিতে পার? তাঁহাকে তুমি কিরূপে জানিবে? কি উপায়ে তাঁহাকে বাঁধিবে?

সব কিছু—এই জগৎপ্রপঞ্চ এইরূপ বাঁধিবার বৃথা চেষ্টা। এই অনন্ত আত্মা যেন নিজের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন, নিম্নতম প্রাণী হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সব যেন তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত করিবার দর্পণ; আরও কত আধার তিনি গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু কোনটিই পর্যাপ্ত নয়, অবশেষে মনুষ্য-দেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ-সবই সসীম—অনন্ত কখনও সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না।

তারপর শুরু হয় প্রত্যাবর্তন এবং ইহাই ত্যাগ বা বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হও, ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে যাইও না—ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র, কারণ তোমাদিগকে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে তপস্যাতেই জগতের সৃষ্টি—ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিবে, ততই তোমার সম্মুখে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ—বিভিন্ন দেহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে; এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে; অবশেষে তুমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।

এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবেঃ ‘বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ’—বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে কখনও জানিতে পারা যায় না, কারণ যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তোমার চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাকে তুমি কখনও চক্ষু বলিতে পার না; উহা অন্য কিছু, উহা প্রতিবিম্বমাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা—এই অনন্ত সর্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে

অন্ন কি হইল? ইহা তো আমাদের মত চলিতে ফিরিতে, জীবনধারণ করিতে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না; সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে-কথা বুঝিতে পারে না। 'ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ,—এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ'—এই কথাই লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই—যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দভোগ—বেশী করে কাহারা?—যাহারা কুস্তি করিতেছে তাহারা, না দর্শকেরা? এই জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ; আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে-ই স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান হইয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ সে-ই আনন্দ ভোগ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে।

অদ্বৈতবাদের নৈতিক দিক আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আর একটি বিষয় আসিয়া থাকে—উহা মায়াবাদ। অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত এক-একটি বিষয় বুঝিতেই বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে আবার আরও সময় লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটি কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, 'মায়াবাদ' প্রকৃতপক্ষে বাদ বা মত বিশেষ নহে, দেশকালনিমিত্তের নাম 'মায়া'—আরও সংক্ষেপে উহাকে 'নামরূপ' বলে। সমুদ্র হইতে সমুদ্রের তরঙ্গের প্রভেদ কেবল নামে ও রূপে, আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, নাম-রূপ তরঙ্গের সহিতই বর্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইতে পারে; তরঙ্গের অন্তর্গত নাম-রূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই তোমার আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে, আর এই মায়া নাম-রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি ঐগুলিকে পরিত্যাগ কর—নাম-রূপ দূর

করিয়া দাও, তবেই এ-সব পার্থক্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃতপক্ষে যাহা আছ, তাহাই থাকিবে। ইহাই মায়া। কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলী বর্ণনামাত্র।

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব আছে। সেই বেচারারা অজ্ঞ, বালকবৎ; তাহারা যে বলে জগৎ সত্য—তাহা এই অর্থে বলে যে, এই টেবিলটি বা অন্যান্য বস্তুর নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহাদের অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি উহা বা অন্যান্য বস্তু যেমন আছে, ঠিক তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞানলাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই পরস্পরের উপর নির্ভর করে, সব-কিছুই আপেক্ষিক। আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটি সোপান আছেঃ প্রথম—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পৃথক্; দ্বিতীয় সোপান—সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান; আর শেষ সোপান—একটি মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি।

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা—তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বরধারণা খুব মানবভাবাপন্ন—মানুষ যাহা করে, তিনিও তাহাই করেন, তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী করেন। আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প কথায় কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা—একটি শক্তি রহিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃতপক্ষে সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইঁহার কথা লিখিত আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল কল্যাণকর গুণরাশির আধার নহেন। ঈশ্বর ও শয়তান—দুইটি 'দেবতা' থাকিতে পারে না, এক ঈশ্বরের অস্বিত্বই স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে—সাহস করিয়া ভালমন্দ দুই-ই বলিতে হইবে এবং ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৬৭

যিনি সর্বভূতে শান্তি ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্বস্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে।

'হে গার্গী, এ জগতে যাহা কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই তাঁহার অংশমাত্র।' তুমি উহাকে যেমন ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পার। আমার সম্মুখবর্তী এই আলোকের সাহায্যে তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একশত টাকা দিতে পার, আর একজন লোক তোমার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান।

তৃতীয় সোপানঃ ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ—এইগুলি একপর্যায়ভুক্ত শব্দ। প্রকৃতপক্ষে দুইটি বস্তু নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে। তুমি কল্পনা করিতেছ, তুমি শরীর—আবার আত্মা, তুমি একই সঙ্গে এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছ। তাহা কিভাবে হইতে পারে? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাঁহার পক্ষে শরীর-বোধ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যদি তুমি সাধারণ লোক হও, তবে তুমি নিজেকে দেহ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত। কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অন্যান্য জিনিষ আছে—এই-সকল তত্ত্ববিষয়ক ধারণা থাকাতে তাহার মনে হয়, এগুলি একই সময়ে রহিয়াছে। এক-কালে একটি বস্তুরই ধারণা হয়। যখন তুমি জড়বস্তু দেখিতেছ, তখন ঈশ্বরের কথা বলিও না। তুমি কেবল কার্যই দেখিতেছ, কারণকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না। আর যে-মুহূর্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সে-মুহূর্তে কার্য অন্তর্হিত হইবে। এ জগৎ কোথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস করিল?

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
অজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং স্তিমিতসলিলরাশিরপ্রখ্যামাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥৬৮

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় অনির্বচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমা-রহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির বিকারহীন অচিন্ত্যতত্ত্বস্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধ নাই—যিনি অপরিমেয়, যিনি বেদবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্বদা আমাদের—ব্রহ্মতত্ত্ব-অভ্যাসশীলগণের নিকট প্রসিদ্ধ—এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে কিছুই অভাব নাই, স্থিরজলরাশি-সদৃশ নামরহিত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণবিকার-রহিত, ক্ষয়হীন, শান্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।—মানবের এমন অবস্থাও আসিয়া থাকে, তখন তাহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—অবশ্য অজ্ঞেয়বাদীর অর্থে উহা 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' নহে; 'তাহাকে জানিয়াছি' বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ পূর্ব হইতেই তুমি সেই ব্রহ্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক ভাবে এই টেবিল নন, আবার অন্য ভাবে ব্রহ্ম টেবিল বটে। নাম-রূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই যে-সত্যবস্তু থাকিবে, তাহাই তিনি। তিনিই প্রকৃত বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥৬৯

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছ।

তুমি সকল বস্তুতে বিদ্যমান, আমিই তুমি, তুমিই আমি—ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। এ সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিব। এই অদ্বৈতবাদেই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য নিহিত। আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তি তর্ক ও বিজ্ঞানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি। এখানেই অবশেষ যুক্তি বিচার একটি দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখনও তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ববর্তী সোপানগুলির উপর দোষারোপ করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া পিছনের দিকে তাকান এবং ঐগুলিকে আশীর্বাদ করেন; তিনি জানেন সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুলক্রমে অনুভূত ও ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একই সত্য—কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য—সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দেশে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, যাঁহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্যামিরূপে দেখেন, যাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আত্মরূপে ও সমগ্র বিশ্বরূপে অনুভব করেন; এ-সকল একই বস্তু,—একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট, মায়ার ভিন্ন ভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট; আর বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট বলিয়াই এই-সব বিভিন্নতা। শুধু তাই নয়, উহাদের মধ্যে একটি আর একটিতে যাইবার সোপান। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? অন্ধকারে রাস্তায় গিয়া যদি কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিতে দেখ, একজন পথচারীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর; দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জন বলিবে, ভূতে এ ব্যাপার করিতেছি; সে সর্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ অজ্ঞানের স্বভাব কার্যের বাহিরে কারণ অনুসন্ধান করা। একটা ঢিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—মাধ্যাকর্ষণ।

সর্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্মে কী বিরোধ? প্রচলিত ধর্মগুলি বহির্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর জড়িত যে, সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এইরূপ অনন্ত দেবতার কল্পনা করে,

আর ভাবে—যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই একটা না একটা দেবতা বা ভূতে করিতেছে। ইহার মোট কথাটা এই যে, ধর্ম—কোন কিছুর কারণ সেই বস্তুর বাহিরে অন্বেষণ করে, আর বিজ্ঞান তাহার কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান ধীরে ধীরে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের হাত হইতে নিজের হাতে লইতেছে। যেহেতু ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করিয়াছে, সেই হেতু অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের বহির্দেশে অবস্থিত কোন দৈত্য ইহা সৃষ্টি করে নাই, ইহা আপনা-আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা-আপনি ইহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা-আপনি ইহার প্রলয় হইতেছে, ইহা এক অনন্ত সত্তা—ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'৭০ হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই। এইরূপে তোমরা দেখিতেছ, অন্য কোন মতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম; আর বর্তমান অর্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুক্‌নি চলিতেছে, প্রত্যহ যেরূপ যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমরা দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইবে, আর বুদ্ধের কথায় বলিতেছি, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদিগকে কাপুরুষ মনে করিব।

যদি তোমার এইরূপ দুর্বলতা থাকে, যদি তুমি প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পার, তবে অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দাও, বেচারা মূর্তিপূজককে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও না. তাহাকে একটা পিশাচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিও না; যাহার সহিত তোমার মত সম্পূর্ণ না মিলে, তাহার নিকট তোমার মত প্রচার করিতে যাইও না। প্রথমে এইটি বুঝ যে, তুমি নিজে দুর্বল; আর যদি সমাজের ভয় পাও, যদি তোমার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুন ভয় পাও, তবে বুঝিয়া দেখ—যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই কুসংস্কারে আরও কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরও কতদূর বদ্ধ করিবে। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। অন্যের উপর সদয় হও। ঈশ্বরেচ্ছায় কালই যদি সমগ্র জগৎ—শুধু মতে নয়, অনুভূতিতেও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে তো খুব ভালই হয়; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাই কর, সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যাও;

আর জানিও, ভারতে সকল প্রকার ধর্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরও ভাল হইতেছে।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের যুবকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে যে, তাহারা কাহারও কাছে শুনিয়াছে—ঈশ্বর জানেন কাহার কাছে—অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়—আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর; অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই। এ-কথার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, এ-যুক্তি পশুপ্রকৃতি ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, কশাঘাত ব্যতীত যাহাকে দমন করিবার অন্য উপায় নাই। যদি তুমি পশুপ্রকৃতি হও, তবে শুধু কশাঘাতে শাসনযোগ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা তোমার পক্ষে বরং আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কশাঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা সকলে অসুর হইয়া দাঁড়াইবে। যদি এরূপ হয়, তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত—তোমাদের ভাল করিবার আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে তোমাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতবাদ—কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব?—কারণ কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। দেবতার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে বলুক না, আমি উহা মানিতে যাইব কেন? আর ধর, কতকগুলি লোক ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল—তাহাতেই বা কি? জগতের অধিকাংশ লোকের নীতি—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'; তাই বলিতেছি—আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অদ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৭১

অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই জন্য তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকেই হিংসা করিতেছ—কারণ তাহারা সকলেই যে তুমি! তুমি জান আর নাই জান, সকল হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল পা দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখভোগ করিতেছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে নিজেকে হিংসা করা হয়, সেইজন্য কখনও অপরকে হিংসা করা উচিত নহে। সেজন্যই আমি যদি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাতেও আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ আমি যখন শুকাইয়া মরিতেছি, তখন আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র 'আমি-আমার' সম্পর্কীয় বিষয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগৎই আমার, আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আমাকে ও জগৎকে—কে বিনাশ করিতে পারে? কাজেই দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্যন্ত দেখা গেল—একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ-সাধনে লাভ কি? উহাতে শক্তি তেজ ও বীর্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো'৭২ প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে। মানুষকে দুর্বল ভাবিও না, তাহাকে দুর্বল বলিও না। জানিও, সকল পাপ ও সকল অশুভ—এক 'দুর্বলতা' শব্দ দ্বারাই নির্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্যের মূল—দুর্বলতা। যাহা করা উচিত নয়, দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহাই করিয়া থাকে; দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ যে কি, এ তত্ত্ব সকলেই জানুক।

দিবারাত্র তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। ‘আমিই সেই’—এই ওজস্বী ভাবধারা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা পান করুক; তারপর তাহারা উহা চিন্তা করুক; ঐ চিন্তা—ঐ মনন হইতে এমন সব কাজ হইবে, যাহা পৃথিবী কখনও দেখে নাই।

কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্যকর নয়, অর্থাৎ জড়-জগতে এখনও উহার শক্তি প্রকাশিত হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ করঃ

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥৭৩

ওঁ, ইহা মহারহস্য। ওঁ—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওঙ্কার, তাহা জান। এই ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও; তখনই—কেবল তখনই তোমরা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে। যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, তবে বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস কর। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, যে-সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরেজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরানী ছিলেন; পয়সা-কড়ির অভাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং যখন

তিনি অকৃতকার্য হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল—তিনি কোন বড় কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; সেই ব্যক্তিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া বলিতেন, 'হে প্রভু, আমি দুর্বল, আমি হীন', তবে তাঁহার কি গতি হইত? নিশ্চয় উন্মাদাগারেই তাঁহার স্থান হইত। লোকে এই-সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র পৃথিবীতে দেখিয়াছি, দীনতা ও দুর্বলতার উপদেশ দ্বারা অতি অশুভ ফল ফলিয়াছে, ইহা মনুষ্যজাতিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়—এবং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা শেষে আধপাগল-গোছের হইয়া দাঁড়ায়?

অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায়—নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য বা গোপনীয় বিদ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটিরে, সর্বত্র—এমন কি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পরে।

গীতায় কি উক্ত হয় নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ?'—এই ধর্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি স্ত্রী হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ কল্যাণ

হইয়া থাকে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—ওঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিত থাকিও না। এখন অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের পূর্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, আর সে-দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চ স্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর সকলের জীবনে প্রবেশ করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া প্রতি শোণিতবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হউক।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা মার্কিনেরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউ ইউর্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় বাস করিবার জন্য আসিতেছে। দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে—পদদলিত, আশাহীন। কেবল একটি কাপড়ের পুঁটলি তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, তাহারা ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাতের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখন দেখ, ছয়মাস বাদে সেই লোকগুলিই ভাল জামাকাপড় পরিয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীক-দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন অদ্ভুত পরিবর্তন কিভাবে আসিল? মনে কর, সে-ব্যক্তি আর্মেনিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—'তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস তো তোকে পিষে ফেলব।' চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই, গোলাম আছিস—যা আছিস, তাই থাক্। জন্মেছিলি যখন, তখন যে-নৈরাশ্যের অন্ধকারে জন্মেছিলি, সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্।' সেখানকার হাওয়া যেন তাহাকে গুনগুন করিয়া

বলিত, 'তোর কোন আশা নাই—গোলাম হয়ে চিরজীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে পড়ে থাক।' সেখানে বলবান্ ব্যক্তি তাহাকে পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল—একজন ভাল পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাহার করমর্দন করিল। সে যে ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, আর ভদ্রলোকটি যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিতে বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল—এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল—এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয়তো সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সহিত করমর্দন করিয়া আসিল, সেখানে হয়তো সে দেখিল—দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে মলিনবস্ত্র-পরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেণ্টের করমর্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল! এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—মনুষ্যপূর্ণ জগতে সেও একজন মানুষ।

আমাদের এই দেশে—বেদান্তের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে বহু শতাব্দী যাবৎ এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি! তাহাদিগকে বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।' ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ লোক ক্রমশঃ ডুবিতেছে, গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে, মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, অবশেষে ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ এমন দেশ আর কোথায় আছে, যেখানে মানুষকে গো-মহিষাদির সঙ্গে একত্র বাস করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইও না—অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, তোমরা সেই ভ্রমে পড়িও না। ফলও হাতে হাতে দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্তমান। বাস্তবিক দোষ আমাদেরই। সাহস করিয়া দাঁড়াও, নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লও।

অন্যের স্কন্ধে দোষারোপ করিতে যাইও না, তোমরা যে-সকল কষ্ট ভোগ করিতেছ, সেগুলির জন্য তোমরাই দায়ী।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, তোমরা এইটি বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ—বংশপরম্পরাগত এই জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে না পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার—এ-সবে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আবির্ভূত হয়. যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় জাগ্রত হয়, যে-হৃদয় সকলের জন্য অনুভব করে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা দেখা দেয়, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্মজীবনে করা হয়, ততদিন আমাদের আশা নাই। তোমরা ইওরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছ, কিন্তু তাহাদের হৃদয়বত্তার অনুকরণ করিয়াছ কি? আমি তোমাদিগকে একটি গল্প বলিব—আমি স্বচক্ষে যে ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বলিব—তাহা হইলেই তোমরা আমার ভাব বুঝিতে পারিবে। একদল ইউরেশীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া, তাহাদের একটি প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জন করিল। টাকাকড়ি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইওরোপের এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। এই গরীব বেচারারা কোন ইওরোপীয় ভাষার একটি শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অস্ট্রিয়ার ইংরেজ কন্সাল তাহাদিগকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লণ্ডনেও কাহাকেও জানিত না, সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া এই বর্মী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া নিজের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, প্রয়োজনীয় সব দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে খবরটি পাঠাইয়া দিলেন। দেখ, তাহার ফল কী হইল! পরদিনই যেন সমগ্র জাতিটি জাগিয়া উঠিল, চারিদিক হইতে তাহাদের সাহায্যার্থে টাকা আসিতে লাগিল, শেষে তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইওরোপীয়দের রাজনীতিক ও অন্যপ্রকার সভাসমিতি যাহা কিছু আছে, সেগুলি এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অন্ততঃ তাহাদের স্বজাতিপ্রীতির দৃঢ়ভিত্তি। তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে ভালবাসে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর অনুরাগ এবং তাহাদের দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও তাহাদের খুব দয়া। পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র তাহারা কিভাবে অতিথি বলিয়া আমার যত্ন লইয়াছিল, এ-কথা যদি আমি তোমাদের নিকট বার বার না বলি, তাহা হইলে আমি অকৃতজ্ঞতাদোষে দোষী হইব। এখানে সেই হৃদয় কোথায়, যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই জাতির উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজন মিলিয়া একটি ছোটখাটো যৌথ-কারবার খুলিলাম, কিছুদিন চলিতে না চলিতে আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল। তোমরা ইংরেজদের অনুকরণ করিবে বল, আর তাহাদের মত শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাও, কিন্তু তোমাদের ভিত্তি কোথায়? আমাদের বালির ভিত্তি, তাহার উপর নির্মিত গৃহ অতি শীঘ্রই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই বিশাল অদ্বৈতভাবের পতাকা উড্ডীন কর—কারণ আর কোন ভিত্তির উপর সেই অপূর্ব প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবানকে একভাবে সর্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না; সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। ওঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না; ওঠ, আর একবার ওঠ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের 'অহং' বিসর্জন দিতে হইবে। খ্রীষ্টানদের ভাষায় বলিঃ ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা কখনও এক সঙ্গে করিতে পার না। বৈরাগ্যবান্ হও—তোমাদের পূর্বপুরুষগণ বড় বড় কাজ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও; যাও, অন্যের সাহায্য কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেছ, কিন্তু তোমাদের সম্মুখে এই কর্মপরিণতি বেদান্ত স্থাপন করিলাম।

তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি—আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনাহারে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

এই জাতি ডুবিতেছে! লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া গেলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়াছি, সম্মুখে অপর্যাপ্ত আহার্য থাকা সত্ত্বেও যাহাদিগকে আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি—যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই। 'মনে মনে রাখিলেই হইল, ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা যায় না!'—তোমাদের চরিত্রের এই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলো। ওঠ, জাগো, এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি? সকলেই মরিবে—সাধু-অসাধু, ধনী-দরিদ্র—সকলেই মরিবে। শরীর কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব ওঠ, জাগো এবং সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা ভাবকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তে হউক, তিনিই ধীর, যিনি ন্যায়পথ হইতে এক পাও বিচলিত হন না।'৭৪ ওঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ব্যয়িত হইতেছে। ওঠ, জাগো—সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহাদের উদ্ধার কর।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত

হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দুজাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও, পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব ওঠ, জাগো—পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত কর। ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদ একটু কাজে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক জগতে ততটা প্রয়োজন নয়; প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি! মত-মতান্তরে তো আর পেট ভরে না! আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ ঘৃণা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মতবাদের কথা বলিতে পার, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশ অনুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা, ধনী-দরিদ্র, সাধু-অসাধু সকলেই সেই অনন্ত অখণ্ডরূপ—যাঁহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতেছ, ততদিন কিছুই হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অদ্বৈতবাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন ঐগুলি কাজে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—শুধু এ-দেশে নয়, সর্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহমুদ্গরাঘাতে দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মগুলির কাচনির্মিত ভিত্তি সর্বত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা টানিয়া শাস্ত্রীয় শ্লোকের অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে—এতদূর টানা হইতেছে যে, আর টানা চলে না, শ্লোকগুলি তো আর রবার নহে!—শুধু এদেশেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে, ইওরোপ-আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশী। আর সেখানেও ভারত হইতে এই তত্ত্বের অন্ততঃ কিছু অংশ প্রবেশ করা

চাই। ইতঃপূর্বেই কিছু গিয়াছে—উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য উহা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্যদেশে সেখানকার প্রাচীন ভাবাদর্শ লোপ পাইতেছে, এক নূতন ব্যবস্থা—কাঞ্চনের পূজা চালু হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা ও কাঞ্চনপূজা অপেক্ষা সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্মপ্রণালী ছিল ভাল। কোন জাতি যতই প্রবল হউক, এরূপ ভিত্তির উপর কখনই দাঁড়াইতে পারে না। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, তাহাদের বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, সেদিকে প্রথমেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবল আঘাতেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাই নয়, অপরকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে, তোমাদের ভাবরাশি ইওরোপ-আমেরিকাকেও উদ্ধার করিবে। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কাজ রহিয়াছে, আর সেই কাজের প্রথমাংশ—দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর দারিদ্র ও অজ্ঞানতিমিরে মজ্জমান ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উন্নতিসাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহু প্রসারিত কর এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ করঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহজীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

# ২৬. রাজপুতানায়

[স্বামীজী লাহোর হইতে দেরাদুন, সাহারানপুর, দিল্লী, রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়াড় ও জয়পুর হইয়া খেতড়ি গমন করেন। সর্বত্রই তিনি শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগী বন্ধুদের সহিত আলাপ আলোচনা ও ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন এবং ছোট ছোট বক্তৃতা দেন।
খেতড়ি জয়পুরের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। খেতড়ির রাজা অগ্রবর্তী হইয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করেন এবং ছয়ঘোড়ার গাড়িতে স্বামীজীকে তুলিয়া খেতড়িতে উপনীত হন। ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীঃ স্থানীয় স্কুলগৃহে এক সভায় স্বামীজীকে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। সভাপতিত্ব করেন খেতড়ির রাজা। উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ]

ভারতের উন্নতিকল্পে আমি সামান্য যাহা করিয়াছি, রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহা আমি করিতে পারিতাম না। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শ ভোগ, এবং প্রাচ্যদেশের আদর্শ ত্যাগ। খেতড়িনিবাসী যুবকগণ, পাশ্চাত্য-আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য- আদর্শের অনুসরণ কর। শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে-দেবত্ব রহিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা। অতএব শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ-বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।

# ২৭. খেতড়িতে বক্তৃতা—বেদান্ত

২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীঃ খেতড়িতে ডাকবাংলোয় স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে এই বক্তৃতা দেন; সভাপতি হন খেতড়ির রাজা।

গ্রীক ও আর্য-প্রাচীন দুই জাতি বিভিন্ন অবস্থাচক্রে স্থাপিত হইয়াছিল; প্রথমোক্ত জাতি প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু লোভনীয়, তাহার পরিবেশে ও বীর্যপ্রদ আবহাওয়ায় এবং শেষোক্ত জাতি চতুষ্পার্শে সর্ববিধ মহিমময় ভাবের পরিবেষ্টনে ও অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অননুকূল আবহাওয়ায় দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সূচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ গ্রীকগণ বহিঃপ্রকৃতির ও আর্যগণ অন্তঃপ্রকৃতির আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রীক-মন বাহিরের অসীম লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, আর্য-মন ভিতরের অনন্ত অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সভ্যতায় উভয়কেই নির্দিষ্ট বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে যে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে—তাহা নহে, কেবল পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে হইবে—পরস্পরের তুলনা করিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়েই লাভবান্ হইবে। আর্যগণের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রিয়। গণিত ও ব্যাকরণ-বিদ্যায় তাঁহারা অদ্ভুত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং মনোবিশ্লেষণ-বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং ইজিপ্টের নিওপ্লেটোনিকদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু প্রভাব দেখিতে পাই।

বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা স্পেন, জার্মানি ও অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় রাজপুত্র দারাশেকো পারসীতে উপনিষদ্ অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাওয়ার নামক জার্মান দার্শনিক উপনিষদের একখানি লাটিন অনুবাদ দেখিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরই কাণ্টের দর্শনে উপনিষদের শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইওরোপে সাধারণতঃ তুলনামূলক ভাষাবিদ্যাচর্চার৭৫ জন্যই পণ্ডিতগণ

সংস্কৃত আলোচনা করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ডয়সনের মত ব্যক্তিও আছেন, দর্শনচর্চার জন্যই যাঁহাদের দর্শনচর্চায় আগ্রহ আছে, অন্য কারণে নহে। আশা করি, ভবিষ্যতে ইওরোপে সংস্কৃতচর্চায় আরও অধিক যত্ন দেখা যাইবে।

পূর্বকালে 'হিন্দু' শব্দে সিন্ধুনদের অপর তীরের (পূর্বতীরের) অধিবাসিগণকে বুঝাইত—তখন ঐ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শব্দের দ্বারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ সিন্ধুনদের তীরে এখন নানাধর্মাবলম্বী নানা-জাতীয় লোক বাস করে।

বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্য নহে। বেদনিবন্ধ ভাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তার পর সেই গ্রন্থ প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক ধর্মই এইরূপ গ্রন্থে নিবন্ধ, গ্রন্থসমূহের প্রভাবও অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশিরূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহস্র সহস্র বৎসর ঐ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবে বেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করিতে হইবে, পর্বতদৃঢ় ভিত্তির উপর এই বেদবিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বেদরাশি বিপুল সাহিত্য। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটি বেদাংশের চর্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারে ধরে না। এই বেদরাশি অতি প্রাচীনতম, সরল—অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিণত যে, অনেকে মনে করেন—বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই।

বেদের দুইভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের কথা আছে। সংহিতা অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত স্তোত্রাবলী—সাধারণতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্র বা অন্য কোন দেবতার স্তুতি আছে। তারপর প্রশ্ন উঠিল—এই দেবতাগণ কাহারা? এই সম্বন্ধে যেমন এক এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য মতবাদ দ্বারা আবার এই-সকল মত খণ্ডিত হইতে লাগিল; এইরূপ অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

প্রাচীন ব্যাবিলনে আত্মা-সমন্ধে এই ধারণা ছিল যে, মানুষ মরিলে মৃতদেহ হইতে আর একটি দেহ বাহির হয়, উহার স্বাতন্ত্র্য নাই, মূল দেহের সহিত উহা সম্বন্ধ কখনই ছিন্ন করিতে পারে না। মূল শরীরের ন্যায় এই 'দ্বিতীয়' শরীরেরও ক্ষুধাতৃষ্ণ প্রভৃতি বৃত্তিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মূল দেহটিতে কোনরূপ আঘাত করিলে 'দ্বিতীয়'টিও আহত হইবে। মূল দেহটি নষ্ট হইলে 'দ্বিতীয়'টিও নষ্ট হইবে। এই কারণে মৃতদেহ রক্ষা করিবার প্রথার সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই মমি, সমাধিমন্দির প্রভৃতির উৎপত্তি। ইজিপ্ট ও ব্যাবিলনবাসীরা এবং য়াহুদীগণ আর বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আত্মতত্ত্বে পৌঁছিতে পারেন নাই।

এদিকে ম্যাক্সমূলার বলেন, ঋগ্বেদে পিতৃ-উপাসনার সামান্য চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। মমিগণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে—সেখানে এই বীভৎস ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায় না। দেবগণ মানবের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। বেদের কথা বলিতে বলিতে আমি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। বৈদিক ঋষিগণ হয়তো সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন হৃদয়বান্ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, আমরা তো তাঁহাদের তুলনায় পশু।

অনেক বৈদিক মন্ত্রে আছে—'যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও—যেখানে কোন দুঃখ শোক নাই' ইত্যাদি। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যত শীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, স্থূলদেহ ছাড়া একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে; স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কোন দুঃখ নাই—কেবল আনন্দ। সেমিটিক ধর্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর; ঐ ধর্মের ধারণা এই যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদের ভাব এই যে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাহার যথার্থ জীবন আরম্ভ হইবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিলঃ এই দেবগণ কাহারা? ইন্দ্র সময়ে সময়ে মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কখনও কখনও ইন্দ্র অতিরিক্ত সোমপানে মত্ত বলিয়াও বর্ণিত; স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি 'সর্বশক্তিমান্' 'সর্বব্যাপী' প্রভৃতি বিশেষণও প্রয়োগ করা হইয়াছে। বরুণদেব সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেবচরিত্র-বর্ণনাত্মক মন্ত্রগুলি স্থানে স্থানে অতি অপূর্ব। তারপর আর এক কথা। বেদের ভাষা অতি মহদ্ভাব-দ্যোতক। বিখ্যাত 'নাসদীয় সূক্তে' প্রলয়ের চমৎকার বর্ণনা আছে। যাঁহারা এই-সকল মহান্ ভাব এইরূপ কবিত্বের ভষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অসভ্য হন, তবে আমরা কি?সেই ঋষিদের অথবা তাঁহাদের দেবতা ইন্দ্রবরুণাদির সম্বন্ধে আমি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ যেন ক্রমাগত পট-পরিবর্তন হইতেছে, এবং পশ্চাতে সেই এক বস্তু রহিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এই দেবগণের বর্ণনা অতি রহস্যময়, অপূর্ব, অতি সুন্দর। উহার দিকে যেন ঘেঁষিবার জো নাই, উহা এত সূক্ষ্ম যে, স্পর্শ-মাত্রেই যেন উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইবে।

একটি বিষয় আমার নিকট খুব স্পষ্ট ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীকদের ন্যায় আর্যগণও জগৎ-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—সুন্দর রমণীয় বাহ্যজগৎ তাঁহাদিগকেও প্রলুব্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব যে, এখানে কোন বস্তু মহাভাবদ্যোতক না হইলে তাহার কোন মূল্যই নাই। মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিবার ইচ্ছা সাধারণতঃ গ্রীকদের মনে উদিত হয় নাই। এখানে কিন্তু এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছেঃ আমি কি? মৃত্যুর পর আমার কি অবস্থা হইবে? গ্রীকদের মতে মানুষ মরিয়া স্বর্গে যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কি?—সব-কিছুর বাহিরে যাওয়া, ভিতরে নয়—কেবল বাহিরে; গ্রীক মনের লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাই নয়, সে নিজেও যে নিজের বাহিরে। আর যখন সে এমন এক স্থানে গমন করিতে পারিবে, যাহা অনেকটা এই জগতেরই মত, অথচ যেখানে এখানকার দুঃখগুলি নাই, তখনই সে

ভাবিল, যাহা কিছু তাহার প্রার্থনীয়, সে সব পাইল, পার্থিবদুঃখবর্জিত সুখ লাভ করিল, অমনি সে তৃপ্ত হইল—তাহার ধর্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। হিন্দুমনের বিচারে স্বর্গও স্থূল জগতের অন্তর্গত।

হিন্দুরা বলেনঃ যাহা কিছু সংযোগোৎপন্ন, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি জান আত্মা কি?' উত্তর আসিল—'না।' 'ঈশ্বর আছেন কি?' প্রকৃতি উত্তর দিল—'জানি না।' তাঁহারা তখন প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, বুঝিলেন বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান্ হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটি বাণী উত্থিত হইল—অন্যবিধ মহান্ ভাবের ধারণা উদিত হইতে লাগিল। সেই বাণীঃ 'নেতি, নেতি'—ইহা নহে, ইহা নহে; তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য তারা, শুধু তাই কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া গেল—তখন ধর্মের এই নূতন আদর্শের উপর উহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকাম্' ইত্যাদি—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে—এই বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইলেই সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশেই এই সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সেই সীমাবদ্ধ, অপরিণত, ব্যক্তিবিশেষ, সকলের পাপ-পুণ্যের বিচারকারী ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ধারণা রহিল না, আর বাহিরে অন্বেষণ রহিল না, নিজের ভিতরে অন্বেষণ আরম্ভ হইল।—'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।' এইরূপে উপনিষদ্‌সমূহ ভারতের 'বাইবেল' হইয়া দাঁড়াইল। এই উপনিষদ্‌ও অসংখ্য, আর ভারতে যত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই-সকল মতের প্রত্যেকটি যেন এক-একটি সোপানস্বরূপঃ একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পরবর্তী সোপানে আরোহণ করিতে হয়, সর্বশেষে অদ্বৈতবাদে স্বাভাবিক পরিণতি, এবং ইহার শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব—সকলেই যদিও উপনিষদ্‌কেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষদ্ শুধু একটি মত শিক্ষা

দিতেছেন। শঙ্কর এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে উপনিষদ্ কেবল অদ্বৈতপর, উহাতে অন্য কোন উপদেশ নাই; সুতরাং যেখানে স্পষ্ট দ্বৈতভাবাত্মক শ্লোক পাইয়াছেন, সেখানে নিজ মতের পোষকতার জন্য তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ এবং মধ্বও খাঁটি অদ্বৈতভাব-প্রতিপাদক অংশ দ্বৈতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, উপনিষদ্ এক তত্ত্বই শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব সোপানারোহণ-ন্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান ভারতে ধর্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান পড়িয়া আছে। এখানকার লোক এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে; তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাঁড়ি তাহাদের দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-ভাব দূর হওয়া চাই-ই চাই, আর যত শীঘ্র উহা চলিয়া যায়, ততই মঙ্গল। উপনিষদ্‌সমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হউক, আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যেন না থাকে।

[তারপর স্বামীজী উপনিষদে বর্ণিত দুইটি পক্ষীর উদাহরণ দিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন।৭৬
স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ না থাকায় এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্ধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী বলিলেনঃ]

জ্ঞান-অর্থে বহুত্বের মধ্যে একত্বের আবিষ্কার। যখনই কোন বিজ্ঞান সমুদয় বিভিন্নতার অন্তরালে অবস্থিত একত্ব আবিষ্কার করে, তখনই তাহা উচ্চতম সীমায় আরোহণ করে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ন্যায় জড়বিজ্ঞানেও ইহা সত্য।

[খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গীকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও সঙ্গে গেলেন। রাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামীজীর এক বক্তৃতা হইল। প্রায় ৫০০ শ্রোতা

বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বামীজী যোধপুর, আজমীর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।]

# ২৮. ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব

[১৮৯৮ খ্রীঃ ১১ মার্চ স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (মিস এম.ই.নোব্‌ল) কলিকাতার স্টার থিয়েটারে 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। স্বামীজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই উঠিয়া 'সিস্টার'কে সর্বসাধারণের নিকট পরিচয় করিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেনঃ]

সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি যখন এশিয়ার পূর্বভাগে ভ্রমণ করিতেছিলাম, একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, ঐ-সকল স্থানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ও জাপানী মন্দিরসমূহের প্রাচীরে কতকগুলি সুপরিচিত সংস্কৃত মন্ত্র লিখিত দেখিয়া আমি যে কিরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই জানিয়া সুখী হইবেন যে, ঐগুলি সবই প্রাচীন বাঙলা অক্ষরে লিখিত। আমাদের বঙ্গীয় পূর্বপুরুষগণের ধর্মপ্রচারকার্যে মহোৎসাহের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ ঐগুলি আজ পর্যন্ত বিরাজমান।

এশিয়ার অন্তর্গত এই-সকল দেশ ছাড়িয়া দিলেও ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ও স্পষ্ট যে, এমন কি পাশ্চাত্যদেশেও ঐ-সকল স্থানের আচার-ব্যবহারাদির গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া আমি সেখানেও উহার প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ভাবসকল ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে—উভয়ত্রই গমন করিয়াছিল। ইহা এখন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জগৎ ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট কতদূর ঋণী এবং ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি মানবজাতির অতীত

ও বর্তমান জীবনগঠনে কিরূপ শক্তিশালী উপাদান, তাহা এখন সকলেই অবগত আছেন। এ-সব তো অতীতের ঘটনা।

আমি আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই। তাহা এই যে, সেই আশ্চর্য অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি সামাজিক উন্নতি এবং সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশরূপ অত্যদ্ভুত শক্তির বিকাশ করিয়াছে। শুধু তাই কেন, আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি, অ্যাংলো-স্যাক্সনের শক্তির প্রভাব ব্যতীত—আজ আমরা যেমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব আলোচনা করিবার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, সেরূপ হইতে পারিতাম না। আর পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যে—আমাদের স্বদেশে ফিরিয়া দেখিতে পাই, সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন শক্তি সমুদয় দোষসত্ত্বেও তাহার বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট গুণগুলি লইয়া এখানে কাজ করিতেছে। আমার বিশ্বাস, এতদিনে অবশেষে এই উভয় জাতির সম্মিলনের সুমহৎ ফল সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ জাতির বিস্তার ও উন্নতির ভাব আমাদিগকে বলপূর্বক উন্নতির পথে ধাবিত করিতেছে এবং ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীকদিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত; এবং গ্রীক সভ্যতার প্রধান ভাব—প্রকাশ বা বিস্তার। ভারতে আমরা মননশীল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ে সময়ে আমরা এত অধিক মননশীল হই যে, ভাব-প্রকাশের শক্তি আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। ক্রমে এইরূপ হইল যে, পৃথিবীর নিকট আমাদের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি আর প্রকাশিত হইল না, এবং তাহার ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, আমাদের যাহা কিছু ছিল, সবই গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ব্যক্তিবিশেষের ভাবগোপনেচ্ছায় উহা আরম্ভ হইল এবং শেষে ভাব গোপন করাটা জাতীয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমাদের ভাবপ্রকাশের শক্তির এত অভাব হইয়াছে যে, আমরা মৃত জাতি বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকি। ভাবপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা কোথায়? পাশ্চাত্য সভ্যতার মেরুদণ্ড—বিস্তার ও অভিব্যক্তি। ভারতে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির কাজগুলির মধ্যে এই যে-কাজের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম, তাহা আমাদের জাতিকে জাগাইয়া আবার নিজের ভাবপ্রকাশে প্রবর্তিত করিবে, এবং এখনই উহা সেই শক্তিশালী জাতি কর্তৃক আয়োজিত ভাব-বিনিময়ের উপযোগী উপায়গুলির সাহায্য পৃথিবীর নিকট

নিজ গুপ্ত রত্নসমূহ বাহির করিয়া দিবার জন্য ভারতকে উৎসাহিত করিতেছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ভারতের ভাবী উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভাবসমূহ এখন যেরূপ ধীরে ধীরে বহু স্থানে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে সত্য ও মুক্তির মঙ্গল-বার্তা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহাদের কত সুযোগ-সুবিধা ছিল। মহান্ বুদ্ধ কিভাবে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-রূপ অতি উচ্চ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন? তখনও এই ভারতে– যে-ভারতকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি–প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল এবং আমরা সহজেই পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের ভাব প্রচার করিতে পারিতাম। এখন আমরা অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যেও আমাদের ভাব-প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এই প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে এবং আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের দেশ হইতে প্রেরিত বার্তা তাহারা শুনিতেছে, আর শুধু যে শুনিতেছে তাহা নহে, উহার উত্তরও দিতেছে। ইতোমধ্যেই ইংলণ্ড তাহার কয়েকজন মহামনীষীকে আমাদের কাজে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছে। সকলেই আমার বন্ধু মিস মূলারের কথা শুনিয়াছেন এবং বোধ হয় অনেকে তাঁহার সহিত পরিচিতও আছেন–তিনি এখন এখানে এই বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত আছেন। এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলা ভারতের প্রতি অগাধপ্রীতিবশতঃ তাঁহার জীবন ভারতের কল্যাণে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ভারতকে তাঁহার স্বদেশ ও ভারতবাসীকে তাঁহার স্বজন বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই সুপ্রসিদ্ধ উদারস্বভাবা ইংরেজ মহিলার নামের সহিত পরিচিত আছেন–তিনিও ভারতের কল্যাণ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি মিসেস বেসান্টকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই মঞ্চে দুইজন মার্কিন মহিলা রহিয়াছেন–তাঁহারাও তাঁহাদের হৃদয়ে সেই একই উদ্দেশ্য পোষণ করিতেছেন; আর আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারাও আমাদের দরিদ্র দেশের সামান্য কল্যাণের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আমি এই সুযোগে আপনাদের নিকট আমাদের জনৈক শ্রেষ্ঠ স্বদেশবাসীর নাম স্মরণ করাইয়া দিতে

চাই—তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি, তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনেকটা অগ্রসর ও মহামনীষী, দৃঢ়ভাবে অথচ নীরবে আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করিতেছেন; অন্যত্র বিশেষ কাজ না থাকিলে তিনি আজ এই সভায় নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিতেন—আমি শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি। আর এখন ইংলণ্ড আর একটি উপহার-রূপে মিস মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে প্রেরণ করিয়াছেন—ইঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু আশা করি। আর বেশী কিছু না বলিয়া আমি মিস নোব্‌ল্‌কে আপনাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম—আপনারা এখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন।

সিস্টার নিবেদিতার মনোজ্ঞ বক্তৃতার পর স্বামীজী আবার উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

আমি আর দুই-চারটি কথা বলিতে চাই। আমরা এই মাত্র এই ভাব পাইলাম যে, ভারতবাসী আমরাও কিছু করিতে পারি। আর ভারতবাসীদের মধ্যে বাঙালী আমরা এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। তোমাদের মধ্যে একটা অদম্য উৎসাহ, অদম্য চেষ্টা জাগ্রত করিয়া দেওয়াই আমার জীবনব্রত। তুমি অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। কিন্তু একটি বিষয়, যাহা আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্বদা ভুলিয়া যাই, সেদিকে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই—হে মানব, নিজের উপর বিশ্বাসী হও। এই উপায়েই কেবল আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারি। তুমি অদ্বৈতবাদী হও বা দ্বৈতবাদী হও, তুমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী হও বা শঙ্করাচার্যে বিশ্বাসী হও, তুমি ব্যাস বা বিশ্বামিত্র যাঁহারই অনুবর্তী হও না কেন, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত 'আত্মবিশ্বাস' ব্যাপারে ভারতীয় ভাব সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এক মুহূর্তের জন্য ভাবিয়া দেখ—অন্যান্য ধর্মে ও অন্যান্য দেশে আত্মার শক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া থাকে—আত্মাকে তাহারা একরূপ শক্তিহীন দুর্বল নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বিবেচনা করিয়া থাকে; আমরা কিন্তু ভারতে আত্মাকে শাশ্বত বলিয়া মনে করি,

আর আমাদের ধারণা—উহা চিরকাল পূর্ণ থাকিবে। আমাদিগকে সর্বদা উপনিষদের শিক্ষা মনে রাখিতে হইবে।

তোমাদের জীবনের মহান্ ব্রত স্মরণ কর। ভারতবাসী আমরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা বহু পরিমাণে বৈদেশিক ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—উহা আমাদের জাতীয় ধর্মের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত চর্বণ করিয়া ফেলিতেছে। আমরা আজকাল এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছি কেন? আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন কেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব ও উপাদানে গঠিত হইয়া পড়িয়াছে? যদি আমরা জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাই, তবে পাশ্চাত্য অনুকরণ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে; যদি আমরা উঠিতে চাই, তবে ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদিগকে তাহাদের শিল্পবিজ্ঞান—বহিঃপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহ শিখিতে হইবে, আবার পাশ্চাত্যবাসীদিগকে আমাদের নিকট আসিয়া ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে—হিন্দুগণকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমরাই জগতের আচার্য। আমরা এখানে রাজনীতিক অধিকার ও এইরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি। বেশ কথা; কিন্তু অধিকার, সুবিধা—এ-সকল কেবল বন্ধুত্বের ফলেই লাভ করা যায়, আর বন্ধুত্বও কেবল দুইজন সমান সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে। এক পক্ষ যদি চিরকালই ভিক্ষা করিতে থাকে, তবে আর উভয়ের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হইতে পারে? ও-সব কথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু আমি বলিতেছি যে, পরস্পর সাহায্য ব্যতীত আমরা কখনও শক্তিশালী হইতে পারিব না। এইজন্য আমি তোমাদিগকে ভিক্ষুকভাবে নয়, ধর্মাচার্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। কার্যক্ষেত্রে আদান-প্রদানের নিয়ম যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি আমাদিগকে পাশ্চাত্যের নিকট ইহজীবনে সুখী হইবার উপায় ও প্রণালী শিখিতে হয়, তবে কেন তাহার বিনিময়ে আমরা তাহাদিগকে অনন্তকালে সুখী হইবার উপায় ও প্রণালী না শিখাইব?

সর্বোপরি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাক। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাক, উহা ছাড়িয়া দাও। মৃত্যু সকলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আর এই অতি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক সত্যটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিও যে, পৃথিবীর সকল জাতিকে ভারতীয় সাহিত্যে নিবদ্ধ সনাতন সত্যসমূহ শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের পদতলে ধৈর্যের সহিত বসিতে হইবে। ভারতের বিনাশ নাই, চীনের নাই, জাপানেরও নাই; অতএব আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড এবং ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আমাদের এমন একজন পথপ্রদর্শক চাই, যিনি আমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন—ঐ-পথের বিষয় এইমাত্র তোমাদিগকে বলিতেছিলাম। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যে ইহা বিশ্বাস করে না, যদি আমাদের মধ্যে এমন কোন হিন্দুবালক থাকে, যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয় যে, তাহার ধর্ম শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা, আমি তাহাকে 'হিন্দু' বলিব না। আমার মনে পড়িতেছে, কাশ্মীরের কোন পল্লীগ্রামে জনৈক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী? তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় সতেজে উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তাঁহার দয়ায় আমি মুসলমানী।' তারপর একজন হিন্দুকেও ঐ প্রশ্ন করাতে সে সাদাসিধা ভাষায় বলিয়াছিল—'আমি হিন্দু।'

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে—'শ্রদ্ধা' বা অপূর্ব বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমগ্র মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও। জানিও, একজন ক্ষুদ্র বুদ্বুদ-মাত্র বিবেচিত হইতে পারে এবং অপরে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু উভয়েরই পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে। অতএব সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। অনন্ত আশা হইতে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উৎপত্তি হয়। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়,

তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জুনের যুগ লইয়া আসিবে, যে-যুগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর উচ্চ মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল। আজকাল আমরা অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক- চিন্তায় অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছি, কিন্তু এখনও ভারতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা আছে, এত অধিক আছে যে, আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই ভারতকে জগতের বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়াছে। যদি জাতীয় ঐতিহ্য ও আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে সেই গৌরবময় দিনগুলি আমাদের আবার ফিরিয়া আসিবে, আর উহা তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের ধনী ও বড় লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে।

হে দরিদ্র বঙ্গবাসিগণ, ওঠ, তোমরা সব করিতে পার, আর তোমাদিগকে সব করিতেই হইবে। যদিও তোমরা দরিদ্র, তথাপি অনেকে তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। ইহা তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। মনে করিও না—আজ বা কালই উহা হইয়া যাইবে। আমি যেমন আমার দেহ ও আমার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে উহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেইজন্য হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকাকড়ি নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে। এ-কথাই আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম। আবার তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেছি—ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু এখানে প্রমাণ করিতে চাই, সমগ্র ভারতে ‘মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাস-রূপ প্রেমসূত্র’ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আর আমি স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি; ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক।

# ২৯. সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন

[১৮৯৯ খ্রীঃ ২০ জুন তারিখে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। পূর্বদিন ১৯ জুন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণের একটি সভায় স্বামীজী ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। মঠের ডায়েরীতে বক্তৃতার সারাংশ রক্ষিত হয়। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।]

ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ,

এখন দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার অথবা বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিবার সময় নয়। আমি তোমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। আশা—তোমরা এইগুলি কার্যে পরিণত করিবে। প্রথমতঃ আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ উহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে, কারণ সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার সময় এখন নাই, আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাইঃ মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক ব্যক্তি জীবন ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এইঃ আমাদিগকে মরিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই; তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কাজ—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সব যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখী

করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ, কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বিধান করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি অপরের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পার? কারণ সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—তুমি তো ইহার নগণ্য ক্ষুদ্র অংশমাত্র; সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ, না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি মনে নাই?—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৭৭

তোমাদিগকে ধীরে ধীরে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।

তারপর এই আদর্শটিকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে, অসম্ভব আদর্শ ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে। অপর দিকে আবার অতিমাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি তো একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শও খাটো করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি। এই দুইটি 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অপরের পূর্বে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ করিব—এ-ভাবটিও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে, যদি সে তাহার নিজ ভ্রাতার মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল আদর্শবাদের সহিত প্রবল কার্যকারিতা যুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার

পরমুহূর্তেই এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে ছোটখাটো গৃহকর্ম, এমন কি পায়খানা পর্যন্ত সাফ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও।

তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই মঠের উদ্দেশ্য—মানুষ গঠন করা। অমুক ঋষি এই কথা বলিয়াছেন—শুধু এইটি শিখিলেই চলিবে না। সেই ঋষিগণ এখন আর নাই—তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতামতও চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে ঋষি হইতে হইবে। তোমরাও তো মানুষ; মহাপুরুষ, এমন কি অবতার পর্যন্ত যেমন মানুষ, তোমরাও তো সেই মানুষ। তোমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্রপাঠে কি হয়? এমন কি ধ্যানধারণাতেই বা কতদূর হইবে? মন্ত্রতন্ত্রেই বা কি করিতে পারে?তোমাদিগকে এই নূতন প্রণালী—মানুষ গড়িবার নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ তাহাকেই বলা যায়—যে এত বলবান্ যে, তাহাকে শক্তির অবতার বলা যাইতে পারে, আবার যাহার হৃদয়ে নারীসুলভ কোমলতা আছে, কিন্তু তাহা দুর্বলতা নয়। তোমাদের চারিদিকে যে কোটি কোটি প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে, অথচ তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। আবার এইটি বুঝিতে হইবে—স্বাধীনচিন্তা যেমন আবশ্যক, তেমনি আজ্ঞাবহতাও অবশ্য চাই। আপাততঃ এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনে হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে এই দুইটি আপাতবিরুদ্ধ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়া কুমির ধরিতে বলেন, তবে প্রথমে তোমাকে তাঁহাদের কথামত কাজ করিতে হইবে, তারপর তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি সেই আদেশ অন্যায়ও হয়, তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কথানুসারে কাজ কর, তারপর প্রতিবাদ করিও। সম্প্রদায়সমূহের—বিশেষতঃ বাঙলা দেশের সম্প্রদায়গুলির এই এক বিশেষ দোষ যে, যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও একটু ভিন্ন মত হয়, অমনি সে একটি নূতন সম্প্রদায় করিয়া বসে, তাহার আর অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা থাকে না। অতএব তোমাদিগকে নিজ সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে

হইবে। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতাশূন্য হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক কেহ যেন না থাকে। বায়ুর মত মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের মত নম্র এবং আজ্ঞাবহ হও।

# ৩০. আমি কি শিখিয়াছি ?

[স্বামীজী দ্বিতীয়বার প্রায় দেড় বৎসর পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া পূর্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধ ও আসামে কামাখ্যা দর্শন করেন; পরে শিলং ও গৌহাটি হইয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০১ খ্রীঃ ১৯ মার্চ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ-গৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে ইংরেজীতে এই বক্তৃতা দেনঃ]

আমি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখনও নিজের জন্মভূমি বাঙলাদেশ বিশেষভাবে দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের স্থলে জলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য; কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি বাঙলার সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইভাবেই আমি প্রথমে ধর্মের জন্য নানা সম্প্রদায়ে—বৈদেশিকভাববহুল নানা সম্প্রদায়ে ঘুরিতেছিলাম, অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম, জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতীয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে।

আজকাল একদল লোক আছেন, তাঁহারা ধর্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—তাঁহারা ‘পৌত্তলিকতা’ বলিয়া একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ—কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা হাঁচি-টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন দিন ভগবানকেই তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। যাহা হউক, জগন্মাতা ইঁহাদিগকেও আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা নিজ কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহা ছাড়া আর একটি দল আছেন—প্রাচীন সম্প্রদায়; তাঁহারা বলেন, ‘অত শত বুঝি না, বুঝিতেও চাহি না, আমরা চাই ঈশ্বরকে—চাই আত্মাকে; চাই জগৎ ছাড়িয়া—সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার পারে যাইতে।’ তাঁহারা বলেন, বিশ্বাসের সহিত গঙ্গাস্নান করিলে মুক্তি হয়; তাঁহারা বলেন, শিব রাম বিষ্ণু প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই

হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে; আমি সেই বলিষ্ঠ প্রাচীন-সম্প্রদায়ভুক্ত।

আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার একসঙ্গে অনুসরণ কর। ইঁহাদের মন-মুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ এইঃ

জঁহা কাম তঁহা রাম নহিঁ, জঁহা রাম তঁহা নহিঁ কাম।
কবহুঁ ন মিলত বিলোকিয়ে রবি রজনী এক ঠাম॥ ৭৮

যেখানে ভগবান্ সেখানে কখনও সংসার-বাসনা থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কখনও এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। এইজন্য ইঁহারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারটা তো অনিত্য, শূন্য—কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে তুমি দুর্বল, কিন্তু কোনমতেই আদর্শকে ছোট করিও না। গলিত শবকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এইজন্য ইঁহাদের মতে এই ধর্মলাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে প্রথমে ‘ভাবের ঘরে চুরি’ ছাড়িতে হইবে।

আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছিঃ দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।৭৯—প্রথমে চাই মনুষ্যত্ব—মানুষজন্ম, ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা। তারপর চাই মুমুক্ষুতা; সম্প্রদায় ও ব্যক্তি-ভেদে আমাদের সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুত্ব কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখদুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য—প্রবল আগ্রহ, এই সংসারের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। যখন ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে—তুমি ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইয়াছ। তারপর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়—গুরুলাভ; গুরূপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহারই সহিত নিজের সংযোগ-স্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না, অর্থাৎ তোমার

গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব?—শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।৮০ তিনিই শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন।

পোথি পঢ়ি তোতা ভয়ো পণ্ডিত ভয়ো ন কোয়।
ঢাই অক্ষর প্রেমসে পঢ়ে সো পণ্ডিত হোয়॥

শুধু বই-পড়া পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে-সে গুরু হইতে চায়। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। 'অবৃজিন'—যিনি নিষ্পাপ; 'অকামহত'—কেবল জীবের হিত ব্যতীত যাঁহার আর কোন অভিসন্ধি নাই, যিনি অহেতুক-দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নাম-যশের জন্য উপদেশ দেন না, আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন, যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে 'করতলামলকৎ' দর্শন করিয়াছেন; তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বরলাভ, ঈশ্বরদর্শন সহজ হইবে। তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টি যখন দৃঢ় হইবে, তখনই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইবেন। তাই বলি হে হিন্দুগণ, হে আর্যসন্তানগণ, তোমরা এই আদর্শ কখনও বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাহিরে যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে; মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের পারে যাইতে হইবে।

# ৩১. আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম

[ ১৯০১ খ্রীঃ ৩১ মার্চ ঢাকায় পগোজ স্কুলের খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সম্মুখে স্বামীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন, নিম্নে তাহার বাঙলায় গৃহীত বিবরণী প্রদত্ত হইলঃ]

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাই না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণ ও কীর্তন করিয়া কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি ও মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণ করিয়া প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের মত ঋষি হইতে হইবে; শুধু তাই নয়—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও মহান্ ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল, আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করি। বর্তমানকালের অবনত অবস্থা দেখিয়া আমি দুঃখিত নই; ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি আশ্বান্বিত; কারণ আমি জানি, বীজের বীজত্ব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্মের ভিতর সাধারণ ভাব কি কি? আপাততঃ নানা বিরোধ দেখিতে পাই। মত সম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন—মূর্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধে তো নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাঠেরা মুসলমান বা খ্রীষ্টান পর্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। পাঞ্জাবে অনেক গ্রামে যে-হিন্দু শূকর ভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙলা দেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরেও বিবাহ হইবার জো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু সকল

হিন্দুর মধ্যে এই একটি বিষয়ের ঐক্য দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

এইরূপ আমাদের ধর্মের ভিতরেও এক মহান্ সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। যে-সকল ধর্মের নিজস্ব এক বা বহু শাস্ত্র ছিল, সেই-সকল ধর্ম দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল এবং নানাবিধ অত্যাচার সত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীকধর্মের নানাবিধ সৌন্দর্য থাকিলেও শাস্ত্রের অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল, কিন্তু য়াহুদীধর্ম ওল্ড টেস্টামেন্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণপ্রতাপ। হিন্দুধর্মও সেইরূপ। উহার শাস্ত্র 'বেদ' জগতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটি ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যেই হউক অথবা দুর্ভাগ্যেই হউক, কর্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আর বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রে মধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আর উহাকে পূর্বের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিলভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। তারপর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত, উহাকেই 'শ্রুতিশির' বলা হয়। আর্যগণ যেখানে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন, সেখানেই দেখা যায় যে, তাঁহারা এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্মই এখন ভারতের ধর্ম। যদি কোন সম্প্রদায় জনগণের মধ্যে নিজ মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, সকলকেই তাই করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ নিজেদের মত প্রমাণ করিতে 'গোপালতাপিনী উপনিষদ্' উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত রচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ নূতন উপনিষদ্ রচনা পর্যন্ত করিয়া লন। এখন বেদ সম্বন্ধে হিন্দুগণের মত এই যে, উহা কোন পুস্তকবিশেষ বা কাহারও রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখনও ব্যক্ত হয়, কখনও বা অব্যক্ত থাকে। সায়নাচার্য একস্থলে বলিয়াছেন, 'যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্মমে'—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা—কেহ কখনও দেখে নাই; সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ঋষিগণ

কেবল ঐ-সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা—মন্ত্রদ্রষ্টা, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান বেদ তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র।

এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত ধর্ম প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্মের সাক্ষাৎকার হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন, তবে হে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আরও কত মহান্ ঋষি হইতে পার! সেই ঋষিত্বলাভের চেষ্টা কর, জগৎ তোমাদের নিকট স্বতঃই নত হইবে। এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায়॥'৮১ এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার কি যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ তো এ-কথা বলিতেছেন না। ভৃত্য কি কখনও প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এগুলির ততটুকুই গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে; না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়াছি। বেদের চর্চা তো বাঙলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি শীঘ্র সেইদিন দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে।

বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। তাঁহারা বেদের কাল—আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, আগামী কাল উহা বদলাইয়া সহস্র বৎসর পিছাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, পূর্বে যেমন বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য। পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যেগুলি বেদের সহিত মিলে না। যথা, পুরাণে লিখিত আছে—কেহ দশ সহস্র, কেহ বা বিশ সহস্র বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য। তাহা হইলেও

পুরাণে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্মের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে, সেগুলি অবশ্য লইতে হইবে।

তারপর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শাস্ত্র', যেমন 'কাপিল তন্ত্র'। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ আমি উহার বর্তমান প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞসকল লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদের ভিতরেই সেই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি ঘৃণ্য ব্যাপার বাদ দিলে—লোকে যতটা ভাবে, উহা ততটা খারাপ নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণভাগই একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আজকালকার সমুদয় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখন ধর্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ধর্মমতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধসত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ তিনটি বিষয়—তিনটি সত্তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেনঃ ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে চিরকাল সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন; সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা—অসংখ্য জীবাত্মা কর্মফলে বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমান; ইহা 'সংসারবাদ'—সাধারণতঃ ইহাকে 'পুনর্জন্মবাদ' বলে। আর রহিয়াছে এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ একেরই বিভিন্ন অবস্থা, কেহ বা সম্পূর্ণ পৃথক্ তিনটি সত্তা বলিয়া মানিলেও সকলেই এই তিনটিতে বিশ্বাস করেন।

এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই, পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ এবং সম্ভোগ করিবার জিনিষ বলিয়া জানেন; আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ, উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ কর্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তেমনি অন্তর্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী।

যাহা হউক—এখন হিন্দুধর্মের আর দু-একটা কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বর-দর্শনই প্রকৃত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। হিন্দুগণ প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্যের মধ্যে দিয়া মনুষ্যের ঈশ্বরে গিয়া থাকেন। তারপর মূর্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্যদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক-একটি পদের নাম, কিন্তু এই পঞ্চদেবতা সেই এক ভগবানের নামমাত্র। এই মূর্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা অন্যায় কার্য নহে। এই মূর্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিত ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহার নিন্দা করি না। সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি যদি আমি না পাইতাম, তবে কোথায় থাকিতাম! যে-সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি—ভাই, তুমি যদি নিরাকার-উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর; কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন?

সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কারমাত্র। সেটুকু হইয়া গেলে সংস্কারের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু তোমরা নিজদিগকে পৃথক্ করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়তো উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এস, সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি একসঙ্গে ডুবিয়া মরি।

আর ব্রাহ্মণগণকেও বলিঃ তোমরা আর বৃথা অভিমান রাখিও না, শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই; কারণ তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিলভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধদের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া অনেকের মৃত্যুর কারণ হন এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ

তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ কর; যদি তাহা করিবার সাহস না থাকে, নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া সর্বসাধারণকে সাহায্য কর, তাহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত কর এবং পদদলিতদের আবার ন্যায্য ও প্রকৃত অধিকার দাও।